হুমায়ুন আজাদ

চাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল

বসন্তের এক নিষ্ঠুর ভোরে ঘুম ভেঙে রাশেদ দেখতে পায় ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল জুড়ে নেমে এসেছে অন্ধকার—ঘোষিত হয়েছে সামরিক শাসন; তার পাঁচ বছরের মেয়ে মৃদু ইস্কুলে গিয়েছিলো, কিন্তু তাকে যেতে দেয়া হয় নি, মিলিটারিরা রাইফেল উঁচিয়ে তাকে বাধা দেয়, সে এই অদ্ভুত মানুষদের দেখে রাস্তা থেকে চোখ আর বুক ভ'রে দুঃস্বপ্ন দিয়ে ঘরে ফিরে আসে। রাশেদের হৃদয়ের মতো ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল আর মৃদুর কাজলাদিদি লুপ্ত হয়ে যায় কর্কশ অশ্লীল সামরিক অন্ধকারে। তবে এই প্রথম সামরিক গ্রাসে পড়ে নি তার নষ্টভ্রষ্ট দেশটি, রাশেদের বাল্যকাল আর যৌবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো পাকিস্থানি সামরিক গ্রাসে, এখন তার উত্তরাধিকারীর জীবনও পড়ে সামরিক গ্রাসে। রাশেদ জেগে ওঠে এক দূষিত বাস্তবতার মধ্যে, দিকে দিকে সে বুটের শব্দ শুনতে পায়, সে শুনতে পায় একনায়কের চাবুকের শব্দে নাচছে তার মাতৃভূমি, দেখতে পায় তার আত্মার মতো প্রিয় দেশটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একনায়কের গ্রাসে প'ড়ে; তবে রাশেদ শুধু এ-দৃশ্যই দেখে না—দেখে ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের সবুজ দাবাগ্নিদগ্ধ দেশটিকে কেউ ভালোবাসে না, যদিও সম্ভোগ করতে চায় সবাই। রাশেদ দেখতে পায় তার দেশটিকে নষ্ট ক'রে চলছে সামরিক একনায়কেরা, ভ্রষ্ট ক'রে চলছে রাজনীতিকেরা; এবং প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠছে বিপন্ন, একদিন রাশেদও বিপন্ন হয়ে ওঠে ভয়ংকরভাবে, নিজের চোখের সামনে দেখে পুড়ছে ছাই হচ্ছে ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল—পুড়ছে গাছের পাতা, নদী, মেঘ, ধানখেত, লাঙ্গল, সড়ক, গ্রাম, শহর, পুড়ে যাচ্ছে ছাই হয়ে যাচ্ছে একটি জাতি, পুড়ে যাচ্ছে ছাই হয়ে যাচ্ছে বর্তমান, পুড়ে যাচ্ছে ছাই হয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ। হুমায়ুন আজাদ *ছাপান্নো হাজার বর্গমাইল*-এ কোনো ব্যক্তির কথা বলেন নি, বলেছেন একটি দেশ ও জাতির কথা, বলেছেন অভিনব রীতিতে, অসামান্য গদ্যে; তিনি উপস্থাপন করেছেন এক মর্মস্পর্শী ভূভাগের বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎকেও। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের এ-ভূখণ্ডটি নিয়ে আগে আর কেউ এমন দুঃসাহসী হন নি সত্যকে এমন অকপটে প্রকাশের; হুমায়ুন আজাদ সে-সত্য প্রকাশ করেছেন, রচনা করেছেন এক অভিনব উপন্যাস, যা শৈল্পিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়।

উৎসর্গ

পরলোকগত পিতা
আমি একটি নাম খুঁজছিলাম
আপনার নামটিই—রাশেদ—মনে পড়লো আমার

১ শেষরাতে বিপ্লব এবং গুবরেপোকার দল

রাইফেলের নির্দেশে তুমি ফোটাচ্ছো
সামরিক পদ্ম, সাইরেনে কেঁপে নামাচ্ছো
বর্ষণ, নাচছো বৃষ্টিতে চাবুকের শব্দে, এক ম্যাগজিন-
ভর্তি হলদে বুলেট পাছায় ঢুকলে তুমি জন্ম দাও নক্ষত্রস্তবকের
মতো কাঁপাকাঁপা একটা ধানের শীষ। প্রকাশ্য রাস্তায় তুমি একটা লজ্জিত রিকশা ও
দুটো চন্দনা পাখির সামনে একটা রাইফেল-একজোড়া বুট-তিনটা শিরস্ত্রাণের সঙ্গে
সঙ্গম সারো;—এজন্যেই কি আমি অনেক শতাব্দী ধ'রে স্বপ্নকুহুর
ভেতর দিয়ে ছুটে-ছুটে পাঁচশো দেয়াল-জ্যোৎস্না-রাত্রি-
ঝরাপাতা নিমেষে পেরিয়ে বলেছি, 'রূপসী, তুমি,
আমাকে করো তোমার হাতের গোলাপ।'

মাঝেমাঝে কালঘুমে পায় রাশেদকে;—সে ঘুমিয়ে পড়ে যেনো ম'রে গেছে বা তার জন্মই হয় নি, যেনো মানুষ, সমাজ, সংঘ, বা পৃথিবীর কেউ সে নয়, যেনো সে ট্রাউজার বা পাজামা বা লুঙ্গিপরা বা নগ্ন মানুষদের, বা দেয়ালঘেরা দালান বা মানচিত্রিত রাষ্ট্রের কেউ ছিলো না কখনো, ভবিষ্যতেও এদের কেউ থাকবে না; আর তখন তার চারপাশে, ঘুমভাঙা মানুষের জগতে, ঘ'টে যায় বড়ো কোনো ঘটনা, যাকে অনেক সময় ইতিহাস বলা হয়। তার ছেলেবেলায় প্রথম ঘটে এমন এক ঘটনা, যা আজো সে মনে করতে পারে, এবং কখনো ভুলবে না; হয়তো তারও আগে, যখন সে মায়ের বুকে তৃতীয় স্তনের মতোই লেগে থাকতো, তখনো ঘটেছে এমন ঘটনা, তবে তা সে আর মনে করতে পারে না। রাশেদ, তখন ছোটো ও একমুঠো, মসজিদের পাশের নানা রঙের কবরঘেরা ভীতিকরভাবে আকর্ষণীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে যেতে শুরু করেছে; তখন ঘটে আজকের মতোই এক ঘটনা, সেদিনও সে ঘুমিয়ে ছিলো যেনো তার জন্ম হয় নি, কখনো জন্ম হবে না। সে-রাতে আগুন লেগেছিলো পাশের বাড়িতে, চোতবোশেখে চাষীদের বাড়িতে কুপি উল্টে বা চুলো থেকে বেড়ার খড় বেয়ে শিখা উঠে প্রায়ই যেমন আগুন লাগে। ওই আগুনে রাত দিনের মতো কড়কড়ে হয়ে উঠেছিলো, পুবপশ্চিম পাড়া থেকে মানুষ ছুটে এসেছিলো বালতি হাতে, যাদের অনেকে পানি ছিটানোর থেকে চিৎকারই করেছিলো বেশি, কেউ কেউ আগুনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলো যেনো অন্ধ, সে-লকলকে অগ্নিকাণ্ডের সামান্য শব্দও তার কানে ঢোকে নি। পুবপুকুরের কাদামাটির মতো সে ঘুমিয়ে ছিলো। মা তার পাশে সারাক্ষণ ব'সে ছিলো, যদি আগুন তাদের বাড়ির দিকেও জিভ বাড়িয়ে দেয়, তাহলে রাশেদকে কোলে ক'রে যাতে উত্তরের পুকুরের পানি ভেঙে মাঠের দিকে যেতে পারে। মা রাশেদের ঘুম ভাঙায় নি, বরং সুখ পাচ্ছিলো একথা ভেবে যে তার শিশুপুত্র আগুনের খুব কাছাকাছি থেকেও অনেক দূরে থাকতে পারে।

আজকের চোতের রাতটিতেও ছেলেবেলার সে-রাতের মতোই ঘুমিয়ে ছিলো রাশেদ, কিছুই টের পায় নি, তার ঘুমের ভেতরে কোনো বাস্তবতা আক্রমণ চালায় নি; যেমন একাত্তরের মার্চের বিভীষিকার রাতটিতেও সে আঠালো কাদার মতো ঘুমিয়ে ছিলো। ঘুমকাতুরে সে নয়, ঘুমের মধ্যে কেউ তাকে ঠেলা দিলে প্রথমবারেই সে জেগে ওঠে, খুব স্বাভাবিকভাবে ঢোকে মানুষের জগতে; কিন্তু বড়ো বড়ো ঘটনার রাতে, যে-রাতে মানুষ বা প্রকৃতি বাস্তবায়িত করে কোনো চক্রান্ত, রাশেদ মানুষ ও প্রকৃতির সীমা পেরিয়ে ঢুকে পড়ে জন্মের আগের অন্ধকারে। পঁচিশে মার্চের রাতে সে ঘুমোতে গিয়েছিলো সাড়ে দশটার দিকে; তার আগে সারাদিন এক বন্ধুর সাথে ঢাকা ভ'রে হেঁটেছে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রামের অর্থ কী, তাতে রয়েছে কতোখানি ধাঁধা আর কতোখানি বস্তু, বের করার চেষ্টা করেছে; কেনো মুজিব-ইয়াহিয়ার নিরর্থক সংলাপ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে অথচ জনগণকে কিছু জানানো হয় নি, তর্ক করেছে এসব নিয়ে; সন্ধ্যের বেশ পরে বাসায় ফেরার সময় দেয়াল ভেঙে, গাছের গুঁড়ি, ইঁটপাটকেল জড়ো ক'রে পাড়ার ছেলেদের পথ আটকাতে দেখেছে, মিলিটারি এলে এসব দিয়ে কতোক্ষণ ঠেকানো যাবে, তা জানতে চেয়েছে দুর্দান্ত ছেলেদের কাছে, এবং রাত ভ'রে একটি স্বায়ত্তশাসিত বঙ্গীয় ঘুমের পর ভোরে জেগে উঠে মাকে জিজ্ঞেস করেছে, পুব দিকের আকাশে এতো ধুঁয়ো কেনো?

বসন্ত, অনেক দিন ধ'রে, এ-ধরনের একটি কবিতার পংক্তি পড়ার অনেক আগে থেকেই, রাশেদের মনে হয়, খুব নিষ্ঠুর কাল। জংধরা পেরেকের মতো ডাল ফেড়ে যখন তলোয়ারের মতো সবুজ পাতা গজায়, লাল হলুদ হয়ে ওঠে ভিখিরির মতো গরিব গাছ, চারপাশে রাশেদ শুনতে পায় কাতর আর্তনাদ। নিষ্ঠুর বসন্ত আবার এসেছে, শেষ হয়ে এসেছে মার্চ, এবং কালঘুমে পেয়েছে রাশেদকে। গতরাতেও পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটির চিৎকারে সবার আগে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, মেয়েটি দ্বিতীয় চিৎকার দেয় নি ব'লে সে আবার চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু আজ রাশেদ ভ্রূণে পরিণত হয়েছিলো, সকাল আটটা বাজার পরও ওঠে নি। সে চোখ খুললো যখন মৃদু তাকে 'আব্বু' ব'লে ডাকলো। চোখ খুলেই সে দেখলো মৃদু তার বিছানার পাশে জলের ফোঁটার মতো টলমল করছে;—তার গায়ে ইস্কুলের পোশাক, কী চমৎকার পাখির ডানার মতো তার ঝুঁটি, একখনি উড়ে গিয়ে হয়তো বসবে কোনো পেয়ারা গাছে, কিন্তু সে এমন টলমল করছে যেনো এখনি ঝ'রে যাবে। রাশেদের মনে হলো সে হয়তো কোনো মারাত্মক অপরাধ ক'রে ফেলেছে মৃদুর কাছে। এভাবেই কোনো শেষ নেই তার অপরাধের, মানুষ পাখি গাছপালা পোকামাকড় বাতাস মেঘ বিদ্যুৎ ঘাস খড়কুটো শ্যাওলা কলকব্জার কাছে সে এতো অপরাধ করেছে যে মৃদুর জন্মের সময়ই, ক্লিনিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো এ-অভিনব মানুষটির কাছে কখনো কোনো অপরাধ করবে না। মৃদু গ'লে পড়ার আগেই রাশেদ মৃদুকে জড়িয়ে

ধ'রে বললো, কী হয়েছে মৃদু? কে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে? মৃদু বললো, ওরা আমাকে ইস্কুলে যেতে দিলো না কেনো? রাশেদ কিছুটা ভয় পেয়ে জোরে জিজ্ঞেস করলো, কারা? মৃদু বললো, মিলিটারিরা।

রাশেদ শক্ত হয়ে উঠে বসলো। দাদার হাত ধ'রে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রতিদিনের মতো ইস্কুলে যাচ্ছিলো মৃদু, ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে থাকে সে যেমন রাশেদ নিজেও থাকতো, কিন্তু গলি পেরিয়ে যেই বড়ো পথে তারা পা দিয়েছে, ট্রাক থেকে মিলিটারিরা রাইফেল উঁচিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে। এর আগে মৃদু এমন মানুষ দেখে নি, তারা যে মানুষ তা বুঝতে বেশ সময় লাগে মৃদুর। দাদা তাকে বলে, এরা মানুষই, তবে মিলিটারি। মৃদুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাদার মনে হয়েছিলো মিলিটারিরা যে মানুষ তা বুঝে উঠতে পারছে না মৃদু, তাই তিনি স্পষ্ট ক'রে কথাটি বলেন। ওই মিলিটারিরা ধমক দিয়ে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলে, চিৎকার ক'রে বলে যে এগোলে গুলি করবে, বলে রাস্তায় নামা নিষেধ। একটা মিলিটারি আরো জোরে চিৎকার ক'রে বলে দেশে সব কিছু বন্ধ, ইস্কুলও বন্ধ। মৃদু এতে খুব ভয় পায়, তবে ভয় পাওয়ার থেকে বেশি দুঃখ পায়। মৃদুর মুখে এক বড়ো অভিজ্ঞতার ছাপ, আজ সকালে সে বাইরে থেকে ইতিহাস মুখে ক'রে নিয়ে এসেছে; সে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে পাঁচ বছর বয়সেই, যার কোনো ক্ষমা নেই, যার অশ্লীল দাগ কখনো মুছবে না। মৃদু দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে, পাঁচ বছর বয়সেই তার দেশ তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে এমন দুঃস্বপ্নের গর্তে, যেখান থেকে সে কখনো উঠে আসতে পারবে না। মৃদুর ধারণা ছিলো ইস্কুলে যেতে কেউ কখনো নিষেধ করে না, আজ পর্যন্ত তাকে কেউ নিষেধ করে নি; তার বিশ্বাস ছিলো রাস্তায় হাঁটতে কেউ কখনো নিষেধ করে না, আজ পর্যন্ত তাকে কেউ নিষেধ করে নি; বরং তাকে ইস্কুলে যেতে দেখে খুশি হয় সবাই, মৃদুর তাই মনে হয়; চকোলেট না কিনলেও রাস্তার মুদি তাকে দেখে হেসে হাত নাড়ে, অচেনা অনেকে রাস্তার ওপার থেকে এসে তার গাল টিপে দেয়। তার ধারণা ছিলো ইস্কুল বন্ধ করতে পারেন শুধু বড়ো আপা, আর কেউ পারে না। মিলিটারিরা তো ইস্কুলে পড়ায় না, তাদের তো সে কোনোদিন ইস্কুলে দেখে নি, তারা কেনো ইস্কুল বন্ধ করবে? খুব আহত বোধ করছে মৃদু, তার সুখ কেউ কেড়ে নিয়েছে তাকে না জানিয়ে, এটা সহ্য করতে পারছে না সে। রাশেদকে জড়িয়ে ধ'রে সে প্রশ্ন করতে থাকে, রাস্তায় হাঁটতে পারবো না কেনো? রাশেদ বললো, মিলিটারিরা এসেছে, তাই। মৃদু জিজ্ঞেস করলো, ইস্কুলে যেতে পারবো না কেনো? রাশেদ বললো, মিলিটারিরা এসেছে, তাই। মৃদু জিজ্ঞেস করলো, মিলিটারিরা এলে সব বন্ধ হয়ে যায়? রাশেদ বললো, হ্যাঁ। মৃদু জিজ্ঞেস করলো, পাখিদের ওড়াও বন্ধ হয়ে যায়? রাশেদ বললো, হ্যাঁ। মৃদু জিজ্ঞেস করলো, ফুল ফোটাও বন্ধ হয়ে যায়? রাশেদ বললো, হ্যাঁ। মৃদু জিজ্ঞেস করলো, গান গাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়? রাশেদ বলো, হ্যাঁ। মৃদু জিজ্ঞেস করলো, বৃষ্টিও কি বন্ধ হয়ে যায়? রাশেদ বললো, হ্যাঁ। মৃদু

জিজ্ঞেস করলো, স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হয়ে যায়? রাশেদ বললো, হ্যাঁ। মৃদু চিৎকার ক'রে উঠলো, তাহলে দেশে কেনো মিলিটারি আসে? আর দেশে কি শুধু মিলিটারিরাই থাকবে? রাশেদ উত্তর না দিয়ে মুখ দেখছে মৃদুর, মুখের ভেতর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে মৃদুর রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটি, যেখানে বহু বেয়নেটের খোঁচা লেগে আছে। মৃদুর মুখটি হয়ে উঠেছে বাঙলাদেশ, যার ওপর অজস্র বুটের অশ্লীল দাগ দগদগ করছে। মৃদু প্রশ্ন ক'রে চলছে : মিলিটারি আমাদের রাইফেল দিয়ে মারতে চাইলো কেনো? বড়ো আপা তো ইস্কুল বন্ধ করে নি, ইস্কুল বন্ধ হলো কেনো, আব্বু? আমাদের ইস্কুলটি কি মিলিটারিদের? মৃদুর চোখের দিকে তাকিয়ে রাশেদের ভয় হলো, ওই চোখে সংখ্যাহীন প্রশ্ন দেখতে পেলো রাশেদ, মনে হলো মৃদু হয়তো অনন্তকাল ধ'রে প্রশ্ন করতে থাকবে। রাশেদ মৃদুকে কোলে জড়িয়ে ধ'রে মৃদুর গালে অনেকক্ষণ নিজের গাল লাগিয়ে রাখলো, নাকটি নেড়ে দিলো, তারপর বললো, মৃদু, আজ থেকে বাঙলাদেশের সব রাস্তা মিলিটারিদের। তোমার বইগুলো মিলিটারিদের। ছড়াগুলো মিলিটারিদের। কাজলা দিদি আর আমাদের ছোটোনদী মিলিটারিদের। আকাশ মিলিটারিদের। বাতাস মিলিটারিদের। পাখির গান মিলিটারিদের। তোমার নাচ আর হাসি মিলিটারিদের। বৃষ্টি মিলিটারিদের। আমাদের দেশটি মিলিটারিদের। মৃদু ফুঁপিয়ে উঠলো, আব্বু, আমি ইস্কুলে যাবো।

শেষমার্চের সকালবেলা মৃদুর চোখমুখে বুটের দাগ দেখতে পেয়ে রাশেদ বুঝেছে দেশে আবার ত্রাণকর্তারা এসেছে। সে মৃদুর কাছে অপরাধী বোধ করলো নিজেকে; মনে হলো যেনো সে-ই রাস্তায় রাস্তায় ট্রাকে ট্রাকে ব'সে আছে, সে-ই জলপাইরঙ প'রে ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে রাইফেল উঁচিয়ে ধ'রে ভয় দেখিয়েছে মৃদুকে, সে-ই জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছে মৃদুর ইস্কুল, সে-ই মৃদুকে লাথি মেরে দুঃস্বপ্নের খোড়লে ফেলে দিয়েছে। সে বুঝলো জলপাইরঙের ত্রাণকর্তারা, কয়েক মাস ধ'রেই যারা আসি আসি করছিলো, এসেছে; সে উপলব্ধি করলো দেশে এক মহাপুরুষ, মহান ত্রাতা, জাতির উদ্ধারকর্তা, গণতন্ত্ররক্ষাকারীর আবির্ভাব ঘটেছে আবার। রাশেদ, ছেলেবেলা থেকে, বেশ কয়েকটি মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখেছে; তাদের নানা ছন্দের গোঁফ, বুকে বিচিত্র তারকা, আর প্যাঁচানো দড়ি দেখেছে। মৃদুকে জড়িয়ে ধ'রে রাশেদ আরেকটি মহাপুরুষের মুখ কল্পনা করতে লাগলো;—ওই ভাঁড়টিই কি এসেছে, রাশেদ নিজেকে প্রশ্ন করলো, যেটা কয়েক মাস ধ'রে খুব ছটফট করছিলো, ক্ষমতায় অংশ চাইছিলো? নানান রঙের প্রতিশ্রুতি শুনতে লাগলো রাশেদ, একের পর এক উৎকট ঘোষণা আর কুচকাওয়াজে তার কান ঘরঘর করতে লাগলো। আবার প্রচুর গণতন্ত্র পাওয়া যাবে, ভাবলো রাশেদ; বেতার-টেলিভিশনের বাক্সগুলো খুললেই গলগল ক'রে আবার গড়িয়ে পড়বে গ্যালন গ্যালন গণতন্ত্র, দেশের রোগা পাছায় লাথি মেরে মেরে আবার তাকে ফুলিয়ে তোলা হবে। বাঙলাদেশ, তোমাকে অভিনন্দন, বললো রাশেদ, তুমি এতো মহাপুরুষ জরায়ু থেকে উগড়ে দিয়েছো! খুব প্রস্রাব পেলো

রাশেদের। ভোরে জেগে যেমন প্রতিদিন তলপেটে চাপ বোধ করে আজকের চাপটা তার চেয়ে অনেক বেশি; সম্ভবত তার তলপেটে এরই মাঝে হাজার গ্যালন গণতন্ত্র, আর শান্তিশৃঙ্খলাউন্নতি ঢুকে গেছে। রাশেদ মৃদুর আম্মাকে ডাকলো, যে সকাল থেকেই পাশের ঘরে ব'সে বেতারে জলপাইরঙের ঘোষণা আর গোলাপি গোলাপি প্রতিশ্রুতি প্রাণভ'রে খাচ্ছিলো আর পান করছিলো, একা একা খেতে খেতে আর পান করতে করতে বমি বমি বোধ করছিলো। মমতাজ, মৃদুর আম্মা, একটি ছোটো রেডিও হাতে এসে বললো, জানো, সামরিক আইন জারি হয়েছে। আজ তাকে অফিসে যেতে হবে না ব'লে কণ্ঠে একটা ঢিলেঢিলে ভাব এসেছে, তবে মুখে বমির ভাবটা বেশ স্পষ্ট। সে যদি একটা চমৎকার বমি করতে পারতো, বমিটা উগড়ে দিতে পারতো ওই সমস্ত ঘোষণার মুণ্ডুর ওপর, তাহলে স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। রাশেদের বলতে ইচ্ছে হলো, তুমি একবার বমি ক'রে এসো। প্রস্রাবটা খুব চেপে ধরেছে রাশেদকে, সে ওই চাপে প্রায় কথা বলতে পারছিলো না; শুধু বললো, প্রথম ওটা যাবে বালের ওপর দিয়ে।

মমতাজ বেশ শক্ত সংস্কৃতির মানুষ, জলপাইরঙের ঘোষণা মুখে বমি বমি ভাব এনে দিলেও তার সুরুচিকে নষ্ট করতে পারে নি; সে রুচিসম্পন্নভাবে রেগে উঠলো। বললো, তুমি ঘুম থেকে উঠেই অশ্লীলতা শুরু করলে। এমন শব্দ তোমাকে মানায় না। রাশেদ বললো, কোথায় অশ্লীলতা করলাম? মমতাজ বললো, ওই যে কীসের ওপর দিয়ে যাবে বললে। রাশেদ বললো, আমার শব্দটি কি ওই ঘোষণাগুলোর থেকেও অশ্লীল? রাশেদের অবশ্য খুবই অশ্লীলতা করতে ইচ্ছে করছিলো; বাঙালিরা বেশি রেগে গেলে প্রতিপক্ষের পেছনের দিকে কী একটা করার কথা বলে, পেছনটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলতে চায়, রাশেদেরও ইচ্ছে করছিলো পৃথিবীর সমস্ত উর্দি খুলে পেছনের দিকে ক্রিয়া সম্পন্ন করার; কিন্তু তা না পেরে সে শুধু ওই শব্দটি উচ্চারণ করেছে। বাবার মুখে রাশেদ শব্দটি ছেলেবেলায় বারবার শুনেছে, বাবা রাগলেই চিৎকার ক'রে ওই শব্দটি বলতেন; রাশেদ সাধারণত বাবার মতো চিৎকার ক'রে শব্দটি বলতে পারে না, কিন্তু রেগে গেলেই মনে মনে চিৎকার ক'রে ওঠে, বাল। প্রথম সে শব্দটির অর্থ বুঝতো না, বোঝার আগেই এটি তার রক্তে ঢুকে যায়। তাদের গ্রামের সবাই সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিশ বোঝাতে ঘেন্নার সাথে উচ্চারণ করতো শব্দটি, সেও উচ্চারণ করতে চায়, কিন্তু পারে না ব'লে অসুস্থ বোধ করে। রাশেদ বললো, আমি চুলের কথা বলেছি। মমতাজ বললো, আমি জানি তুমি কীসের কথা বলেছো। আমাকে তুমি ভাষাবিজ্ঞান শেখাতে যেয়ো না। রাশেদ বললো, ছা-ম-রি-ক-ছা-স-ন! উর্দিপরা ভাঁড়! ওই যে ট্রাক ভ'রে বেরিয়ে পড়েছে, হাতে অস্ত্র, কিন্তু ওরা চুল ছাঁটার চেয়ে বড়ো কোনো কাজ করতে পারে না; ওদের জেনারেলরাও পারে না। দেখবে ওরা রাস্তায় রাস্তায় ছেলেদের লম্বা চুলের ওপর দিয়ে বিপ্লব করছে।

ওরা বিপ্লব নিয়ে আসে। ভাবতেই আবার প্রস্রাবের চাপটা প্রচণ্ড হয়ে উঠলো রাশেদের। ওরা রাতে আসে, আসার দিনটার নাম দেয় বিপ্লব দিবস; এসেই ওরা রাস্তায় ছেলেদের চুল ছাঁটে, মেয়েদের ঘোমটা পরায়। রাশেদ দেখতে পেলো ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে কয়েকটি জলপাইরঙ একটি লম্বাচুলের ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে, দুটি জলপাইরঙ কাঁচি বের ক'রে এদিকে সেদিকে ছেঁটে ফেলছে ছেলেটির চুলগুলো। চুলই রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা রাশেদ দেখে আসছে ছেলেবেলা থেকে। চুলের ওপর ওরা এতো খাপ্পা কেনো? চুল কি বিদ্রোহের মুক্তির প্রতীক? নাকি ওরা চুল ছাঁটার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুর যোগ্য নয়? রাশেদের প্রস্রাবটা এখন আরো তীব্র; মৃদুকে মায়ের কোলে দিয়ে রাশেদ বাথরুমে ঢুকলো। সে মনে করেছিলো একটা বিশাল হ্রদ ঘুরপাক খাচ্ছে তার ভেতরে, কাসপিয়ান হ্রদের কথাই মনে পড়লো তার, ভেবেছিলো একটা জলপ্রপাত গমগম ক'রে বেরিয়ে আসবে, কিন্তু অন্যদিনের থেকে কোনো পার্থক্য ঘটলো না। অন্যান্য দিনের মতো মিনিটখানেক ঝমঝম ক'রে সেটা বন্ধ হয়ে গেলো, তলপেটটি ভারী হয়ে রইলো; প্রপাতটি ভেতরে ভেতরে গর্জন করছে, আবার চেষ্টা করতে গিয়ে ভেতরটাকে মরুভূমির মতো শুষ্ক ঠেকলো। অনেকক্ষণ ধ'রে সে শি-শি-শি আওয়াজ করলো, ছেলেবেলায় মা নিশ্চয়ই এ-মন্ত্রের সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করাতো, আজ যদি ওই মন্ত্রে কাজ হয় তাহলে সে রক্ষা পায়। কিন্তু সে দেখলো তার প্রত্যঙ্গটি স্মৃতিহীন, বাল্যকালকে একেবারেই মনে করতে পারছে না। রাশেদ তলপেটে একটা গর্জনশীল রুদ্ধ জলপ্রপাত নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। বেরিয়েই সে ড্রয়িংরুমে ঢুকে টেলিভিশনে নতুন মহাপুরুষের মুখ দেখে বললো, বাহ্, বেশ তো নিধিরাম সর্দার! দেশে একটা বেশ ছিঁচকে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। মহাপুরুষটি ত্রাতাত্রাতা মহান মহান ভাব করার চেষ্টা করছে, সম্ভবত মাস ছয়েক সে মহান মহান ত্রাতা ত্রাতা ভাবের রিহার্সেল দিয়েছে টয়লেটে ব'সে, বুকে তারাও শেলাই করেছে গণ্ডাখানেক, বাহু ঘিরে দড়িও বেশ পেঁচিয়েছে, দু-কাঁধে তলোয়ারও ঝুলিয়েছে, কিন্তু ওকে একটা ভাঁড় ব'লেই মনে হচ্ছে। সুন্দর পলিমাটির দেশ বঙ্গ, ভাঁড়ও মহাপুরুষরূপে দেখা দেয় এখানে, ভেবে হাসি পেলো রাশেদের। ওর পাশে দুটি ছোটো মহাপুরুষও রয়েছে, তারাও গাল ফুলিয়ে খুব মহৎ ভাব করার চেষ্টা করছে, বুক ভ'রে চাকতি ঝুলিয়েছে; এমন ভাব করছে যেনো ওরা পাটখেত বা কচুরিপানার ভেতর থেকে আসে নি, ইলিশ বা পুঁটি ওরা কখনো দেখে নি, যেনো আকাশ থেকে দয়া ক'রে নেমেছে। খুব হাসি পেলো রাশেদের। রাশেদ চোখ বড়ো বড়ো ক'রে পর্দার খুব কাছে গিয়ে বড়ো মহাপুরুষ আর ছোটো মহাপুরুষ দুটিকে দেখতে চেষ্টা করলো। মমতাজ জানতে চাইলো সে অতো কাছে গিয়ে কী দেখছে; রাশেদ কোনো উত্তর দিলো না, আরো কাছাকাছি গিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। অনেকক্ষণ দেখে বললো, আমি ওদের উর্দিগুলো খুলে দেখার চেষ্টা করছি, ওরা বাঙালি কিনা, বাঙালি হ'লে মানুষ কিনা? এতো পোশাক আর দড়িতে ওদের ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। ওদের

আন্ডারওঅ্যারও খুলে দেখতে চাই। মমতাজ আবার আপত্তি জানালো, বললো, তুমি বড়ো অশ্লীল হয়ে উঠছো। কিন্তু রাশেদ যতোটা অশ্লীলতা করতে চায়, তা সে করতে পারছে না ব'লে তার সারাদেহ টনটন করতে লাগলো। অশ্লীলতা ছাড়া অশ্লীলতা থেকে মুক্তি নেই।

পর্দা জুড়ে এবার মহাপুরুষটিকে দেখানো হলো, খুব স্মিতগম্ভীর একটা ভাব ক'রে আছে সে, যেনো গ্রাম্য বাঙালি কোনোদিন মহাপুরুষ দেখে নি, বাঙালিকে সে মহাপুরুষ দেখাচ্ছে। টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে একটা ভাঁড় দেখে রাশেদ জোরে জোরে হেসে উঠলো, মৃদুও হেসে উঠলো। মৃদু রাশেদের কাছে জানতে চাইলো লোকটাকে দেখে তো তার খুব হাসি পাচ্ছে, লোকটা নিশ্চয়ই খুব হাসাতে পারে, ওকে আগে টেলিভিশনে কেনো দেখানো হয় নি, দেখালে তো বেশ মজা হতো। রাশেদ মৃদুকে জানালো এ-লোকটাই তার ইস্কুল বন্ধ ক'রে দিয়েছে। মৃদুর হাসি থেমে গেলো, তার মুখের ওপর ফিরে এলো আগের দুঃস্বপ্ন; ঘেন্নায় বাঁকা হয়ে উঠলো মুখ যেনো সে লোকটার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে। রাশেদের তলপেটে তখন কাসপিয়ান ভারী হয়ে আছে, সে জানে না এ-ভার কবে নামবে। ছত্রিশ বছরের জীবনে সে অনেক বিপ্লব দেখেছে, দেশে দেশে সে বিপ্লবে ধ্বংস হয়েছে, আবার জেগে উঠেছে ধ্বংসস্তূপ থেকে; আজ দয়া ক'রে আরেকটি বিপ্লব এসে তার তলপেট ভারী ক'রে তুলেছে। বিপ্লব, রাশেদ উচ্চারণ করলো, লেফরাইট লেফরাইট বিল্লব! শব্দটির যুক্তবর্ণ দুটিকে একটু উল্টেপাল্টে বললো, বিল্লব, বিল্লব! রাশেদ ভাবতে চেষ্টা করলো বিপ্লব শব্দের অর্থ কী, তার মনে আবর্জনা উপচে উঠতে লাগলো; একবার অভিধান দেখবে কিনা ভাবতেই ভয় পেলো হয়তো শব্দটি সেখানে নেই। নিজেকে সে প্রশ্ন করলো, রাশেদ, বলো তো শেষরাতে বিপ্লব করতে দরকার পড়ে কটা দস্যু? রাশেদের মতো ঘুমিয়ে ছিলো বাঙলাদেশও, জেগে উঠে ভোরে দেখতে পেয়েছে সে দস্যুদের অধিকারে। তার বন, নদী, ধানখেত, কুয়াশা, শিশির, দোয়েল, শাপলা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, সিলেট, মেঠোপথ, আল, মেঘ, রাড়িখাল, কোলাপাড়া, কামারগাঁও দস্যুদের বুটের নিচে। ওরা কি জন্মেছে বাঙলাদেশের জরায়ু থেকে, ওদের কি বুক থেকে মধুদুধ দিয়েছিলো বাঙলাদেশ, ওরা কি তার জলে সাঁতার কেটেছে, ভিজেছে তার বৃষ্টিতে? তার নিমের ছায়া কি কখনো পড়ে নি ওদের শরীরের ওপর, মাটির গন্ধ ঢোকে নি ওদের নাসারন্ধ্রে?

বুটের শব্দ শুনতে লাগলো রাশেদ, মনে পড়লো ছেলেবেলায় দেখা জীবনের প্রথম বিপ্লবকে। দেখার মতো একটা মহাপুরুষ এসেছিলো সেবার, বিপ্লবে সে জলবায়ু কাঁপিয়ে তুলেছিলো, রাশেদের সে-বছরই প্রথম পরিচয় হয় বিপ্লব শব্দটির সাথে। ওটি কোনো বইতে তখনো সে পায় নি, পাকিস্থানের সাবধান বইগুলো শব্দটিকে নিষিদ্ধ ক'রে রেখেছিলো; কিন্তু ওই মহাপুরুষ বিপ্লবকে বন্য শুয়োরের মতো ঢুকিয়ে দিয়েছিলো তাদের গ্রামেও। রেডিও ছিলো না গ্রামে, সংবাদপত্রও

যেতো না, কিন্তু অক্টোবর মাসে সেখানে মহাসমারোহে গোঁ গোঁ করতে করতে হাজির হলো বিপ্লব। মহাপুরুষদের ছবি দেখা প্রিয় অভ্যাস ছিলো রাশেদের, বিদ্যাসাগর নামের মহাপুরুষটির প্রতি তার খুব আবেগ জেগে উঠছিলো; তাঁর অনেক ছবি—একই ছবির অনেক কপি নানা বইপত্র থেকে কেটে সে সংগ্রহ করেছিলো, রাশেদ দেখলো পাকিস্থানের মহাপুরুষ তাঁর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; মহাপুরুষ সম্পর্কে ধারণাই বদলে গেলো রাশেদের। তার মনে হলো এটি মহাপুরুষ হ'লে বিদ্যাসাগর পুরুষও নন, আর বিদ্যাসাগর যদি মহাপুরুষ হন, তাহলে এটা দস্যু। এমন ভাবতে তার ভয় হচ্ছিলো, সে বুঝতে পারছিলো এমন ভাবা বড়ো অপরাধ, কেউ জানতে পারলে তার শাস্তি হয়ে যাবে, তবে কয়েক দিনের মধ্যে ইস্কুল ও বাজারের দেয়ালে দেয়ালে দস্যুটির এতো ছবি দেখতে পেলো যে রাশেদের বিশ্বাস জন্মালো এই প্রথম সে একটি খাঁটি মহাপুরুষ দেখলো। মহাপুরুষের বিশাল বিশাল ছবি আর গোঁফ দেখে রাশেদ মুগ্ধ হলো যখন সে দেখলো যে সবাই তার আগেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। রাশেদ একদিন বাজারে যখন মুগ্ধ হয়ে পাকিস্থানের ওই মহাপুরুষের ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলো, একটি কুকুর তাড়া খেয়ে এসে ছবিটি দেখে খুব মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কুকুরটি হয়তো ক্লান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, এমনও হ'তে পারে কুকরটি নিজের সামনে একটি অদ্ভুত জন্তু দেখে ভয় পেয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলো, তবে রাশেদের মনে হয় যে মহাপুরুষ চিনতে কুকুরও ভুল করে না। বাজারের পুবধারের চায়ের দোকানের বেড়ার গায়ে ঝোলানো ছিলো পাকিস্থানের ওই মহামানবের বিশাল ছবি। বাজারে গেলেই রাশেদ ওই ছবিটা দেখতো; মহাপুরুষের গোঁফ, বুকভরা তারা, কাঁধের ওপর থেকে সামনের দিকে বাঁধা দড়ি দেখে সে মুগ্ধ হতো, আবার ভয়ও পেতো। তখন এক বুড়ো, যাকে রাশেদ সব সময় চায়ের দোকানেই ব'সে থাকতে দেখতো, বলেছিলো, কী দ্যাখছো ভাইস্তা, খানের ব্যাডা বাঙ্গালিগো এইবার পাদাইয়া ছাড়বো। লোকটিকে খুব সন্তুষ্টই মনে হয়েছিলো, পারলে সে নিজেই পাদাতো বাঙালিদের, কিন্তু পারছে না; তার হয়ে পাদাবে ওই মহাপুরুষ।

আবর্জনার বাক্স থেকে উপচে পড়ছে আবর্জনা। রাশেদ শুনতে পেলো : যেহেতু দেশে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক জীবনে নেমে এসেছে অচলাবস্থা, বেসামরিক প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারছে না, সকল স্তরে যথেচ্ছ দুর্নীতি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, ফলে জনগণ অসহনীয় দুর্দশায় পড়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিপজ্জনক অবনতি ঘটেছে, শান্তি ও স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, যেহেতু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের অধীনে ন্যস্ত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, অতএব আমি সর্বশক্তিমান আল্লার সাহায্য ও করুণায় এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগণের দোয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিশেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারের সকল

ও পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করছি এবং ঘোষণা করছি যে গোটা বাঙলাদেশ অবিলম্বে সামরিক আইনের আওতায় আসবে। রাশেদ ঘোষণা শুনতে শুনতে অনুভব করলো যে ওগুলো ক্রমশ তার প্রস্রাবে পরিণত হয়ে তলপেটে জমা হচ্ছে। একেবারে পুরোনো ছকবাঁধা আবর্জনা, কোনো অভিনবত্ব নেই; সেই পুরোনো অর্থনীতি, আর শান্তিশৃঙ্খলা, জাতীয় স্বার্থ আর নিরাপত্তা, দেশপ্রেম আর আল্লা। বদমাশরা যদি বলতো যে দেশটাকে আমরা পাদিয়ে দিতে চাই, তাই ক্ষমতা দখল করছি, তাহলেও বোঝা যেতো ভেতরে কিছু আছে, কিন্তু ভাঁড়গুলো এসেছে, রাশেদ ভাবলো, শুধুই ক্ষমতার জন্যে। পর্দায় অনেকগুলো তারকাখচিত দড়িপ্যাঁচানো উদরপ্রলম্বিত জেনারেল দেখা গেলো; পেটের অবস্থা দেখেই রাশেদ বুঝলো দেশ দখল করা ছাড়া করার মতো ওদের কোনো কাজ নেই। কাজ থাকলে পেট এমন ফুলে উঠতে পারে না, অনেক দিন ধ'রে হয়তো তারা ওই পেটের জন্যে কামও করতে পারে নি।

সেই পরিচিত ভাঁড়টিই ক্ষমতা দখল করেছে, এখন সে দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। তার সঙ্গে আরো দুটি ছোটো ভাঁড়ও রয়েছে। সে এখন বাঙলার সম্রাট সুলতান শাহানশাহ, তার ক্ষমতার শেষ নেই; সে সংবিধান স্থগিত করেছে, বাতিল করেছে সংসদ ও সরকার, এবং পুরোনো প্রেসিডেন্টটিকে না মেরে আলুর বস্তার মতো বাড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছে। ওই বুড়োটা হয়তো এরই মধ্যে ক্ষমতা হারানোর শোকে মারা গেছে। মরুক সেটা, রাশেদের কিছু যায় আসে না, দেশের কারোই কিছু যায় আসে না, অনেক আগে মরলেই ভালো হতো; তবে সেটাকে এখনো যদি ডেকে এনে ওরা আধটুকরো গোশত দেয়, তাহলে সে ওদের 'স্যার, স্যার' করবে; কিন্তু ভাঁড়টা এখন ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের আল্লাতাল্লা। রাশেদ ঘোষণা শুনতে পেলো : আমি যে কোনো ব্যক্তিকে দেশের প্রেসিডেন্ট মনোনীত করতে পারি, যিনি বাঙলাদেশের প্রধান বিচারপতি অথবা আমার মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের যে কোনো বিচারপতির কাছে শপথ গ্রহণ করে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। আমি সময়ে সময়ে এমন মনোনয়ন বাতিল বা রদ করতে পারি এবং আরেক ব্যক্তিকে বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট মনোনীত করতে পারি। আমার মনোনীত প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপধান হবেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকরূপে আমার উপদেশ অনুসারে কাজ করবেন এবং আমি তাঁকে যে-সব দায়িত্ব দেবো, তা পালন করবেন। রাশেদ একটা চাকর নিয়োগের ঘোষণা শুনলো, সে জানে বাঙলায় এখন ওই চাকরের পদটির জন্যে অনেকের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে; কোনো একটা বিচারপতিকে হয়তো সে এর মাঝেই নিজের চাকর হিশেবে পেয়ে গেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই দেখা যাবে একটি ঝুঁটিপরা বিচারপতি আরেকটিকে শপথ করাচ্ছে চাকরের পদে। শপথটি হবে আমি ভাঁড়ের চাকর হিশেবে শপথ করছি যে মহাভাঁড় আমাকে যে-আদেশ দেবেন, তাই আমি পালন করবো; যদি তাঁর বুট চাটতে বলেন, আমি আনন্দের সাথে চাটবো; যদি তাঁর আন্ডারওঅ্যার ধুতে

বলেন, আমি ধুয়ে দেবো; যদি পা মর্দন করতে বলেন, তাহলে তার পাবত্র পদযুগল মর্দন ক'রে ধন্য হবো; যদি ট্রাউজার খুলে...

দেশটিকে এখন ভাগাভাগি করা হচ্ছে, কুমড়োর ফালির মতো চাক চাক করা হচ্ছে, রাশেদ তার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। রাশেদ শুনতে পেলো বড়ো ভাঁড়টির নিচে নিয়োগ করা হয়ে গেছে দুটি উপপ্রধান ভাঁড়, সে-দুটির বুকফোলানো ছবিও দেখানো হলো, তারা এমনভাবে বুক ফোলানোর চেষ্টা করলো যে টেলিভিশনের পর্দাটি একবার কেঁপে উঠলো, চড়চড় আওয়াজ হলো। একটি ঘোষক ব্যাঙের ফুর্তিতে গলা ফুলিয়ে ঘোষণা করলো সারা দেশকে পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে; ক অঞ্চলে জেনারেল করমালি, খ অঞ্চলে জেনারেল খরমালি, গ অঞ্চলে জেনারেল গরমালি ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছে রাশেদ। জেনারেল জেনারেল জেনারেল, জেনারেল জেনারেল জেনারেল, জেনারেল জেনারেল জেনারেল, জেনারেল জেনারেল জেনারেল, লেফটেনেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল, লেফটেনেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল, লেফটেনেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল শুনতে শুনতে তার খুব অদ্ভুত অনুভূতি হলো। তার তলপেটে একটি নিম্নমুখি চাপ আর বুকের দিকে একটি উর্ধ্বমুখি বমির চাপ তাকে একসাথে আক্রমণ করলো, দুটি বিপরীতমুখি চাপে তার এমন অনুভূতি হলো, যার সে নাম দিলো জেনারেলস্রাব। অভিনন্দন বাঙলাদেশ, রাশেদ বললো, জেনারেলজননী, জেনারেলগর্ভা বঙ্গ, অভিনন্দন। তোমার রূপের সত্যিই সীমা নেই, তোমার এতোটুকু জরায়ুতে এতো জায়গা, মাতা? রাশেদ একটি দৃশ্য দেখতে পেলো, মাতা বাঙলাদেশ রাস্তার পারে কাতরাচ্ছে প্রসববেদনায়, আর তার জননাঙ্গ ট্যাংক দিয়ে ঠেলে ছিঁড়েফেঁড়ে বেরোচ্ছে একের পর এক সানগ্লাসপরা জেনারেল, আর জেনারেল, আর জেনারেল।

টেলিভিশন থেকে গলগল ক'রে পড়ছে গণতন্ত্র, ঝরঝর ক'রে ঝরছে শান্তিশৃঙ্খলা, তরতর ক'রে চড়ছে অর্থনীতি;—পড়ার, ঝরার, চড়ার নানা রকম শব্দে তার অস্তিত্ব পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো। দেশ জুড়ে এখন সান্ধ্য আইন; বারো কোটি বাঙালির মতো রাশেদ বন্দী হয়ে আছে স্তূপ স্তূপ মিথ্যার মধ্যে, টেলিভিশনের নোংরা যন্ত্রটি কোনো কুৎসিত প্রাণীর মলত্যাগের মতো মিথ্যাত্যাগ ক'রে ঢেকে ফেলছে তাকে, সারা দেশ মিথ্যার মলে ঢেকে যাচ্ছে। চারপাশে এখন আর কোনো সত্য নেই, দেশে কোনো সত্য আর উচ্চারিত হবে না, মিথ্যাই আধিপত্য করবে সত্যের মুখোশ প'রে। রাশেদের ছেলেবেলায় প্রথম পুরব বাঙলার শ্যামলিমায় পঞ্চনদীর তীরে অরুণিমায় দেখা দিয়েছিলো এমন মিথ্যা, আবির্ভূত হয়েছিলো খানের পর খান, পাকিস্থান হয়ে উঠেছিলো খানস্থান; খানের পর খান ভাগ ক'রে নিয়েছিলো জন্মদ্বিখণ্ডিত অদ্ভুত দেশটিকে। আইউব, আজম, ওমরাও প্রভৃতি রোমহর্ষক খানে ভ'রে গিয়েছিলো পাকিস্থান। পূরব বাঙলায় অর্থাৎ রাশেদের ছেলেবেলার জগতের দিকে দিকে সাড়া প'ড়ে গিয়েছিলো; তারা কেউ

তখনো মিলিটারি দেখে নি, বাজারের উত্তর কোণে পান বেচতো যে-লোকটি, পুবপাড়ার যে-বারেক গ্রাম ছেড়ে কখনো শহরে যায় নি, পাকিস্থান বলতে যে বুঝতো তার গরুগুলোকেই, বা তার গরুগুলোর গোবর যার কাছে অনেক বেশি সত্য আর পবিত্র ছিলো পাকিস্থানের থেকে, তাদের ভূগোলের স্যার বা ইস্কুলের ঘণ্টা বাজাতো যে-দপ্তরি, তারা কেউ মিলিটারি বা আইউব খানকে দেখে নি, কিন্তু তাদের মনে যে সাড়া প'ড়ে গিয়েছিলো, রাশেদ তা বুঝতে পেরেছিলো। তাদের চাকরটিও খুশি হয়ে বলেছিলো, দাদা, আইউব খাঁর চ্যাহারাডা দেহার মতন। এক মাঝির খুশির চিৎকার আজো তার কানে বাজে : দ্যাশে মাশশাল ল আইন আইছে। মেষপাল যখন দূরে নেকড়ের গলার আওয়াজ শুনতে পায়, তখন এমনই খুশি হয়।

রাশেদ তখন প্রায়ই উঁকি দিতো ইস্কুলে স্যারদের বসার ঘরে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে শুনতো স্যারদের কথা, মনে হতো স্যাররা খুব খুশি হয়েছেন খানরা আসায়। প্রায় সব স্যারই বলতেন, পাকিস্থান বাঁচলো; শুধু সহকারী হেডমাস্টার স্যার, যিনি পড়াতেন সবচেয়ে ভালো এবং হিন্দু ছিলেন, তিনিই শুধু বলতেন, পাকিস্থান এবার মরলো। রাশেদ বুঝে উঠতো না দেশটিকে কী রোগে ধরেছিলো, কিন্তু বাঁচামরার কথা শুনে শুনে সে বুঝেছিলো পাকিস্থানকে এমন রোগে ধরেছে, যার পরিণতি বাঁচা বা মরা; তবে মরার সম্ভাবনাই বেশি। খুব ভয় লাগতো তার, কেননা তার ছেলেবেলায় মৃত্যুই ছিলো স্বাভাবিক ঘটনা; কলেরা ও বসন্তে সে ঘনঘন মৃত্যুর কথা শুনেছে, একটা দেশকেও কলেরা বা বসন্ত বা যক্ষ্মা রোগে ধরতে পারে ব'লে মনে হতো তার। অনেক দিন, পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকেই সে একটি ভয়ের মধ্যে রয়েছে, যা সে কারো কাছে প্রকাশ করে নি, কিন্তু সে একটি মানচিত্রে দেখেছিলো পাকিস্থানের এ-দিকটা এই দিকে ওই দিকটা ওই দিকে, পাকিস্থানের দুটি টুকরো আছে, কোনো শরীর নেই। তাহলে পাকিস্থান কি একটা ভূত, এমন প্রশ্ন জেগেছিলো তার মনে, সে শুনেছে ভূতদেরই শরীর থাকে না। কিন্তু সব স্যারই তো, শুধু এক স্যার ছাড়া, বলছেন পাকিস্থান বাঁচলো; তাতে সে একটু স্বস্তি পেয়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বস্তি থাকে নি, কেননা তার বিশ্বাস ছিলো সহকারী হেডস্যার যেহেতু সবচেয়ে ভালো পড়ান, অঙ্ক করতে কখনো ভুল করেন না, তাই তাঁর কথাই শেষে ঠিক হবে। স্যারদের ঘরে একটি কালিমাখা পত্রিকা আসতো, যার অনেক কিছু পড়াই যেতো না, রাশেদ দেখেছিলো বড়ো বড়ো অক্ষরে প্রতিদিন ছাপা হতো আইউব খানের নাম, আর ছবি। এতোবড়ো ছবি আর কারো ছাপা হতো না পত্রিকাটিতে; এবং তার ছবির নিচে লেখা হতো জাতির রক্ষাকর্তা, মহান ত্রাণকর্তা, আরো অনেক কিছু।

বাঙালি এমন জাতি, যে নিজেকে ঘৃণা করে; আর বাঙালি মুসলমান এমন জাতি, যে পশ্চিম থেকে কোনো বড়ো দেহের জন্তু এলেও তাকে খুব শ্রদ্ধা করে, নিজেকে তো ঘৃণা করেই। রাশেদের মনে আছে তার শিক্ষকেরা, গ্রাম ও বাজারের

বুড়োরা বড়ো বড়ো খানদের দেহ আর নামের প্রশংসায় পাগল হয়ে উঠেছিলো। এক স্যার আইউব খানের ছবি দেখিয়ে তাদের বলেছিলেন, চেহারাটা দ্যাখছস, পাঠানের বাচ্চা। এরা না অইলে পাকিস্থান রাখবো কি বাঙ্গালিরা? নিজেকে খুব অসহায় ব'লে মনে হয়েছিলো রাশেদের; এবং কয়েকদিন পর তাদের থানার বাজারে দলে দলে খাকিপরা মিলিটারি আসে। মিলিটারি এসেই বাজারের বড়ো বড়ো দোকানদারদের ধরে, তাদের কী অপরাধ তারা জিজ্ঞেস করারও সময় পায় না; মিলিটারিরা তাদের একেকজনের কাঁধে দু-তিনমণি বোঝা তুলে দেয়। বোঝা কাঁধে নিয়ে তাদের দৌড়োতে বলে, কিন্তু ওই বোঝা নিয়ে দাঁড়ানোই ছিলো অসম্ভব; দোকানদাররা বোঝার নিচে চাপা পড়ে, আর পাকিস্থান রক্ষাকারীরা তাদের ওপর চাবুক চালায়। দূর থেকে পাকিস্থান রক্ষার এ-দৃশ্য দেখে অনেকে পাকিস্থান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে ওঠে। তারপর তারা ধ'রে আনে সে-সব শয়তানদের, যারা রাজনীতি করে, যারা পাকিস্থানকে ডুবিয়ে দিচ্ছে; ধ'রে এনে চৌরাস্তায় ন্যাংটো ক'রে চাবুক মারে। পাকিস্থান বাঁচানোর প্রক্রিয়া দেখে চারপাশের সবাই এতো মুগ্ধ হয় যে বাজারের মৌলানা সাহেবের ইমামতিতে এক বড়ো মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

রাশেদ ও তার বন্ধুরা ভয় পেতে লাগলো হয়তো মিলিটারি একদিন তাদের ক্লাশে এসে তাদের কাঁধেও বোঝা তুলে দেবে, হয়তো বড়ো বড়ো বেঞ্চ তুলে দেবে, তারা না পারলে চাবুক মারবে; তবে তারা আসে নি, আসে তাদের আইন। হেডমাস্টার একদিন জানান সামরিক নির্দেশ এসেছে তাদের সকলকে একেবারে বাটিছাঁটা ক'রে চুল ছেঁটে আসতে হবে। তারা সবাই চুল ছেঁটে মাথা প্রায় চুলশূন্য ক'রে তোলে, তাদের ক্লাশগুলো অদ্ভুত দেখাতে থাকে; এ-অবস্থা দেখে সহকারী হেডমাস্টার স্যার বলেন, মাথাকে যে তোরা একেবারে পাকিস্থান বানিয়ে ফেলেছিস! তাদের চুলের ওপর দিয়ে সামরিক আইন চ'লে গেছে ভেবে যখন রাশেদ ও তার বন্ধুরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হচ্ছিলো, তখন, চুল ছাঁটার একদিন পরেই, হেডমাস্টার জানান সামরিক নির্দেশ এসেছে যে প্রত্যেককে বাড়ির চারপাশের জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে ঘরবাড়ি ঝকঝকে ক'রে ফেলতে হবে। পাকিস্থানে কোনো জঙ্গল থাকবে না; পাকিস্থানকে উর্দির মতো ইস্ত্রি করতে হবে, গোঁফের মতো ছাঁটতে হবে, বুটের মতো পালিশ ক'রে ফেলতে হবে। গ্রামে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো দেশে সামরিক আইন জারি হয়েছে, জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খান পাকিস্থান রক্ষা করেছেন, সামরিক আইনের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা চলবে না, যে-আদেশ দেয়া হয় তা মেনে চলতে হবে, এবং বাড়ির ময়লা আর জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে ফেলতে হবে। ঘোষণায় বারবার চাবুক মারার কথা বলা হলো, প্রতিটি অপরাধের জন্যে চাবুকের সংখ্যাও জানিয়ে দেয়া হলো। রাশেদ বুঝলো পাকিস্থানে আছে দুটি জিনিশ, একটি অপরাধ আরেকটি চাবুক; পাকিস্থানি মাত্রই অপরাধী, ও তার প্রাপ্য চাবুক। পাকিস্থানকে বাঁচাতে হ'লে প্রতিটি পাকিস্থানিকে

আচ্ছা ক'রে চাবুক মারতে হবে, গায়ের ছাল তুলে ফেলতে হবে, গলা দিয়ে রক্ত বমি করাতে হবে, পেছন দিয়ে মল বের করতে হবে, তবেই পবিত্র পাকিস্থান বাঁচবে। তাদের গ্রামের দাগু জেলা থানার হাটে কাপড় বেচতে গিয়ে রাস্তায় থুতু ফেলেছিলো, তার পিতামহ থেকে সে ও সবাই চিরকাল নিশ্চিন্তে থুতু ফেলে এসেছে, মনে করেছে থুতু ফেলা তাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, সে জানতো না যে থুতু ফেলা সামরিক আইনের ধারাভুক্ত হয়ে গেছে। দাগু রাস্তায় থুতু ফেলার অপরাধে পঁচিশ ঘা চাবুক খেয়ে সাত দিন ধ'রে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে থাকে, অন্যরা পাকিস্থানকে সুস্থ রাখার জন্যে থুতু গিলে ফেলার অভ্যাস করতে থাকে।

মিলিটারি দেখতে সবার আগে যারা থানায় গিয়েছিলো, যারা পাকিস্থান রক্ষার প্রক্রিয়া চোখে দেখে ধন্য হ'তে চেয়েছিলো, তাদের অন্যতম ছিলো কবুতরখোলার সবচেয়ে নামজাদা পাগলটি, সামরিক আইন জারির আগে যে ওই এলাকায় আইউব খানের থেকেও বিখ্যাত ছিলো, যার মাথায় ছিলো ঝোপের মতো চুল, যার জন্যে সে বিশেষ মর্যাদা পেতো, এবং অন্যান্য পাগলেরা সমীহ করতো। সে শ্রীনগর গিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিলিটারিদের সামনে দাঁড়ায়, এবং তার স্বভাবসুলভ বিখ্যাত সালামটি দেয়। সে যখন খাঁটি মুসলমান সেপাইদের কাছ থেকে অলাইকুমের আশায় দাঁড়িয়ে ছিলো, তখন দুটি মিলিটারি দু-দিক থেকে তাকে রাইফেলের গুঁতো মেরে মাটিতে ফেলে দেয়, এবং ন্যাংটো ক'রে এক এক ক'রে দশটি চাবুক মারে। সে তিন দিন অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে থাকে, শ্রীনগরে লোক যাওয়াআসা বন্ধ হয়ে যায়, এবং সারা এলাকার লোকজন তাদের প্রিয় পাগলের অবস্থার কথা শুনে অনেকটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মিলিটারিরা দোকানদারদের কাঁধে বোঝা চাপানোয় যারা খুশি হয়েছিলো, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে চাবুক মারাতেও যারা ক্ষুব্ধ হয় নি, বরং খুশিই হয়েছিলো, পারলে অনেক আগে তারা নিজেরাই চাবুক মেরে তার পিঠ ছুলে ফেলতো, কিন্তু তাদের প্রসিদ্ধতম পাগলকে চাবুক মারায় তারা মনে মনে ক্ষুব্ধ বোধ করতে থাকে। তবে তাদের করার কিছু ছিলো না, তারা যা করতে পারতো তাই করে, তারা শ্রীনগরে যাওয়া যথাসম্ভব কমিয়ে দেয়; এবং পাকিস্থান কীভাবে রক্ষা পাচ্ছে তাতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। পাকিস্থানের থেকে গায়ের চামড়াকে তারা অনেক বেশি ভালোবাসতে শুরু করে।

রাশেদ, ও তাদের কাজের ছেলেটি, তখন ব্যস্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নির্দেশ বাস্তবায়নে, যা অবিলম্বে বাস্তবায়িত না হ'লে পাকিস্থান বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। ইস্কুল থেকে পাকিস্থানের মহান ত্রাতার যে-ছবিটি সে পেয়েছিলো, সেটি সে লাগায় উত্তরের ঘরের বেড়ার গায়ে; ছবিটি দেখলেই মনে হতো পাকিস্থানের উদ্ধার হয়ে গেছে, বাকি শুধু তাদের বাড়ির উত্তর দিকে যে-জঙ্গল গজিয়েছে, গোয়াল থেকে গোবর উছলে প'ড়ে পাকিস্থানকে যেটুকু নোংরা করেছে, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ফেলা। ওইটুকু পরিচ্ছন্ন করতে পারলে পাকিস্থানের

কোনো চিন্তা নেই, হাজার বছর তো টিকবেই, তারও বেশি টিকতে পারে, কিন্তু কথা হচ্ছে টিকবে তো? তাদের বাড়ির উত্তরপশ্চিম দিকে ছিলো গোয়ালঘর, তার পুবে একটি বরইগাছ, তার পুবে কচু-ছিটকি-তেলাকুচের জঙ্গল,—খুব বেশি নয়, পাকিস্থানকে বিপন্ন করার মতো নয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কেননা শুরু থেকেই পাকিস্থান বিপন্ন। পাকিস্থানে সব কিছুই সন্দেহজনক, সব কিছুই ষড়যন্ত্র ক'রে চলছে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে; তাই ওই জঙ্গল আর তার ভেতরের পোকামাকড়ও ছিলো অত্যন্ত সন্দেহজনক, কে জানে প্রতিটি পোকা আর প্রতিটি মাকড় কী ষড়যন্ত্র ক'রে চলছে। রাশেদ আর তাদের কাজের ছেলেটি জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে। রাশেদের প্রথম মনে হয় হয়তো সত্যিই ছিটকি-কচু-তেলাকুচের জঙ্গলে মারাত্মক কিছু লুকিয়ে আছে, যা পাকিস্থানকে ঘায়েল ক'রে ফেলতে পারে, কিন্তু সে ওই জঙ্গলে কিছুই দেখতে পায় না। কাজের ছেলেটি শুধু দুঃখ করতে থাকে, দাদা, ছিটকি সব কাইট্টা ফেললে মেছেক করুম কি দিয়া? সে কয়লা দিয়ে দাঁত মাজতে পছন্দ করে না, প্রতিদিন ভোরে একটি ক'রে ছিটকির ডাল ভেঙে ব্রাশ তৈরি ক'রে, দাঁত মাজে আর ফেলে দেয়। সামরিক আইনে তার ব্রাশের বন বিপন্ন দেখে চাকরটি আর্তনাদ ক'রে ওঠে। রাশেদ তাকে বলে যে তার আর্তনাদ যদি শুনতে পায় মিলিটারিরা, যারা এখন পাকিস্থানকে রক্ষা করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, তাহলে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। শুনে ছেলেটি সত্যিই ভয় পেয়ে যায়, তবু সে বলে, দাদা, অহন থিকা কান্দনও কি দোষ? কানলেও কি পাকিস্থান মরবো? ছিটকি কাটতে গিয়ে রাশেদ একটি শালিককে ভয় পেয়ে উড়ে যেতে দেখে শালিকটির কাছে লজ্জিত বোধ করে এ ভেবে যে শালিকটি হয়তো তাকে মিলিটারি ভাবছে, কিন্তু সে যে মিলিটারি নয় এবং কোনোদিন হবে না, একথা শালিকটিকে জানাতে না পেরে খুব কষ্ট বোধ করে। শালিকটি একটি বাসাও বেঁধেছিলো, সেটি খ'সে নিচে প'ড়ে গেলো; রাশেদ সেটির দিকে তাকিয়ে অনুভব করলো যে শালিকের বাসার থেকে পাকিস্থান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্যে দরকার হলে শালিকের সব বাসা ভেঙে দেয়া হবে, দরকার হলে এক ডিভিশন মিলিটারি লাগিয়ে দেয়া হবে একটি বাসা ভাঙতে। একটু দূরেই তাদের গোয়ালঘর; রাশেদ দেখতে পেলো তারা যখন কচুগাছ কাটছে, তখন তাদের গোয়ালঘরের বেড়ায় কয়েকটি গুবরেপোকা খুব উত্তেজিত হয়ে ওড়াউড়ি করছে। ওড়ার ভঙ্গিটা খুবই আপত্তিকর, অনেকাংশেই রাজনীতিক, যা সামরিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন। গোয়ালঘরের বেড়ায় গুবরেপোকাগুলো বাসা তৈরি ক'রে বাস করছিলো হয়তো বংশানুক্রমিকভাবে, কিন্তু পাকিস্থান রক্ষার জন্যে তাদের উৎখাত না ক'রে উপায় নেই। গুবরেপোকারাও পাকিস্থানের অধিবাসী, তাদেরও মেনে চলতে হবে সামরিক আইন। কিন্তু শ্রীনগরে তখন একটি মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহিতার ঘটনা ঘটে যায়।

পাগলটিকে চাবুক মারার পর সারা এলাকায় চাপা ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে; ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও দোকানদারদের চাবুক মারায় লোকজনের মুখে যে-খুশির ঝিলিক দেখা গিয়েছিলো, তা মিলিয়ে যায়, এবং তারা পরস্পরের সাথে দেখা হলেই এ-বিষয়ে গোপনে আলাপ করতে থাকে। তাদের প্রিয় পাগলকে যারা চাবুক মেরে রাস্তায় ফেলে রাখতে পারে, নির্দ্বিধায় কেটে ফেলতে পারে তার জট, তাদের সম্বন্ধে বেশ ঘন একটা সন্দেহ দেখা দেয়। রাশেদদের বাড়িতে যে-বুড়ীটি দুপুরের আগে ভিক্ষা করতে আসে, সেও এসেই ভিক্ষা চাওয়া ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের দোয়া করার আগে পাগলটির কথা বলে, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে যে এমন ভালো পাগলটিকে যারা এমনভাবে মারতে পারে, তাদের কপালে অনেক দুঃখ লেখা আছে। রাশেদ পাকিস্থানের কপালটির কথা ভাবতে চেষ্টা করে, সেখানে ফেরেশতার নিজ হাতে টানা ভবিষ্যৎ দুঃখের দাগগুলোও দেখার চেষ্টা করে। বাবা খাওয়ার সময় বলেন যারা পাগলকেও এমনভাবে চাবুক মারতে পারে, তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার। যখন সবাই নিঃশব্দে ক্ষুব্ধ জীবন যাপন করছিলো, তখন শ্রীনগরে একটি দ্রোহিতার ঘটনা ঘটে। বাজারের পাগলিটি, যে পাগলটির জনপ্রিয়তাকে ঈর্ষার চোখেই দেখতো সব সময়, মনে করতো যে-জনপ্রিয়তা তার ভাগে পড়ার কথা ছিলো তা ওই পাগলা তার থেকে অবৈধভাবে কেড়ে নিয়েছে, সে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। কয়েক দিন ধ'রেই তাকে কখনো বিমর্ষ কখনো উল্লসিত দেখাচ্ছিলো। এক দুপুরে যখন পাকিস্থান রক্ষাকারীদের একটি দল তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন সে দলের নেতার মুখ লক্ষ্য ক'রে একটি কালো পাতিল ছুঁড়ে মারে। পাতিলটি মেজরের মুখে গিয়ে গোলাবারুদের মতো বিস্ফোরিত হয়, মেজরের নাকের ভেতর একটি চাড়া ঢুকে যায়, কপাল ফেটে রক্ত বেরোতে থাকে; মিলিটারিরা পাগলিকে লক্ষ্য ক'রে অনবরত মেশিনগান চালায়। তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়, এবং মেজরের মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হ'লেও পাকিস্থান অক্ষতভাবে রক্ষা পায়। এ-ঘটনার পর বাজার থেকে সবাই পালিয়ে যায়, বিশেষভাবে পালায় বাজারের গৌরব পাগলপাগলিরা, তারা আর শ্রীনগরে ফেরে না। কারো মুখে কালো পাতিল মারা চরম অপমানের ব্যাপার, ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি শয়তান রয়েছে, যাদের অনেকেই ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর বা প্রেসিডেন্ট, যাদের মুখে একাধিকবার কোনো-না-কোনো নারী কালো পাতিল মেরেছে; কিন্তু পাকিস্থানের মুখে কালো পাতিল মারার ঘটনা এই প্রথম।

রাশেদ আর কাজের ছেলেটি বাড়ি পরিষ্কার ক'রে চলেছে। রাশেদকে বিশেষ চিন্তিত করে গুবরেপোকাদের আবাসিক সমস্যাটি; তারা যতোই জঙ্গল পরিষ্কার করতে থাকে, রাশেদ দেখতে পায়, পোকাগুলো আবাস বদল করতে থাকে। পুব দিকের বেড়ার গা থেকে স'রে গিয়ে উত্তর দিকের বেড়ার গায়ে বাসা বাঁধে, কিন্তু আগের মতো নিশ্চিন্তে তারা ঘুমোতে পারে না, তাদের ওড়ার মধ্যে উদ্বেগের ছাপ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। রাশেদকে বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করতেই হবে;

সে পাকিস্থান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মনে মনে গুনগুন ক'রে উত্তরের ঘরের বেড়ার গায়ে লৌহমানবের ছবিটা দেখতে দেখতে জঙ্গল পরিষ্কার করে, এবং পাকিস্থানে গুবরেপোকার জীবনের পরিণতি সম্পর্কে একটা ধারণা ক'রে নেয়। গোয়ালঘরের ভেতরটাও পরিষ্কার করে তারা; শুকনো গোবর ও গুবরেপোকার একটি চমৎকার গন্ধ ঢোকে তার নাকে, এবং তাদের আক্রমণে গুবরেপোকাগুলো অস্থির হয়ে গোয়ালঘর থেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাইরের দিকে বেরোয়, অধিকাংশই তাদের অভিযানে প্রাণ হারায়। তাদের যে-দিন জঙ্গল কাটা শেষ হয়, গোয়ালের চারদিক যে-দিন তারা পরিষ্কার করে, পাকিস্থান সে-দিন নির্বিঘ্ন হয়; এবং রাশেদ দেখে গুবরেপোকাগুলো পিছু সরতে সরতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

২ দোয়েল ও অনন্ত প্রস্রাবধারা

ভাঁড়রা এলে প্রথম যে-খসখসে বিরক্তিটা সহ্য করতে হয়, ইচ্ছে হয় সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে, তা আবদ্ধতার বিরক্তি; অন্ধকারের দেবতারা কয়েক দিনের জন্যে জারি ক'রে দেয় সান্ধ্য আইন। অন্ধকার তাদের খুব প্রিয় ও প্রয়োজনীয়, আইনটাকে সান্ধ্য বলা হ'লেও এটা নৈশ বা বর্বর আইন। সান্ধ্য আইন অন্যদের কেমন লাগে, তা জানে না রাশেদ, তার হয় দশ তলায় লিফটে আটকে থাকার অনুভূতি, আর তলপেটে একটি গর্জনশীল বদ্ধ প্রপাত নিয়ে লিফটে আবদ্ধ থাকা সুখকর নয়। একটা টেলিফোন থাকলেও কিছুটা মুক্তির স্বাদ সে পেতে পারতো, আহা মুক্তি; বা তখন হয়তো আবদ্ধতাটা হতো আরো কর্কশ, টেলিফোন হয়তো সামরিক নির্দেশে কয়েক দিনের জন্যে লাশ হয়ে প'ড়ে থাকতো, আর জীবিত থাকলেও 'কেমন আছো', 'ভালো আছি'র অতিরিক্ত কোনো কথা কেউ তার সাথে বলতে রাজি হতো না; তার বন্ধুদের কেউ কেউ, যদি তাদের টেলিফোন থাকতো, হয়তো টেলিফোনই তুলতো না। একটা মিথ্যা পরিবেশে তাকেও মিথ্যার অভিনয় করতে হতো; মিথ্যা খুবই প্রজননশীল, একটি আরেকটি, না আরো অনেকগুলোকে জন্ম দেয়। তার টেলিভিশনটা রঙিন হ'লেও বেশ হতো; ভাঁড়গুলোর পোশাকগুলো আরো উজ্জ্বল আকর্ষণীয় দেখাতো, তারাগুলো আরো জ্বলজ্বল করতো, চোখ ভালো থাকতো, ঘোষণাগুলো আরো রঙিন শোনাতো, আর যে-ঘোষিকাটির ঠোঁট দুটি ওষ্ঠ না বৃহদোষ্ঠ বোঝা যাচ্ছে না, তাকে আরো প্রবলভাবে উপভোগ করা যেতো। এক বস্তাপচা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশ, কোনো মৌলিকতা খুঁজে পাচ্ছে না রাশেদ,—প্রতিক্রিয়াশীলতায়ও কিছুটা মৌলিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়; সব বিধিবিধান আগের বিধিবিধানের রঙচটা প্রতিলিপি, ঘোষকঘোষিকাগুলো মনের আনন্দে বমি করার মতো সেগুলো মুখস্থ ঢেলে দিচ্ছে। মুখস্থ রাশেদেরও; সেও মুখস্থ ব'লে দিতে পারে : ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী বেআইনি অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রভৃতি রাখার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হ'তে পারে;

১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি সংগ্রহের জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হ'তে পারে; ১৪ নম্বর ধারায় যে-কোনো লোকের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো রাজনীতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হ'তে পারে; ১৫ নম্বর ধারা অনুয়ায়ী সামরিক আইনকে সমালোচনা করার জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হ'তে পারে। এর মাঝে ওরা হয়তো ৫টা মন্ত্রী, ৩টা আমলা, আর গোটা ২ চোরাচালানিকেও ধরেছে। ভাঁড়টা প্রথম ধরেছে বা ধরবে কাকে? নিশ্চয়ই সেই অবাঙালি চোরাচালানিটাকে, যার চোরাচালান ও ধর্মে সমান মতি, তবে চোরাচালানের জন্যে নয়, মালের জন্যে; যেখানেই হাত দাও সেখানেই আধমণ মাংস, এমন একটা ওপরতলার পতিতাকে নিয়ে কয়েক দিন আগে চোরাচালানিটার সাথে খুব একচোট হয়ে গেছে ভাঁড়টার, চোরাচালানিটা ট্রাউজারের জিপ খুলে দেখিয়েছে, বলেছে তার মতো কয়েকটা জেনারেল সে পাছপকেটে রাখতে পারে। সেটাকে নিশ্চয়ই ধরা হয়ে গেছে, যদি সেটা আগেই বিদেশে পালিয়ে না গিয়ে থাকে। এসব ধরাধরি ওদের আবির্ভাবের অবিচ্ছেদ্য অভিনয়-অংশ, দানবদের দেবতা ক'রে তোলার চেষ্টা; এখন মাঠের রাখাল আর রাস্তার পতিতাও ধরাধরির পরিণাম জানে, কয়েক দিন পর ওরা দিনরাত ঘুষ খাবে, বন্দরে বন্দরে চোরাচালানে লিপ্ত হবে, অন্যের সুন্দরী বউকে পত্নী বা উপপত্নী ক'রে তুলবে, যেগুলোকে সবার আগে ধরবে কয়েক মাস পর সেগুলোই হবে ওদের প্রধান ইয়ার।

একটা আস্ত উল্লুক দেখার সুখ পাওয়া গেলো। একটা আস্ত উল্লুককে, আমুণ্ডু উল্লুকের মতোই দেখাচ্ছে ওটাকে-আচ্ছা, উল্লুক কাকে বলে?-না একটা অবসরগ্রস্ত অবসাদগ্রস্ত উল্লুককে চাকর হিশেবে পেয়ে গেছে ভাড়টা, বাঙলায় কী যেনো একটা গান আছে, তোমার বিচার করবে যারা। পাবেই তো, কেনো পাবে না, চাইলে সে দশটা পেতে পারতো, কিন্তু দশটা চাইতে পারছে না এ-মুহূর্তে, তার একটাই লাগবে এখন,-উল্লুকের অভাব নেই উল্লুকমুল্লুকে, আপাতত তার একটা উল্লুকই দরকার, যে তার জুতো সাফ করবে, তাকে জুতো পরিয়ে দেবে, আন্ডারওঅ্যার খুলে দেবে, পা টিপে দেবে, তাকে, এবং বাঙালিকে, তামাসা দেখাবে। বাঙালি বড়োই তামাসা পছন্দ করে। উল্লুকটা শপথ নিচ্ছে, কাঁধজোড়া ঝুঁটিপরা আরেকটা তাকে পবিত্র কাজের মতো শপথ করাচ্ছে, আহা, ওরা পবিত্রতা-অপবিত্রতার পার্থক্য বোঝে না। ওরা না শপথ করেছিলো সংবিধান না কী যেনো রক্ষা করার, এখন ওরা কী করছে তা কি বুঝতে পারছে ওরা? ওদের হাতের কাগজে বাঙলায় যা লেখা, আর ওরা যা পড়ছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন; ওরা বলছে আমি শপথ করছি যে ভাঁড় আমাকে পা টিপতে বললে আমি পরম ভক্তিতে পা টিপবো, যদি আমাকে আন্ডারওঅ্যার ধুয়ে দিতে বলেন, আমি তা পবিত্র কাজ ব'লে সম্পন্ন করবো, যদি আমার প্যান্ট খুলতে বলেন, আমি তা পরম সন্তোষের

সাথে সম্পাদন করবো। উল্লুক দুটি কি আন্ডারওঅ্যার পরেছে? দাঁড়ানোর ভাঙ্গ দেখে রাশেদের মনে হলো ওদের আণ্ডারওঅ্যার খুব ঢিলে হয়ে গেছে, দুটিরই হোল আন্ডারওঅ্যারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ঢলঢল ক'রে ঝুলছে, বারবার রানে পেন্ডুলামের মতো ঘা দিচ্ছে, ঢুশঢুশ আওয়াজ হচ্ছে। ভাঁড়টা শপথের দৃশ্য দেখে হাসছে তৃপ্তির সাথে, একটা উপযুক্ত চাকর পাওয়ার দৃশ্যটা তার খুবই উপভোগ্য লাগছে, হয়তো ভাবছে ভবিষ্যতে এমন আরো কতো চাকর শপথ নেবে তার আন্ডারওঅ্যার পরিষ্কার করার। চাকর বানানোর উৎসবে অনেকেই, দুটি বাতিল রাষ্ট্রপতিও, এসেছে, একটা গোলগাল কচ্ছপ আরেকটা লিকলিকে শুকনো তেঁতুল, দেখে মনে হচ্ছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির গৌরবে তারা ঝলমল করছে। এ-দৃশ্য দেখে অন্যান্য উল্লুকদের কেমন লাগছে, ভাবতে চাইলো রাশেদ, নিশ্চয়ই তাদের কলজে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষে উল্লুকটা খুব একটা ভাব ক'রে বেরোনোর ভঙ্গি করার চেষ্টা করছে, তবে আণ্ডারওঅ্যার-পেরোনো ঢলঢলে হোল নিয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করছে, সম্ভবত ঢুশঢুশ শব্দটা তাকে কাতর ক'রে ফেলেছে। রাষ্ট্রপতির হোল থাকা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এখন ওটা যাবে কোন নরকে? প্রথমে ভাঁড়টার পা টিপবে; তারপর কয়েকটি মাজারের উদ্দেশে বেরোবে, গিয়ে ইটসিমেন্টকংক্রিটকে বলবে দেখো, আমি কী চমৎকার চাকর হয়েছি, তোমাদের জন্যে ফুল নিয়ে এসেছি, যদিও ফুলটুলের অর্থ আমি বুঝি না, তোমরাও বুঝতে না।

বাঙলাদেশ, তুমি কেমন আছো, সুখে আছো না কষ্টে, নাকি তুমি এসবের বাইরে চ'লে গেছো, তোমার ভূমিকা শুধু চিৎ হয়ে থাকা, কে চড়লো তাতে তোমার কিছু যায় আসে না, সরাসরি বাঙলাদেশের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে রাশেদের। বাঙলাদেশ কোনো উত্তর দিচ্ছে না, সে কি বলাৎকারে বলাৎকারে অচেতন হয়ে আছে, তার রান বেয়ে রক্ত ঝরছে; রাশেদ শুধু তার তলপেটে মরা জলপ্রপাত নিয়ে স্তব্ধতার স্বর শুনছে। খুব কি আহত হয়েছে বাঙলাদেশ, তার বুক কি কুমড়োর মতো ফালি ফালি হয়ে গেছে, গ-ণ-ত-ন্ত্র হারিয়ে চ্যাঁচামেচি করছে কি তার কলজে; না খুশিতে বারবার মুড়ি ভাজছে, আদার কুঁচি আর কাঁচা মরিচ ছিটোচ্ছে, আর কড়া চা খাচ্ছে? একটা সন্দেহ জেগে উঠলো রাশেদের মনে, নিজেরই সম্পর্কে, পিতার সম্পর্কে, যে-গোত্রের সে-অংশ, সে-বাঙালি মুসলমান নামের হনুমানদের সম্পর্কে। ক-গেলাস গণতন্ত্র আর স্বাধীনতা সহ্য করতে পারো, বাঙালি মুসলমান, জিজ্ঞেস করলো রাশেদ, তোমার শেকড়টা কোথায়, কতোদূর শেকড় তুমি ছড়িয়েছো মাটির ভেতরে, মানুষের ভেতরে, সভ্যতার ভেতরে? বাঙালি মুসলমান, তুমি কি সভ্য, যদি তাই হও তাহলে তুমি এতোদিন পাকিস্থানে রইলো কেমন ক'রে? দোজগে থাকাও অস্বাভাবিক মনে হয় না রাশেদের কাছে, শুধু অস্বাভাবিক পাকিস্থানে থাকা। রাশেদ অনেকবার বমি করেছে দুটি গান গাওয়ার পর; ইস্কুলে 'পূরব বাঙলার শ্যামলিমায় পঞ্চনদীর তীরে অরুণিমায়' গাওয়ার পর তার বমি পেয়েছিলো, তারপর 'পাক সরজমিন সাদবাদ'

গেয়ে বমিই ক'রে ফেলেছিলো। আসলেই কি বমি করেছিলো সে, নাকি ওই গান গাওয়ার সময় তার যে বমি পায় নি, এতে এখন তার বমি পাচ্ছে? রাশেদ জিজ্ঞেস করতে থাকে, যারা পাকিস্থানের সাথে থাকতে পারে, ওই গান গাইতে পারে, তারা যুদ্ধ করলেও স্বাধীন হয়ে গেলেও দেশ সৃষ্টি করলেও তাদের সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়।-বাঙালি মুসলমান আমি তোমার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি, চিরকাল পোষণ করবো। রাশেদ জিজ্ঞেস করতে থাকে, মার্চের শেষরাত্রে ভাঁড়গুলো কি হঠাৎ এসেছে, বাঙালি মুসলমান, তুমি কি এদের জন্ম দাও নি, আসার পথ বানাও নি? রাশেদ জিজ্ঞেস করতে থাকে, তুমি বাঙালি মুসলমান নও, বাঙালি? হাঁ, হাঁ ক'রে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো রাশেদের; হিন্দুগুলোও যেখানে মুসলমান হয়ে উঠেছে, কী চমৎকার সালামালাইকুম দেয়, পাঁচকলমাও মুখস্থ বলতে পারে, আর সেখানে মুসলমান, যে লুঙ্গির নিচে হাত দিয়ে খোঁজে আত্মপরিচয়, সে হয়েছে বাঙালি। যেগুলোকে খোয়াড়ে ভ'রে ভাঁড়েরা এলো, সেগুলো কি গণতন্ত্র দিয়ে দেশ বাঁধাই ক'রে দিয়েছিলো, স্বাধীনতায় গোলা ভ'রে দিয়েছিলো? ওদের প্রত্যেকের কি ফাঁসির দড়ি প্রাপ্য নয়? রাশেদের তলপেটে খুব চাপ পড়ছে, সে বারবার বাথরুমে যাচ্ছে, তার যেটা মাননিঃসরণ তাও ঘটাচ্ছে, কিন্তু চাপটা অটল থাকছে।

ভাঁড়রা যে আসবে, অনেকখানি এসে গেছে, এটা অজানা ছিলো কার, এর জন্যে অপ্রস্তুত ছিলো কে? কয়েক দিন আগেও যেখানেই গেছে রাশেদ, যার সাথেই কথা বলেছে, সে-ই কি সব কথার মধ্যে মাঝেমাঝে বলে নি দেশের যে-অবস্থা তাতে মিলিটারি আসাই ভালো? যে-আমলা ঘুষ খেতে খেতে চর্বির জন্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে, সেও যেমন বলেছে কুত্তারবাচ্চাদের অর্থাৎ ওই একপাল মন্ত্রীর থেকে মিলিটারি অনেক ভালো, ঘুষ যে-জীবনে চোখে দেখে নি ব'লে স্বপ্নেও দেখে নি, সে-শিক্ষকও বলেছে শুয়োরগুলোর থেকে মিলিটারিই ভালো। রাশেদ রিকশাঅলাদের সাথে কথা ব'লে দেখেছে, সে মাঝেমাঝেই রিকশাঅলাদের সাথে কথা ব'লে ক্লান্তি কমিয়ে আনে বা সে যে সাধারণ মানুষের দরদী এটা নিজেকে বোঝাতে চায়, তারাও বলেছে মিলিটারিই ভালো। কয়েক দিন আগে এক বন্ধুর উপপত্নীর বাসায় সন্ধ্যা কাটাতে গিয়েছিলো, তাদের সামনে ব'সে সারাক্ষণ ঝিমোচ্ছিলো কালোবাজারি স্বামীটা, বন্ধুটি টেলিফোন করতে যাওয়ার ছুঁতোয় পুব কোণার শয্যাকক্ষে গিয়ে মৃদু মৃদু চুমো খেয়ে আসছিলো তার অধ্যাপিকা উপপত্নীকে, যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাশেদকে বলছিলো, রাশেদ ভাই, আপনার কতো সুখ, হাঁটতে হাঁটতে আপনি কতো কথা ভাবতে পারেন; আমি যেখানে যাই গাড়িতে যাই কোনো কথা ভাবার সময়ই পাই না, বহুদিন আমি কিছুই ভাবি না, সেই পঞ্চাশী তন্বীও বলেছিলো, এর চেয়ে মিলিটারিই ভালো। তার স্বামীটি-কার থেকে, আমার থেকে?-ব'লে রসিকতা করতে গিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলো, কেননা মহিলা মুহূর্ত দেরি না ক'রে বন্ধুটির নাম ক'রে বলেছিলো, তোমার থেকে তো রফিক সাহেবও উত্তম। পতির থেকে উপপতি সব সময়ই উত্তম, পত্নীর থেকে

উপপত্নী যেমন আবহমান কাল ধ'রে উত্তম। যেগুলোকে তাড়িয়ে ওরা এসেছে, রাশেদ তাদের প্রায় প্রত্যেকটিকেই চেনে, কারো কারো সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো তার, যদিও অনেক দিন যোগাযোগ নেই, ওইগুলো যে একেকটা আস্ত শুয়োরের বাচ্চা বাঙলার মূর্খ জনগণেরও তাতে সন্দেহ ছিলো না। যদি চাষী, রিকশঅলা, মাঝি, জেলে, শ্রমিকের কোনো ক্ষমতা থাকতো, তাহলে তো তারা ওগুলোকে ধ'রে ফাঁসিতে ঝুলোতে অনেক আগেই; ক্ষমতা ছিলো না ব'লে, তারা যেহেতু শুধুই ক্ষমতার উৎস, হারামদাজারা ক্ষমতার পরিণতি, তারা ওগুলোর জন্যে তোরণ বানিয়েছে, ওদের নামে ভিড় ক'রে শ্লোগান দিয়েছে। বুড়ো আলুর বস্তাটিও ছিলো অস্থিতে অস্থিতে গিঁঠে গিঁঠে বদমাশ, কোনো-না-কোনো প্রভুর পা চেটেছে সারাজীবন, এবং উঠতে উঠতে সকলের মাথার ওপর উঠে গিয়েছিলো। এখন আলুর বস্তার মতো নিজের ঘরে প'ড়ে আছে, সেটা মরলে একটা লাশ ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতো না। লাশ এখানে অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু ওর লাশের মূল্য একটা কুকুরের লাশের থেকে একপয়সাও বেশি নয়।

সামরিক ভাঁড়রা যদি পারতো, তাহলে সান্ধ্য আইনেই ঢেকে রাখতো আকাশ-মাটি-জল চিরকালের জন্যে, অন্তত ওরা যতোদিন থাকবে ততোদিন ধ'রে, কিন্তু তা সম্ভব নয় ব'লে দু-তিন দিনে যাকে ধরার, ধ'রে, যাকে মারার, মেরে, এবং যাকে চাকর বানানোর, তাকে চাকর বানিয়ে সান্ধ্য আইন তুলে নেয়। রাশেদের প্রস্রাব এখনো জ'মে আছে তলপেটে, রাশেদ এর নাম দিয়েছে শাশ্বতপ্রস্রাব, তা নিয়ে বাইরে বেরোয়। সবাই বলবে সে একা বেরোচ্ছে, রাশেদ জানে একা বেরোচ্ছে না, তার সাথে বেরোচ্ছে তার ওই অদ্ভুত স্তব্ধ প্রপাতটি, যা সে প্রচণ্ড চেপেও বের ক'রে দিতে পারছে না। একটু অচেনা লাগছে সব কিছু যদিও কিছুই অচেনা নয়, রাস্তাগুলো যেনো তাকে দেখে একটু লজ্জা পাচ্ছে, সেও লজ্জা পাচ্ছে রাস্তার মুখের দিকে তাকাতে; মনে হচ্ছে সান্ধ্য আইনের আড়ালে চোখের আবডালে ওরা সম ও বিষম সব ধরনের মৈথুন ক'রে ক'রে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। বেরিয়েই রাস্তায় চোখে পড়লো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, তবে ওরা খুব বীরের মতো দাঁড়িয়ে নেই, দেশকে উদ্ধার ক'রে ফেলেছে এমন ভাব হেলমেটে ও গোঁফে কিছুতেই দানা বাঁধাতে পারছে না, অপরাধের চিহ্নই স্পষ্ট লেগে আছে ওদের উর্দিতে। মুদি দোকানদারটা আগের মতোই হাসছে, তবে একটু বিব্রত ও কথায় একটু পরিহাসের ঝাঁজ; রিকশাঅলাটা পা চালাচ্ছে, আর বাঁকা হয়ে মিলিটারি ট্রাকের দিকে তাকিয়ে হাসছে। রাশেদ যাবে তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে রাশেদ পড়ায়; অন্যরা সেটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ই মনে করে, নামও বিশ্ববিদ্যালয়; রাশেদের কাছে ওটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ই। সে ওটাকে কেনো মনে করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভালোবেসে, না ঘেন্নায়, তা ভালো ক'রে সেও জানে না; তবে বিদ্যালয়ের কথা মনে হ'লেই তার মনে প'ড়ে যায় বাল্যকালের কবরঘেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে, যেখানে গিয়ে তার আবার ভর্তি হ'তে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা সম্ভব নয় ব'লে এটাকেই মনে করে তার প্রাথমিক বিদ্যালয়। কেনো যেনো

তার মনে হয় মুসলমানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মানায় না, মানায় মাদ্রাসায়, যেখানে দেড় হাজার বছর ধ'রে সব কিছু মুখস্থ ক'রে ফেললেও জ্ঞানের জ-ও জন্মে না। রাশেদ আশা করেছিলো দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছে শহর, চোখ মেলে তাকাতে পারছে না, কাঁদতে কাঁদতে ব্লাউজ উপচে তার প্রকাণ্ড স্তন বেরিয়ে পড়েছে, এমন ভাব দেখবে শহরের শরীরে; কিন্তু শহরের দেহের সহ্যশক্তি দেখে মুগ্ধ হলো রাশেদ। লোকজনের মুখে একটু বিনীত বিনীত ভদ্র ভদ্র ভাব চোখে পড়লো রাশেদের, চৌরাস্তার ভিখারিটাও একটু বিনয়ের সাথে ভিক্ষা চাইছে, সবাইকে একটু ক্লান্ত সুন্দর লাগছে, হয়তো দু-তিন দিনের সান্ধ্য আইনের সুযোগে পেট ভ'রে সঙ্গম ক'রে তারা নতুন বরের মতো শ্রান্ত সুন্দর হয়ে উঠেছে। মাস দশেক পর দলে দলে জন্ম নেবে সামরিক শিশুরা। সামরিক আইন এলে বাঙালি মুসলমান প্রথমে খুব শান্তশিষ্টসুন্দর হয়ে ওঠে, এবারও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। রিকশার পাশ কেটে একটা লাল গাড়িতে একটা গোলগাল রাজনীতিবিদকে যেতো দেখলো রাশেদ, তার মুখও শ্রান্তসুন্দর; হয়তো সে ভীড়দের সাথে দেখা ক'রে ফিরলো, বা দেখা করতে যাচ্ছে, বা দেখা করার সুযোগ না পেয়ে বিষণ্ণতায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

রাশেদ যে-রিকশাটায় ব'সে আছে, যে-রিকশঅলা তাকে টানছে, তার পাশ দিয়ে যে-গাড়িগুলো যাচ্ছে, দোকানে দোকানে ঝুলছে যে-সাইনবোর্ডগুলো, আর যে-বাঙালি মুসলমান দু-দিন পর রাস্তায় বেরোনোর অধিকার পেয়েছে, তারা বেগম হাওয়ার জরায়ু থেকে বেরোনোর পর থেকেই অধিকারহীনতায় অভ্যস্ত ব'লে মনে হচ্ছে রাশেদের। তাদের পিঠে চাবুকের দাগ, দাগ তাদের চোখে সুন্দর অলঙ্কারের মতো, চাবুক তাদের কাছে সুখকর। রিকশাঅলাটিকেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে রাশেদের যে সে মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা জানে কিনা, সে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের কথা জানে বা শুনেছে, কিন্তু মুক্তির কথা জানে না; টয়োটায় সামরিক বিধিনিষেধ মেনে চ'লে গেলো যে-লোকটি, তার মুখ দেখে তো মনে হলো না কয়েক দিন আগে তার একটা বড়ো সম্পদ ছিলো, এখন সে তা হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়ে গেছে। কারো মুখ দেখেই তা মনে হচ্ছে না। সে যখন তার প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে গিয়ে পৌঁছোবে, রাশেদের ভয় হ'তে লাগলো, সেখানে সবার এতো উল্লাস দেখবে যে সেও উল্লসিত হয়ে উঠবে, সে ভুলে যাবে তার জন্মজন্মান্তরের পিঠের দাগটিকে; ওই বিদ্যালয়ের সামনে অতিকায় যে-মূর্তিগুলো রয়েছে, রাশেদের আরো বেশি ভয় করতে লাগলো যে সেগুলোর মুখেও সে কোনো কষ্ট দেখতে পাবে না, দেখতে পাবে উল্লাস। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের চা-ঘরটিতে খুব ভিড়, উল্লাসে ফেটে না পড়লেও কাঁপছে ঘরটি, কালো যে-ছেলেটা অন্যান্য দিন বিকলাঙ্গের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চা আর শুকনো বিস্কুট পরিবেশন করে, যাকে চা নিয়ে আসতে বলাটাকে অপরাধ ব'লে মনে হয় রাশেদের, সেও খুব তৎপর হয়ে উঠেছে, মনে হয় তার আরেকটা পা গজিয়েছে; অধ্যাপকেরা হিশেব নিচ্ছে কে কে উপদেষ্টা হয়েছে, কে কার আত্মীয়, কে কার সাথে ইস্কুলে

পড়তো। খুব মূল্য পাচ্ছে এক বুড়ো সহকারী অধ্যাপক, যে দশ বছর ধ'রেই খুব বিমর্ষ ছিলো পদোন্নতি না পেয়ে, আজ সে খুব উল্লসিত, সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে, সেও গৌরবে গোশল ক'রে নিচ্ছে এজন্যে যে তার একটা ভাগ্নে জেনারেল, এবং এখন খুব শক্তিশালী পুরুষ, দু বা তিন নম্বরেই আছে, বলা যায় না এক নম্বরেও উঠে যেতে পারে। মামা ভাগ্নের গুণ কীর্তন ক'রে চলেছে, শুনে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে অধ্যাপকদের, আর রাশেদ খুব বিস্মিত হচ্ছে যে জেনারেলেরও কীর্তনযোগ্য গুণ থাকতে পারে। ম্যাকআর্থার নামের একটা জেনারেলের নাম মনে পড়লো, যাকে বরখাস্ত করার কারণ হিশেবে তার দেশের রাষ্ট্রপতি বলেছিলো, সে একটা নির্বোধ কুত্তারবাচ্চা ব'লে তাকে আমি বরখাস্ত করি নি, যদিও সে তা-ই, তবে নির্বোধ কুত্তারবাচ্চা হওয়া জেনারেলদের জন্যে কোনো অযোগ্যতা নয়; তাকে বরখাস্ত করেছি, কেননা সে রাষ্ট্রপতিকে মানছে না। একটা ঝাঁড়ুদার, অর্থাৎ একটা প্রাক্তন ভাঁড়ের উঠোনটুঠোন পরিষ্কার করার কাজ করেছিলো যে-অধ্যাপকটি, তাকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছে; সে হয়তো আবার ঝাঁড়ুদারের বা জুতোশেলাইয়ের কোনো কাজ পাবে, হয়তো সে এরই মাঝে ভাঁড়দের পায়ে সেজদা ক'রে এসেছে; মুখ থেকে তার ঝিলিক বেরোচ্ছে।

কারো চোখেমুখে কোনো উদ্বেগ নেই, সবাই যার প্রতীক্ষায় ছিলো তার আগমনে স্বস্তি পাচ্ছে, স্নায়ু থেকে ভার নেমে গেছে। পতন দেখতে বাঙালি মুসলমানের খুবই ভালো লাগে, রাশেদ ভাবলো, একটাকে ঠেলে ফেলে, শুধু ঠেলে ফেলে নয় কবরে ঢুকিয়ে দিয়ে, আরেকটা আসে, এবং যে আসে আর যেতে চায় না, মনে করে সে-ই মালিক, তখন আরেকটা আসে আগেরটাকে ঠেলে ফেলে, কবরে ঢুকিয়ে দিয়ে। আগেরটাও যে সরল পথ দিয়ে এসেছিলো, তা নয়; এখানে কেউ সরল পথে আসে না, সরল পথে আসার উপায় নেই, আসতে হয় পতন ঘটিয়ে। আমরা, রাশেদ ভাবলো, বাঙালি মুসলমানেরা কারো উত্থানে সুখ পাই না, অন্যের উত্থান হচ্ছে নিজের পতন, আমরা সুখ পাই কারো পতনে, শক্তিমানের পতনে। শক্তিমানগুলো এখানে নিখাদ শয়তান, একটা শয়তানকে ধ্বংস ক'রে আরেকটার প্রাদুর্ভাব ঘটে, আরেকটা এসে তার গর্ত খোঁড়ে, এমনই দেখে আসছে এ-জাতি, মনস্তাত্ত্বিকভাবে এরই জন্যে তৈরি বাঙালি মুসলমান। চা চলছে খুব আর চলছে কোলাহল, পতিত শয়তানদের একেকটির কেলেঙ্কারির রগরগে বর্ণনায় মুখর সবাই। কাকে কাকে ধরা হয়েছে পেশ করা হচ্ছে সে-তালিকা, কে কতো কোটি টাকা মেরেছে তারও হিশেব দেয়া হচ্ছে। কাম আর টাকা, টাকা আর কাম হচ্ছে প্রধান বিষয়, টাকা আর কামের কথা বলার সময় তাদের সারা শরীর উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, তারপর স্খলিত হওয়ার মতো শিথিলতার ভাব জাগছে; রাশেদ জানে এ-দুটি ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের ক্ষুধা মেটে নি। কেউ যে নতুন ভাঁড়রা এসেছে ব'লে উৎসব করছে, এমন নয়, তবে পুরোনোগুলো যে ধ্বংস হয়েছে, তাতেই স্বস্তি বয়ে যাচ্ছে রক্তনালি দিয়ে, যদিও অচিরেই তাদের রক্তে অস্বস্তি ডিম ছাড়তে শুরু করবে। বাঙালি মুসলমান পতনসম্ভোগী জাতি, পতনই

তাদের বেঁচে থাকার খাদ্য; এদের যখন পতন ঘটবে, তখনও সুখ পাবে এ-জাতি। পতন প্রচুর দেখা হয়েছে, পতন এখানে নারকীয় বিভীষিকার মধ্যে দিয়েও আসে, মুসলমানের ইতিহাসে যা নতুন নয়, শোচনীয়ও নয়; এ-জাতির রক্তের মধ্যে রয়েছে বিভীষিকার জন্যে মোহ।

যখন বেরোচ্ছে রাশেদ, রিকশা খুঁজছে, রিকশাঅলারা আগের মতোই তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না; কোনো-না-কোনো ছাত্রীকে তুলে খুশিতে চ'লে যাচ্ছে; একটা রিকশা গেলো তারই পাড়ায়, তার ডাক শুনতেই পেলো না রিকশাঅলা, শুনলেও আর সে আট টাকা ভাড়া দিতে চাইলেও রিকশাঅলাটা এমনভাবে মুখ ফেরাতো যেনো সে একটা পচা জন্তু, যাকে ওই পবিত্র রিকশায় তোলা যায় না, কিন্তু পাঁচ টাকায় মেয়েটিকে নিয়ে সে খুশিতে চ'লে গেলো-এতো খুশি যে ট্রাকের নিচে পড়বে মনে হচ্ছে, তবে নতুন সামরিক যুগের প্রথম সপ্তাহে হয়তো বাঙালি মুসলমান ট্রাকড্রাইভারও আইন মেনে চলছে ; পরিত্যক্ত হ'লেও রাশেদের ভালো লাগলো যে সৌন্দর্যের ডাকে আজো এ-ভূখণ্ডের মানুষ সাড়া দেয়। তখন গাড়িটা এসে থামলো রাশেদের পাশে, বেরিয়ে এলো লিলি। বিলেত থেকে লিলি কখন ফিরেছে রাশেদ জানে না, লিলিকে দেখলে রাশেদ বুঝে ফেলে তার জীবনের কয়েক ঘণ্টা অপচয় হয়ে গেলো। কোনো নারীর পাশে ব'সে জীবন অপচয়ের বোধ যে জাগতে পারে, এটা রাশেদ আগে বিশ্বাস করতো না, কিন্তু লিলির সাথে পরিচয়ের পর তার মনে এ-মৌলিক বোধটি জন্ম নিয়েছে, যদিও লিলিকে সে পছন্দ করে। দেখা হ'লেই লিলি প্রথমে তার জীবনপাঁচালির কিছু স্তবক ধীরে ধীরে শোনায়, অনেকগুলো পরিকল্পনার কথা বলে, যেগুলো সে কখনোই বাস্তবায়িত করবে না, যা আধঘণ্টায় ক'রে ফেলার কথা তা কয়েক ঘণ্টা ধ'রে সে করে বা করে না, এবং রাশেদকে ছাড়ে না। পাঁচ-ছ বছরের বড়ো লিলি এবং পাঁচ-ছ বছর আগে লিলির সাথে পরিচয় হয়েছে রাশেদের; এক সময় যে লিলি রূপসী ছিলো, তা তার শরীর আজো স্থানে স্থানে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করে। লিলি আজো পুরুষ পছন্দ করে, সব সময় কোনো-না-কোনো পুরুষ পাশে রাখতে তার ভালো লাগে, হয়তো আজ কাউকে সংগ্রহ করতে না পেরে রাশেদের খোঁজে এসেছে বা এসেছে যে-কোনো একটা পুরুষের খোঁজে, এবং রাশেদকে পেয়ে গাড়ি থামিয়েছে। লিলি ডাক দিলে সচিবালয় থেকে গোটা দশেক, মতিঝিল থেকে গোটা পনেরো, রাজনীতিক দলগুলো থেকে গোটা পাঁচেক ভাইয়ের উন্নয়নপ্রকল্প, আমদানিরপ্তানি, চোরাচালান, আর গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র ফেলে ছুটে আসার কথা, কিন্তু আজ সেগুলো হয়তো নিজেদের লুকিয়েছে বা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলছে সামরিক আদেশ, তাই লিলি একটিও পুরুষ পায় নি। সামরিক আইন এলে প্রথমে পুরুষের আকাল দেখা দেয়। লিলি তাকে টেনে গাড়িতে তুলে জানালো যে শহীদ ভাইকে মিলিটারিরা ধ'রে নিয়ে গেছে; সে যাচ্ছে শহীদ ভাইয়ের বাসায়, রাশেদকেও যেতে হবে। শহীদ একটা পাকা আমলা, আস্ত হারামজাদা, সেটার পাছায় দুটো বন্দুক ঢুকিয়ে দেয়া হ'লেও রাশেদের পক্ষে সামান্য দুঃখ পাওয়া অসম্ভব, বরং রাশেদ

অনেকের মতোই সুখ পাবে; ওটা মারা গেলেও রাশেদের কিছু আসে যায় না, এমনকি ওটার জানাজায় গিয়ে পুণ্য কামানোরও কোনো ইচ্ছে তার হবে না, কিন্তু লিলিকে এড়ানো অসম্ভব। লিলিও ওটাকে দেবতা মনে করে না, শয়তানই মনে করে; অনেক বছর ধ'রে দেখাও নেই, কিন্তু কাতরতা তার স্বভাব, শহীদ ভাইয়ের স্ত্রী দুঃখের মধ্যেও লিলিকে দেখলে ক্ষেপে উঠতে পারেন, কেননা তার বিশ্বাস শহীদ যেমন লিলিকে ছাড়ে নি তেমনি লিলিও শহীদকে ছাড়ে নি, তবু আজ লিলি কেমন কেমন বোধ করছে শহীদ ভাইয়ের জন্যে, তাই শহীদ ভাইয়ের বাড়ি তাকে যেতেই হবে। রাশেদের জন্যে বিব্রতকর হচ্ছে একটা হারামজাদার বাসায় যাওয়া, যা ওই হারামজাদাটা কোনোদিন জানবেও না। ওর বাসায় গিয়ে দেখা গেলো খুব কষ্ট পাওয়ার চেষ্টা করছে শহীদের বউটি, ক্যান্সারে যার ম'রে যাওয়ার কথা ছিলো বছর দুয়েক আগে, কিন্তু কষ্ট খুব পাচ্ছে না, পঞ্চাশ বছর বয়সে স্বামীর জন্যে কষ্ট পাওয়া খুবই কঠিন দায়িত্ব। হারামজাদাদের বউগুলো দুঃখকষ্টের চমৎকার ফ্যাশন আয়ত্ত করেছে দু-দশকে, ওরা দুঃখে গ'লে পড়ে, ওদের শাড়ি খ'সে পড়ে, ওদের স্তনবৃত্ত দিগ্বলয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে, নিরাসক্ত দর্শকদের কাছে দৃশ্যটা হয়ে ওঠে এক্সএক্স ছবি দেখার মতোই উপভোগ্য। রাশেদ সামরিক আইনের কল্যাণে একটু দূরে ব'সে একটি এক্সএক্স ছবি উপভোগ করতে লাগলো।

হারামজাদার বউটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো আরেকটা হারামজাদার বউ। সে-হারামজাদাটাকে অবশ্য এখনো মিলিটারিরা ধরে নি, হয়তো ধরবে না; সেটা আমলাগিরি ছেড়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে কোটিপতি হয়েছে, এবং দেশেও নেই, সাধারণত থাকে না। লিলি যখন তার স্বামীর অর্থাৎ কলিম ভাইয়ের সংবাদ জানতে চাইলো, তখন কলিম ভাইয়ের বউ বললো, খানকিমাগিটা আবার দেশে এলো কবে? তার কাছে লিলির দেশে ফেরা দেশ মিলিটারিদের দখলে চ'লে যাওয়ার থেকে অনেক বিপজ্জনক, লিলির বিদেশে থাকাও কম বিপজ্জনক নয়, তার হারামজাদাটা বিদেশে গেলেই লিলির সাথে গড়িয়ে আসে ব'লে তার বিশ্বাস। আমলাগুলোর বউরা, যৌবন যাদের এখন মাংসের বদলে প্রসাধনের করুণার ওপর নির্ভরশীল, বিপন্ন এটা জানে রাশেদ; সুযোগ পেলেই ওরা ছোটো আমলাদের বউগুলোকে রেস্টহাউজে তোলে, শরীরটা সুস্বাদু হ'লে একদিন যার জন্যে আত্মহত্যা করতে চাইতো সেটাকে তালাক দিয়ে ছোটো আমলার বউটাকে ঘরে তোলে, ছোটো আমলাটা আরো ছোটোটার বউ ভাগায়। কলিমের বউটাও কলিমের ভাগানো বউ, সলিম না কার বউ ছিলো বছর দশেক, কলিম তাকে ভাগিয়ে এনেছে, আর লিলি কলিমকে একবার প্রায় ভাগিয়ে নিয়েই গিয়েছিলো, আরেকটুকু হ'লেই কলিম, তার কলিম আর তার কাছে ফিরতো না, সে-দাগটা বেশ তাজা রয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার ভাষা; কয়েকবারই লিলিকে সে খানকি, বেশ্যা ব'লে পরোক্ষ সম্বোধন করলো, কিন্তু লিলি, এ-সতীদের থেকে অনেক মার্জিত ও মানবিক, শুধু বললো, আপনার ভাষা আজকের জন্যে শোভন নয়। কলিমের স্ত্রীর ভাষা তাতে আরো সাধ্বী হয়ে উঠলো, লিলির গোপনতম প্রত্যঙ্গের নাম ধ'রে

জানালো যে তার ওই প্রত্যঙ্গটির ক্ষুধা মিটবে না। শহীদের স্ত্রী তখনো কষ্ট পাওয়ার জন্যে অধ্যবসায় ক'রে চলেছে, কষ্টের এক ফাঁকে জানালো ওরা শহীদকে একটা মাঠের মধ্যে ফেলে রেখেছে, একটা বালিশও নেই, মশার কামড়ে সে কালো হয়ে যাচ্ছে, এমনকি তাকে একটা বদনাও দেয়া হয় নি। বালিশ, মশারি, বদনার মতো বস্তুর কথা শুনে রাশেদ বিস্মিত হলো; রাশেদের ধারণা ছিলো ওই হারামজাদাদের জীবনে এসবের কোনো ভূমিকা নেই, ওরা এসব চেনে না, চেনে শীততাপ, গাড়ি, লন্ডনপ্যারিস, হুইস্কি, সুন্দর সুন্দর নারী। সামরিক শাসনের সূচনায় এগুলোই হয়ে উঠেছে শহীদের মতো একটা আমলার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? এক বোতল ব্ল্যাকলেবেল না চেয়ে সে চেয়েছে একটা বদনা, এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কী হ'তে পারে? বউটি ব'লে চলছে, একটা মশারি কেনা দরকার, একটা বালিশ আর একটা বদনা কেনা দরকার, কিন্তু সে এখন উঠতে পারছে না, বাজারে গিয়ে সে এসব কিনবে, সে-শক্তি তার নেই। কলিমের বউটা এতে কান দিচ্ছে না, সে এসব শুনতেই পাচ্ছে না; তার জীবনে এখনো বালিশ-মশারি-বদনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি, বরং এসব শব্দ শুনতে খুবই ঘিনঘিনে লাগছিলো তার। রাশেদ বুঝতে পারছিলো সামরিক শাসন তার জীবনে এক কৌতুককর শোকনাটক হয়ে দেখা দিতে যাচ্ছে, বউটি বদনাবালিশ বলার সময় বারবার তাকাচ্ছে রাশেদের দিকে, অর্থাৎ সামরিক আইনে ধরা-পড়া একটা বদমাশের জন্যে বদনা কেনাই হয়ে উঠতে যাচ্ছে তার নিয়তি। কিন্তু বউটা কোনো টাকাপয়সা বের করছে না, রাশেদকে কি বদনাবালিশ নিজের পয়সায়ই কিনে আনতে হবে? আমলাদের বউগুলোও বেশ পাকা আমলা, রাশেদকে দিয়ে রাশেদের পয়সায় বদনা কিনিয়ে ছাড়বে একটা হারামজাদার জন্যে, হারামজাদাটা যখন মাঠের ঝোপে ব'সে বিড়ি টানতে টানতে পাছায় পানি ঢালবে, তখন জানবেও না বদনাটা রাশেদের পয়সায় রাশেদের কেনা। সমাজ, রাজনীতি, উত্থান, পতন সত্যিই জটিল ব্যাপার, কার বদনার পানি কে কোথায় ঢালে। রাশেদ অবশ্য জানে লিলি ব্যাগ খুলবে, সে আন্তরিক হ'তে জানে, এবং তাই হলো। রাশেদ বেরোলো বদনা, মশারি, বালিশ কিনতে; কিন্তু সে কি জানে কোথায় মেলে এসব, অনেক বছর ধ'রে এসব তো তারও অভিজ্ঞতার বাইরে। ছাত্রজীবনে সে মশারি কিনতে গিয়েছিলো সদরঘাটে, আজো সেখানে যাবে নাকি? তার মনে পড়লো নিউমার্কেটের কথা, লিলির গাড়িতে চেপে সে বদনা কিনতে বেরোলো, বুঝতে পারলো রাশেদ যে সামরিক আইনের হাত বেশ দীর্ঘ, ওই হাত ছেলেবেলায় তাকে দিয়ে জঙ্গল সাফ করিয়েছে, আজ তাকে দিয়ে বদনা কিনোচ্ছে একটা বদমাশের জন্যে, কালকে হয়তো একটা বেশ্যার ট্যাম্পুন কিনোবে। তার তলপেটে যে-প্রপাত জ'মে আছে, বদনা কিনতে কিনতে মনে হলো, ওই প্রপাত কংক্রিটের মতো জ'মে যাচ্ছে, কোনোদিন বেরোবে না, কিন্তু চাপ দিতে থাকবে অনবরত।

তখন বিকেল, একটি চৌরাস্তায় সে গাড়ি থেকে নামলো। সারাদিন বাসায় যায় নি, সবাই হয়তো তাকে নিয়ে ভয় পেতে শুরু করেছে, সে আরেকটুকু গুরুত্বপূর্ণ

হ'লে খোঁজাখুঁজি প'ড়ে যেতো এরই মাঝে; সে নিশ্চিত তাকে নিয়ে তেমন কিছু শুরু হয় নি। হয়তো মৃদু আর বাবা তার কথা একটু বেশি বলছে। আরো কিছু সময় বাইরে থাকার তার ইচ্ছে হলো, সামরিক আইন উপভোগের, বাইরে হেঁটে হেঁটে, সাধ জাগলো তার। পথে পথে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, কোনো কোনো ট্রাকে ভয় দেখানোর মতো অস্ত্রপাতি সাজিয়ে ওরা বীরের মতো যাচ্ছে, বিদেশি বিদেশি দেখাচ্ছে ওদের; আর রিকশায় বা হেঁটে, এমনকি গাড়িতে যাচ্ছে যারা, তাদের লাগছে শূদ্রের মতো, যেনো তারা নগরে অধিকারহীন ঢুকেছে। লিলি তাকে এ-চৌরাস্তায় নামিয়ে দেয়ার পর রাশেদ একটিও নারী দেখে নি, সে দাঁড়িয়ে রিকশাগুলোতে নারীর মুখ খোঁজার চেষ্টা করলো, কিন্তু একটিও নারী দেখতে পেলো না। শহর থেকে কি পালিয়ে গেছে নারীরা, রাস্তা কি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্যে? একাত্তরেও রাস্তায় তাদের দেখা যেতো না, বারান্দায়ও না; তাদের শাড়িও শুকোতে হতো ঘরের ভেতরে, তেমনি হয়ে গেছে আজ? এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, রাশেদ ভাবলো, চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, নারী দেখার চেষ্টা করছি, জলপাইরঙের ট্রাকের দিকে তাকাচ্ছি, এটা কি সিদ্ধ, এটা কি কোনো নির্দেশের মধ্যে পড়ে না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার ভেতরে নিশ্চয়ই অভিসন্ধি থাকে, মানুষ শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কোনো অভিসন্ধি থাকলেই মানুষ একা একা কোনো চৌরাস্তায়, বাজারের গেইটে, বা কোনো গাছের নিচে দাঁড়ায়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। একবার সে একটি মেয়ের জন্যে বোশেখের দুপুরে একটা গাছের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, মেয়েটি আসছিলো না, আর রাশেদের মনে হচ্ছিলো প্রত্যেকটি গাড়ি আর রিকশা তার মনের অভিসন্ধি জেনে ফেলছে, এখনি কেউ এসে তাকে ধমক দিয়ে বলবে, মেয়েটিকে আজ তুমি চুমো খাবে না। দাঁড়িয়ে থাকলেই মাথায় চক্রান্ত আসে, এই যেমন রাশেদের মাথায় নানা চক্রান্ত আসছে। এখন যদি ট্রাক থেকে ওই বিদেশি বিদেশি জলপাইরঙটি নেমে তাকে বলে সে চক্রান্ত আটছে, উত্তর দিকে একটা আপত্তিকর আবেগ চালনা করছে, তাহলে কি সে অস্বীকার করতে পারবে? বোঝাতে পারবে সে চক্রান্ত করছে না, শুধু ঘৃণা করছে, আর ঘৃণা এমন আবেগ যা চালনা করা যায় না, যা অক্রিয়? ঘৃণা করা কি সিদ্ধ সামরিক আইনে? রাশেদ হাঁটতে শুরু করলো, এবং তাকে দেখলো; প্রথম খুব অচেনা অদ্ভুত লাগলো, জলপাইরঙের শহরে তাকে দেখার আশা করে নি রাশেদ। সে একটি পাখি। অনেক দিন রাশেদ পাখি দেখে নি, দেখার কথা ভাবেও নি; কিন্তু ছোটো একমুঠো পাখিটার বুকের শাদারঙ দেখে বুকে কাঁপন বোধ করলো রাশেদ। এটা নিশ্চয়ই দোয়েল, সে ভাবলো। দোয়েলটির জন্যে এখানে একটা আমগাছ থাকা উচিত ছিলো, তাতে সবুজ পাতা থাকা উচিত ছিলো; কিছু নেই, দোয়েল দেয়ালের ভাঙা ইঁটের ওপর ব'সে আছে। দোয়েলটির জন্যে আম গাছ নেই, এটা বেশ স্বাভাবিক; দোয়েলটিরই তো থাকার কথা নয় এখানে। তবু সে এখানে কেনো? এই শহরে কেনো? সামরিক আইনের মধ্যে ...র এই চৌরাস্তার পাশের দেয়ালে কেনো? রাশেদ দেয়ালটির আরেকটুকু

কাছে আসতেই দোয়েল উড়ে একটু দূরে স'রে গিয়ে আবার বসলো, হয়তো বসতো না, বসেছে ভালোভাবে উড়তে পারছে না ব'লে। ওর ডান ডানাটি কি ভাঙা, কয়েকটা পালক খ'সে গেছে ডানা থেকে? রাশেদ আবার এগোতেই আবার উড়তে চেষ্টা করলো দোয়েল, রাশেদ দেখলো খুব কষ্ট হচ্ছে তার উড়তে।

তার দিকে তাকিয়ে আছে দোয়েল, তবে দোয়েলের চোখ অতোটা দূর থেকে রাশেদ দেখতে পাচ্ছে না; এটা যদি তার ছেলেবেলা হতো তাহলে হয়তো দোয়েলের চোখ দেখতে পেতো, ওই চোখে কিসের ছায়া পড়েছে, তাও হয়তো দেখতে পেতো। দোয়েল নিশ্চয়ই দেখছে রাশেদকে, এবং দূরে দাঁড়ানো ট্রাকটিকে। দোয়েল কি বুঝতে পারছে রাশেদের সাথে ট্রাকের কোনো সম্পর্ক নেই, রাশেদ ট্রাক থেকে নেমে আসে নি? দোয়েলের ডানা ভাঙলো কী ক'রে? একেবারে ভাঙে নি, ভাঙলে একেবারেই উড়তে পারতো না; কিন্তু ভেঙেছে কোথাও। রাশেদের দেখতে ইচ্ছে হলো কোথায় ডানা ভেঙেছে দোয়েলের। এদেশে কি পাখির ডানার চিকিৎসা হয়? সে যদি পাখিটিকে নিয়ে হাসপাতালে যায়, কোনো ক্লিনিকে ঢুকে চিকিৎসার জন্যে, তাহলে কেউ কি তাকে মানবিক ভাববে, সবাই কি তাকে পাগল ভাববে না? রাশেদ আবার এগোলো দোয়েলের দিকে, দোয়েল উড়ে উড়ে ঢুকে পড়লো আঠারোতলা দালানটির ভেতর। রাশেদও দরোজা খোলা দেখে ভেতরে ঢুকে দোয়েল কোথায় গেলো দেখার চেষ্টা করলো, দেখলো দোয়েল ব'সে আছে সিঁড়ির হাতলে। সিঁড়ির হাতল কি দোয়েলের বসার জন্যে উপযুক্ত? ওটা কচি আম গাছের ডাল হ'লে ভালো হতো। রাশেদ দোয়েলের দিকে যেতেই দোয়েল উড়ে দোতলায় গিয়ে বসলো। কোথাও কেউ নেই, সবাই চ'লে গেছে, প্রত্যেকটি ঘর মসৃণভাবে বন্ধ; শুধু আছে দোয়েল আর সে। রাশেদ যতোই দোয়েলের দিকে যায়, ভাঙা ডানার দোয়েল ততোই উড়ে তেতলা থেকে চারতলার সিঁড়িতে ওঠে, চারতলা থেকে পাঁচতলার সিঁড়িতে ওঠে; হাতলে ব'সে একটু জিরোয়, বিষণ্ন চোখে তার দিকে তাকায়। দোয়েল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, রাশেদও কি ক্লান্ত হয় নি? দোয়েলের তবু ভাঙা ডানা রয়েছে, রাশেদের তাও নেই; দশতলার সিঁড়িতে এসে রাশেদের পা কংক্রিটের মতো শক্ত হয়ে গেলো, সে ব'সে পড়লো ক্লান্ত মূর্তির মতো। দোয়েলের দিকে তাকাতে গিয়ে রাশেদ দেখলো সামনে পুকুর, পাড়ে বাঁশঝাড়, হিজলের সারি; পুকুরের জল তিরতর ক'রে কাঁপছে। একপাশে কচুরিপানার ঘন সবুজ। পুকুরের জলে এক কিশোরী ডুব দিচ্ছে, ডুব দিতে দিতে কিশোরী এক কিশোরের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা দুজনেই ডুব দিলো, ডুব দিয়ে তারা একে অন্যকে ছুঁলো, গালে গাল ছোঁয়ালো, তারপর দূরে গিয়ে ভেসে উঠলো। রাশেদ তাকিয়ে দেখে দোয়েলটি নেই। কোথায় গেলো ভাঙা ডানার পাখি? রাশেদ সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে ওপরে উঠতে লাগলো, কিন্তু কোথাও দোয়েল নেই। রাশেদ উঠতে উঠতে ছাদে গিয়ে পৌঁছোলো, মাথার ওপরে আকাশ কিন্তু কোনো দোয়েল নেই। ছাদ থেকে সে সারিসারি ট্রাক দেখতে পেলো, যেগুলোকে জঙ্গল ব'লেই মনে হলো তার। তার তলপেটের প্রপাতটি উষ্ণ হয়ে

উঠেছে, গর্জন করতে শুরু করেছে, যেনো তার তলপেট ছিদ্র ক'রে সহস্র জলপ্রপাত হয়ে বেরিয়ে পড়বে। আশ্চর্য, এতোদিনের জমাট প্রপাত গলগল ক'রে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। রাশেদ কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না, ভেতরে বরফফাটার শব্দ হচ্ছে অনবরত। রাশেদ উত্তর দিক ক'রে দাঁড়ালো, তার জিন্সের জিপ খুলে প্রপাতের মুখ বাড়িয়ে ধরলো, এবং প্রবল গর্জন ক'রে তার ভেতর থেকে প্রস্রাব না অনন্ত ঘৃণাধারা যেনো নির্গত হ'তে লাগলো।

৩ মুসলমান ও মদ্য ও গোলাপি সাপ

সন্ধ্যায় তার ওখানে, গুলশানের এক রেস্টহাউজে যেখানে সে থাকে, পানের নিমন্ত্রণ করেছে আবদেল, যার সাথে রাশেদের পরিচয় হয় বছর দুয়েক আগে এক পানের আসরে। তাদের সম্পর্ক যে নিবিড়, প্রতিদিন বা প্রতিমাসে যে তাদের দেখা হয়, তা নয়; দেখা হয় তাদের পান উপলক্ষেই, বিশেষ ক'রে যখন আবদেল এরকমভাবে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে। তারা এক প্রজাতির নয়, আকস্মিকভাবেই তারা কাছাকাছি এসেছে; পানশালায় তো কতোজনেরই মুখোমুখি বসতে হয়। স্বাধীন বাঙলাদেশ নানা অভিনব সামগ্রী উৎপাদন করেছে, স্বাধীনতা সব সময়ই সৃষ্টিশীল হয়ে থাকে; আবদেল তারই একটি, ও তার নামের মতোই চমকপ্রদ। বাঙালি মুসলমানের নামগুলো বুর্জোয়াদের জন্যে বিব্রতকর, মোহাম্মদ আহাম্মদ আবদুল কেরামত বেজায়েত আকিদুল মোহব্বত চোখে ঝোপঝোপ দাড়িটুপির দৃশ্য জাগিয়ে তোলে চোখে, তবে ওগুলোকে একটু কাতচিৎ ক'রে নিলে বেশ লাগে; আবদুল বললে ভৃত্য মনে হয়, আর আবদেল বললে মনে হয় শীততাপনিয়ন্ত্রিত আমলা/ বলপয়েন্টপিচ্ছিল সাংবাদিক/মতিঝিলের মসৃণ ব্রিফকেস। তারা বন্ধু নয়, হয়তো হবেও না কখনো, চুম্বকের মতো তারা টানে না পরস্পরকে; কিন্তু আবদেলের সাথে দেখা হ'লে রাশেদ কয়েক ঘন্টা নষ্ট করতে প্রস্তুত থাকে, কয়েক ঘন্টা তুচ্ছতায় নষ্ট ক'রেও তার অনুতাপ হয় না, তখন পানটুকুকেই মনে হয় অর্জন; আর আবদেল পছন্দই করে সময় নষ্ট করতে, অন্তত সময়কে সে মূল্যবান মনে করে না। সে সাধারণত ডাকে পান করতে, পানের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না; বাঙলার সবুজ মরুভূমিতে এক গেলাশ বিয়ার, একটুকু হুইস্কি বোশাখি বৃষ্টির মতো সুখকর। ভাঁড়রা চারদিক খটখটে ক'রে তুলেছে, গাছপালার দিকে তাকালেও চোখে কোনো রস ঢোকে না, মেঘের দিকে তাকালে মনে হয় ঝামাপাথর উড়ছে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম আকাশ জুড়ে; তবে ভাঁড়দের পেট অবশ্য খটখট করছে না, সেখানে নিশ্চয়ই শ্রাবণধারা চলছে হুইস্কির, বন্যায় পেট উপচে হয়তো দামি কার্পেট ভাসিয়ে দিচ্ছে। রাশেদের রক্তে একটা খটখটে ঝামাঝামা ভাব এসে গেছে; রাস্তায় রাস্তায় ট্রাক দেখে দেখে ঘেন্না ধ'রে গেছে, তাই আবদেলের ডাক

মেঘের ডাকের মতোই মধুর লাগলো। আবদেলের ওখানে পানের সুবিধা হচ্ছে সেখানে সতীগৃহিণীর দোররার নিচে পাপিষ্ঠের মতো পান করতে হয় না। পান করতে করতে যদি মিনিটে মিনিটে মনে পড়ে পাপ করছি, বাড়িঅলি যদি মাঝেমাঝেই ড্রয়িংরুমে এসে স্বামী ও সঙ্গীদের একরাশ ইতর শব্দ উপহার দিয়ে যায়, এবং গালাগাল করতে থাকে পাশের ঘর থেকে, তাহলে পুরো জলবায়ুই ঘিনঘিনে হয়ে ওঠে, মনে হয় পাড়ায় বা মেথরপট্টিতে ব'সে ব্যাটারিভেজানো তাড়ি খাচ্ছি। সতী গৃহিণীদের ভাষা এতো চমৎকার যে মনে হয় তারা অন্তত বছর দশেক পাড়ায় কাটিয়ে এসেছে। আবদেলের রেস্টহাউজে সে-ঝামেলা নেই, সেখানে কোনো সতী নেই; আবদেলের বউ থাকে বিদেশে, আগে সে আবদেলের একাধিক বন্ধুর বউ ছিলো, এখন আবদেলের; আবদেলের থেকে সে পাঁচসাত বছরের বড়ো, এখন আবদেলের বা সত্যিই আবদেলের কিনা তা জানে না রাশেদ, তবে তার শরীরটা একান্ত আবদেলের নয়, যেমন আবদেলেরটাও সম্পূর্ণ তার স্ত্রীর নয়। কোনো কিছু, দেহ বা রাষ্ট্র যা-ই হোক, সম্পূর্ণরূপে কারো অধিকারে থাকা খুবই অস্বস্তিকর। আবদেলও বিদেশেই থাকতো, দু-দশক ছিলো, চ'লে এসেছে, বউ আসে নি; বাঙালি মেয়েরা বিদেশে গেলে সাধারণত ফিরতে চায় না। এটা অবশ্য রাশেদের ভালো লাগে। ওই নারী, যে আবদেলের স্ত্রী, যাকে দেখে নি রাশেদ, কখনো দেখবে না, যার বয়স হয়তো এখন চুয়ান্নো, তাকে কি বউ বলা যায়? স্ত্রী বলা যায়? বলবে কি পরিবার, যেমন ছেলেবেলায় বুড়োদের মুখে সে শুনেছে? আবদেলের পরিবার আবদেলের সাথে থাকে না ব'লেই সে এতো আকর্ষণীয়।

আবদেল মদটদ খাওয়ায় মাঝেমাঝে; এটা তার এক মস্ত গুণ, বাঙলায় কে কাকে খাওয়াতে অর্থাৎ পান করাতে চায়? আহা রাশেদ মুসলমান আহা রাশেদ বাঙালি আহা রাশেদ বাঙলাদেশি, আর মদটদ হচ্ছে মুসলমানের স্বপ্নের ও দুঃস্বপ্নের জিনিশ। মুসলমানের পক্ষে কি মদের কথা ভুলে থাকা সম্ভব? না, বারেকের, তাদের গ্রামের চাষী, কথা মনে পড়ছে রাশেদের; সে হয়তো কখনো মদের কথা ভাবে নি, নাকি তার মনেও পড়তো মদের কথা? একবার শ্রীনগরে রথযাত্রা দেখতে গিয়ে নাকি সে কেমন কেমন করেছিলো, বারবার ভেঙে ভেঙে জড়িয়ে জড়িয়ে পাশের বাড়ির এক হিন্দু বিধবার নাম করেছিলো, হু হু ক'রে কেঁদেছিলো? রাশেদ যে বাঙালি মুসলমান ভাইদের গোত্রের, তারা আল্লাকে ভুলে থাকতে পারে-তবে আজকাল একটু বেশি ক'রেই তার নাম নিচ্ছে যদিও মনে রাখছে না,-কিন্তু ওই বস্তুটিকে ভুলে থাকতে পারে না। মুসলমান ভাইরা মদ খায় বা খায় না, খেতে পায় বা পায় না, কিন্তু কখনো মদের কথা ভুলে থাকতে পারে না। যে-মুসলমান ভাই মদ খায় সেও মাতাল, যে খায় না সেও মাতাল, একটু বেশি ক'রেই মাতাল। রাশেদ ও তার চারপাশের ভাইরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত; ওই শ্রেষ্ঠ ধর্মটি এসেছে যে-মরুভূমি থেকে, সেখানকার কিছু আধুনিক

বেদুইন ভাইকে সে দেখেছে, তারা উটের মতো গেলে; পার্থক্য হচ্ছে উট একবা গেলার পর অনেক দিন গেলার কথা ভাবে না, আর আধুনিক বেদুইন ভাইরা দিনরাত গিলতে না পারলে চারদিকে মরুভূমি দেখে, আর মুখ খুললেই বলে হারাম। জিনিশটি নিয়ে তার শ্রেষ্ঠ ধর্মে তো সমস্যা রয়েছেই, তার মহান বাঙলা ভাষায়ও সমস্যা রয়েছে; এতে হুইস্কি বিয়ার ওআইন সবই মদ। রাশেদ পছন্দ করে হুইস্কি আর বিয়ার; এগুলো চমৎকার জিনিশ, যা আছে ব'লে, যেমন মেঘ বা পাবদা বা পুকুরপাড়ে লাউয়ের জাংলা, জীবনকে জীবন মনে হয়। তবে এটা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কেনো? মুসলমানের জন্যে মদ নিষিদ্ধ কেনো? মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা শুধু গন্ধম, ওটাই তো খেতে নিষেধ করা হয়েছিলো স্বর্গে, ওই জ্ঞানটুকুই তো শুধু নিষিদ্ধ, মদ নিষিদ্ধ কেনো? মদ কি কোনো জ্ঞান? কিন্তু নিষেধ কে মানে? ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে নিতে ক্লান্ত আর ঘুষ খেয়ে খেয়ে ব্যাংক ভ'রে ফেলেছে যে-মুসলমান বাঙালি ভাইরা, দখল ক'রে ফেলেছে গুলশান বনানী ধানমণ্ডি বারিধারা উত্তরা, যারা মতিঝিলে আমদানিতে তোপখানায় দেশের উন্নতিতে উত্তরপাড়ায় দেশরক্ষায় তন্দ্রাহীন, তারা সবাই কমবেশি হুইস্কি বিয়ার টানে, এবং বলে হারাম। একটু ভণ্ডামো করতে হয়, একই সাথে বাঙালি ও মুসলমান হ'লে একটু ভণ্ডামো না করলে চলে না। কেরামত আলি, রাশেদের এক বন্ধু, পকেটে সব সময় পেয়ারাপাতা রাখে। চাপে প'ড়ে মানুষ আবিষ্কারক হয়, সেও হয়েছে; সে বের করেছে পেয়ারাপাতা চিবোলে হুইস্কির গন্ধ কেটে যায়, সঙ্গমের সময়ও তার স্ত্রী গন্ধ পায় না, যদিও তার স্ত্রীর গন্ধশক্তি প্রবল; টেলিফোনেও সে মদের গন্ধ পায়, কেরামতকে জিজ্ঞেস করে, মদ খাইছ, গন্ধ পাইতাছি; তাই পানের পর আধঘন্টা ধ'রে কেরামত পেয়ারাপাতা চিবোয়, পানও চিবোয়, এবং বাসায় ফিরে বউর সাথে এমন ভাব করে যেনো দিনটা সে বায়তুল মোকররামে কাটিয়েছে, পুরস্কার হিশেবে এখন তার প্রাপ্য একটা প্রথম শ্রেণীর সঙ্গম।

সোনার বাঙলায় প্রাণ ভ'রে পান করে, গেলে, চোরারাই; ওদের টাকা আছে, আর ওরা গেলে ব'লেই পানের এতো সুনাম। সোনার বাঙলা সব কিছুকে বিকারে, পাপে, অপরাধে পরিণত না ক'রে শান্তি পায় না। প্রেমও এখানে পাপ, বড়ো অপরাধ, জেনার সমান, জোগাড় করারও কঠিন যেমন কঠিন এক বোতল হুইস্কি জোগাড় করা। রাশেদ একবার কেনার চেষ্টা ক'রে দেখেছে সে ছোটোখাটো একটা চোরাকারবারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, যেনো সে সাংঘাতিক অপরাধ ক'রে চলছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। সে শুনেছিলো চোরাদের ক্লাবের দারোয়ানদের কাছে জিনিশটা পাওয়া যায়, তাই একবার গিয়েছিলো; দারোয়ানটা তার সাথে চল্লিশ মিনিট ধ'রে ফিসফিস করেছিলো, মনে হচ্ছিলো সে পথনারী ভাড়া করতে গেছে, তারপর রিকশা ক'রে একটি গলিতে নিয়ে বলেছিলো, টাকা দ্যান। রাশেদ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলো টাকা নিয়ে এটা আর ফিরবে না। তাই পানের জন্যে কেউ একটু ডাকলেই সে স্বস্তি পায়, যেমন ডাকে আবদেল। রাশেদ আমলা আর

কালোবাজারিগুলোকে চেনে, দু-চারটার সাথে খেয়েও দেখেছে, সেগুলো পকেট থেকে একটা সিগারেটও বের করে না, অন্যেরটা দশ মিনিট পরপর অন্যমনস্ক অসাধারণ ভঙ্গিতে তুলে নেয়, যেনো নিয়ে কৃপা করছে। মদ ওগুলো একা একা বাসায় ব'সে গেলে, কেনে না, পায় কোথাও থেকে, গিলতে গিলতে বউর সঙ্গে ঝগড়া করে আর গিলে গিলে পাকস্থলি পচায়। বাঙলার বউগুলোও পাকা জিনিশ, ভাতারের হাতে মদের বোতল বা মুখে একটু গন্ধ পেলেই তারা পা থেকে মাথা পর্যন্ত সতীসাধ্বী হয়ে ওঠে, মুখ থেকে পাড়ার ভাষা বেরোতে থাকে, কয়েক দিনের জন্যে সমস্ত সুড়ঙ্গে তালা লাগিয়ে দেয়। ওদের বাসায় গিয়ে মদ খেতে ভালো লাগে না রাশেদের, লুকিয়ে বেশ্যাবাড়িতে ঢুকে তাড়ি খাওয়ার জলবায়ু তাকে ঘিরে ধরে। একবার একটার বাসায় গিয়েছিলো সে, গিয়েই মনে হয়েছিলো সে কয়েকটা দালালের সাথে বেশ্যাবাড়িতে ঢুকে গেছে, পুলিশ দিয়ে ঘেরাও হয়ে পড়েছে। রাশেদের থেকে পনেরো বছরের বড়ো হবে, একটা ইঞ্জিনিয়র আরেকটা মতিঝিলের ব্রিফকেস, পরিচয়ের দু-দিন পরেই রাশেদকে বাসা থেকে তুলে নেয়, এবং ইঞ্জিনিয়রটার বাসায় ঢুকতে গিয়েই পতিতাপল্লীর জলবায়ুতে পড়ে রাশেদ। দরোজা খুলেই তার পরিবার খ্যাঁকখ্যাঁক ক'রে ওঠে, মদ লইয়া আইছ, লগে লোচ্চাগোও লইয়া আইছ। মহিলা খ্যাঁকখ্যাঁক করতে থাকে, কলেজের ছাত্র প্রথম বেশ্যাবাড়িতে ঢুকতে গিয়ে যেমন গলির মুখে এসে ভয় পায়, ঢুকবে কি ঢুকবে-না করতে থাকে, একটু ঢুকতেই একপাল বেশ্যার আক্রমণে গলি থেকে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, তেমনি অবস্থা হয় রাশেদের। ইঞ্জিনিয়রটি তার স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঠেলতে ঠেলতে শয্যাকক্ষে নিয়ে যায়, বাইর থেকে দরোজা বন্ধ ক'রে দেয়। রাশেদ আরেকটি ঘরে একটি কিশোরী ও একটি তরুণীকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত অপরাধবোধগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ড্রয়িংরুমে ঢুকতে বাধ্য হয়। ইঞ্জিনিয়রটি আধময়লা কয়েকটি গেলাশ ও একটি পানির বোতল নিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে, ঢকঢক ক'রে হুইস্কি ঢালে, আর শয্যাকক্ষ থেকে তার স্ত্রী চিৎকার করতে থাকে। রাশেদ বারবার লোচ্চা, লোচ্চা শব্দ শুনতে পায়। রাশেদের হাতের সবুজ গেলাশটিতে পুঁজ জ'মে উঠতে থাকে, পোকা থকথক করতে থাকে, বেশ্যার প'চে-যাওয়া জিভ থেকে থুতু এসে পড়তে থাকে। রাশেদ দাঁড়িয়ে বলে, আমি যাই, কিন্তু লোক দুটি তার হাত ধ'রে মাফ চাইতে থাকে। বলে, কিছু মনে করবেন না, একটু খান, যাবেন না। তখন দুজনকেই চমৎকার মানুষ মনে হয় রাশেদের; কিন্তু রাশেদ ভুলতে পারে না শয্যাকক্ষে আটকে রাখা হয়েছে একটি মহিলাকে, যে লোচ্চা লোচ্চা চিৎকার করছে, এবং পাশের ঘরে দুটি মেয়ে তাকে ঘেন্না করছে, তাকেই ঘেন্না করছে বেশি।

লোক দুটি পান করছে খুব দায়িত্বের সঙ্গে, তারা জীবনের একটি বড়ো কাজ সম্পন্ন করছে; ঢকঢক ক'রে খাচ্ছে, কোনো কথা বলছে না, গেলাশ ও পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে, এবং রাশেদের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করছে। ঘরে আবছা অন্ধকার, অপরাধের মতো অন্ধকার, পাপের মতো অন্ধকার, পৃথিবীর সমস্ত

বাঙালি ও মুসলমান পানের সময় যে-অপরাধরোগে ভোগে তার অন্ধকারে ঘরটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। লোক দুটি ভুলতে পারছে না মদ খাওয়া পাপ, তবু খাচ্ছে, একটু বেশি ক'রেই খাচ্ছে, ঢকঢক শব্দে তারা সমস্ত উচ্চ ও অশ্রুত শব্দকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। লোক দুটি এখন কী দেখতে পাচ্ছে? ছেলেবেলার খেজুরগাছ, মাছের লাফ, কার্তিকের চাঁদ, লাল ঘুড়ি, কাঁচা আম, কোনো বালিকার মুখ দেখতে পাচ্ছে? অমন কিছু দেখছে না ব'লেই মনে হচ্ছে, তারা কোনো পতিতার নোংরা উরুর দিকে তাকিয়ে আছে ব'লে মনে হলো রাশেদের। তার ঝুলেপড়া স্তন দেখছে, রোগা উরু দেখছে, ভাঁজ দেখছে, অন্ধকার দেখছে, পুঁজ দেখছে, এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ওই মহিলা মদ খাওয়াকে এতো খারাপ মনে করে কেনো, মদ খাওয়া কি দরোজা খুলেই 'মদ লইয়া আইছ, লগে লোচ্চাগোও লইয়া আইছ' বলার থেকেও খারাপ? ওই মহিলা কখনো মদ খেয়েছে, খেয়ে বুঝতে পেরেছে খাওয়া খারাপ? নাকি শুনেই বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে মদ খারাপ, মদ যারা খায় তারা খুব খারাপ? রাশেদ সারা বাড়ি ভ'রে একটা বিকারের অজগর দেখতে পেলো, অজগরটি পিচ্ছিল দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে এ-বাড়ি, শহর, দেশ, লোক দুটিকে, ওই মহিলাকে, এবং তাকে। লোক দুটি খাচ্ছে এবং ঝিমোচ্ছে, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠতেই ইঞ্জিনিয়রটি বিব্রত হয়ে পড়লো, চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কে কে, এবং গলা শুনে ভয় পেয়ে গেলো। সে কাঁপাকাঁপা হাতে বোতলটি টেনে নিয়ে কার্পেটের নিচে লুকিয়ে ফেললো, পারলে নিজেও ঢুকে যেতো কার্পেটের নিচে; রাশেদের গেলাশটি টেনে নিয়ে সোফার নিচে রাখলো, তার বন্ধু ঢক ক'রে পুরোটা গেলাশ গিলে ফেলে গেলাশটি লুকিয়ে ফেললো; এবং সে বললো, জামাই আর মেয়ে এসেছে। জামাই আর মেয়ে তো আসবেই, যখন তখনই আসবে, শ্বশুর আর বাপের বাড়ি না গিয়ে কোথায় গিয়ে আর তারা মরবে বাঙলায়? কিন্তু রাশেদের মনে হলো জামাই নয় শ্বশুরই এসেছে। জামাইর কাছে সে একটা প্রকাণ্ড সৎ শ্বশুর থাকতে চায়; জামাই এসেই পায়ে হাত দিয়ে সালাম করবে, সে তার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করবে, চমৎকার সুন্দর থাকবে মুসলমান সমাজ। আদবকায়দায় জামাইটিকে একটা সাচ্চা মুসলমান মনে হলো রাশেদের, কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগলো এ-বদমাশটা কোথায় খায়? নিশ্চয়ই এটা কোথাও খায়, আর ওর বউটা ওকে লোচ্চা ব'লে গালি দিয়ে দুই উরু চেপে শুয়ে থাকে। জামাই চ'লে যাওয়ার পর ইঞ্জিনিয়র আবার টেনে বের করলো বোতল আর গেলাশ, আবার ঢক ঢক ক'রে ঢাললো। এবার তাদের দায়িত্ব অনেক, বোতল শেষ করতে হবে, ঢকঢক শব্দ উঠতে লাগলো; রাশেদ মাঝেমাঝে চুমুক দিচ্ছে এবং দেখছে লোক দুটিকে। তারা এখন টলছে, একটু গানও গাইছে, একজন কবিতার পংক্তিও ভেঙেচুরে টেনে টেনে আবৃত্তি করলো; একদিন তাদের ভেতরেও কবিতা ছিলো। রাশেদ ঘড়িতে দেখলো বারোটা বাজে, সে ভয় পেয়ে গেলো; তার অনেক আগেই বেরোনো উচিত ছিলো, বারোটা থেকে সান্ধ্য আইন। তখন প্রথম সামরিক যুগ চলছে দেশে, বাঙালি মুসলমান মধ্যরাতের সান্ধ্য আইনে

অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাশেদ অনেক দিন রাত নটার পর বাইরেই থাকে নি, তাই বুঝতেই পারে নি এরই মাঝে বারোটা বেজে গেছে, এখন রাস্তায় তার অধিকার নেই। সে অপরাধী জাতির সদস্য, তাকে যে দিনের বেলা বাইরে আসতে দেয়া হয়, রাত বারোটা পর্যন্ত পথে চলার অধিকার দেয়া হয়েছে, এইতো বেশি। কিন্তু রাশেদকে বাসায় ফিরতে হবে; সে উঠে দাঁড়ায়। ওই লোক দুটি তখন পুরোপুরি অন্য পারে চ'লে গেছে, রাশেদ ভেবেছিলো সে 'আসি' ব'লে বেরিয়ে পড়লে তারা খেয়ালও করবে না; কিন্তু সে উঠতেই লোক দুটি তার দু পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে শুরু করে, আপনি যাবেন না, আরেকটু খান, আপনি চ'লে গেলে মনে করবো আপনি আমাদের ঘৃণা করেন। তারা দুজনেই হু হু ক'রে কাঁদতে শুরু করে। রাশেদ পা থেকে তাদের হাত সরিয়ে 'আসি' ব'লে দরোজা খুলে বেরিয়ে পড়ে। তখনো শুনতে পায় লোক দুটি কাঁদছে, আর বলছে, আপনি আমাদের ঘৃণা করবেন না, আপনি আমাদের ঘৃণা করবেন না।

রাশেদ যখন আবদেলের রেস্টহাউজে গিয়ে পৌঁছোলো তখন সন্ধ্যে, রেস্টহাউজটিকে কোমল আবেদনময় তরুণীর মতো দেখাচ্ছে, যেনো কিছুক্ষণ পর সেও রাশেদের পাশে ব'সে বিয়ার বা হুইস্কি খাবে, নেচেও উঠবে পশ্চিমি তালে, এবং এক সময়, এগারোটা বাজার আগেই, সোফায় মাথা নিচু ক'রে ব'সে বমি চাপার চেষ্টা ক'রে চলবে। তখন তাকে আরো রূপসী দেখাবে, তার শরীর থেকে আরো তীব্র আবেদন গ'লে পড়তে থাকবে। দারোয়ান মূলদরোজা খুলে দিলো, রাশেদের মনে হলো সে এক রূপসীর ভেতরে ঢুকছে, তবে এমন হেঁটে ঢোকা মানাচ্ছে না, রূপসী তাতে সুখ পাচ্ছে না; যদি তার একটি গাড়ি থাকতো, সে গাড়িটি ধীরে ধীরে চালিয়ে ভেতরে ঢুকে পশ্চিমে যেখানে ঘন সবুজের মধ্যে লাল লাল ফুল ফুটে আছে, সেখানে পার্ক করতো, তাহলে দারুণ পুলকে কেঁপে কেঁপে চিৎকার ক'রে উঠতো রেস্টহাউজরূপসী। সে ঢুকছে হেঁটে, রেস্টহাউজটি তা বুঝতেই পারছে না, এতে রাশেদ একটু অসহায় বোধ করলো। স্বাধীনতা যে মানুষকে বিকশিত করে এ-রেস্টহাউজটিকেই তার উদাহরণ ব'লে মনে হয় রাশেদের; সে কখনো এমন একটা ভবনের কথা ভাবতেও পারে নি, কিন্তু বাঙালি তা বাস্তবায়িত করেছে ব'লে-হয়তো ব্যাংক থেকে টাকা চুরি ক'রেই বাস্তবায়িত করেছে, কিন্তু তাতে কী আসে যায়-বাঙালি যে এর স্বপ্ন দেখেছে এবং একে বাস্তবায়িত করেছে, সেজন্যে বাঙালিকে, তার স্বাধীনতাকে সে অভিনন্দন জানালো, যেমন জানিয়েছে আগেও, যখনি সে পান করতে এসেছে আবদেলের এখানে। স্বাধীনতায় বাঙালি মুসলমানের ত্বক খুব মসৃণ আর স্পর্শকাতর হয়েছে, বঙ্গীয় গরম ওই ত্বক আর সহ্য করতে পারে না, এটাও সভ্যতার পরিচায়ক; ভাবতে ভালো লাগে রাশেদের এটার স্বাপ্নিক যে, তার বাপদাদা হয়তো বোশেখ মাসে বোরোখেতে খালি গায়ে রোদে জমি নিড়োতে নিড়োতে গামছা দিয়ে বারবার গা মুছতো, বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে ডুব দিয়ে গামছা প'রেই বাড়ি ফিরতো, আর তার উত্তরপুরুষ, স্বাধীন উত্তরপুরুষ, এখন ওই অসভ্যতা থেকে

কতো দূরে। রেস্টহাউজটি তরুণীর মাংসের মতো শীততাপনিয়ন্ত্রিত। আবদেলের বয়স আটচল্লিশ বা পঞ্চাশ হবে; সে পানের জন্যে, রাশেদের মতো দু-একজন ছাড়া, ডাকে সাধারণত আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের তরুণতরুণীদের, যারা পান করার ব্যাপারটিকে প্রফুল্লকর ক'রে তোলে। তরুণতরুণীদের সঙ্গও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, ওদের পাশে বসলে গোপনে জীবন ঢুকতে থাকে দেহে, যেমন শেকড় বেয়ে গাছের শরীরে রস ঢোকে। কয়েক বছর আগে রাশেদ এক বুড়োর সাথে গল্প ক'রে বিকেলের পর বিকেল কাটাতো, একদিন সে বুঝতে পারে বুড়োটি নিঃশব্দে তাকে খাচ্ছে, তার ভেতর থেকে রস শুষে নিচ্ছে, পর দিন থেকেই সে বুড়োটির সাথে দেখা করা বন্ধ ক'রে দেয়। কয়েক দিন পরই রাশেদ খবর পায় বুড়োটির খুব অসুখ হয়েছে, হয়তো বাঁচবে না; কিন্তু রাশেদ তাকে দেখতে যায় নি, তার ভয় হ'তে থাকে বুড়োটি শয্যায় শুয়ে শুয়ে তাকে শুষে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে। রাশেদও শুষতে শিখেছে, সে যখন তরুণতরুণীদের সঙ্গ পায়, যদিও তার বয়স ছত্রিশ, সে নিঃশব্দে শোষণ করে তরুণতরুণীদের। কোনো তরুণতরুণী যতোটা জীবন নিয়ে তার কাছে আসে ততোটা জীবন নিয়ে আর ফিরতে পারে না। বসার ঘরে ঢুকেই মুগ্ধ হলো রাশেদ, এতো সুন্দর তরুণতরুণী সে একসাথে অনেক দিন দেখে নি, গাছপালার বাইরে বাঙলাদেশে যে আজো এমন সৌন্দর্য রয়েছে, তার অনেক দিন তা মনেই হয় নি; রাস্তায় আর তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তরুণতরুণীদের দেখে সে ধ'রে নিয়েছিলো সৌন্দর্য ছেড়ে গেছে দেশটিকে। দশ বারোটির মতো তরুণতরুণী সোফা ও মেঝেতে ব'সে আছে, খিলখিল ক'রে হাসছে, মেয়েরাই খিলখিল করছে বেশি, গড়িয়ে পাশের তরুণের গায়ে ঝ'রে পড়ছে, তাদের চুল বাহু গাল চিবুক থেকে সৌন্দর্য ঝরছে। বাদ্য বাজছে, দু-তিন জোড়া তরুণতরুণী নাচছে, তাদের আন্দোলন ও আলিঙ্গন সারা ঘরে অসম্ভব সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। চোখে এসে আগুনের মতো ঢুকছে তাদের পোশাক, পোশাক উপচে এসে চোখে ঢুকছে তাদের মাংস; বিশেষ ক'রে মেয়েদের বাহু ও বুকের তাতাথৈথৈ সারা ঘরটিকে উত্তেজনায় টানটান ক'রে তুলেছে। আবদেল একটা বড়ো রকমের সংবর্ধনা জানালো রাশেদকে, এটা আবদেলের আরেকটা গুণ, সে মানুষের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয় সহজে।

হুইস্কি আর বিয়ারের ব্যবস্থা করেছে আবদেল; যার যা পছন্দ তুলে নিয়ে উৎফুল্ল হওয়ার অনুরোধ জানালো সে। একটি বিয়ারের ক্যান ভেঙে রাশেদ গেলাশে ভরলো, তাকিয়ে রইলো উপচানো ফেনার দিকে, বিয়ার উপচে পড়ার দৃশ্য সে উপভোগ করে সব সময়, জীবনপাত্র উচ্ছলিত হওয়ার চিত্রকল্পটি তার মনে পড়ে, সোনালি রঙটিও তার খুব পছন্দ। তরুণতরুণীরা নিজেদের পছন্দমতো হুইস্কি ও বিয়ার নিয়ে সোফায় আর মেঝেতে বসলো, খুব পিপাসাগ্রস্ত তারা, গলা ফেটে বিলের মাটির মতো চৌচির হয়ে আছে; একটি তরুণী নেচে নেচে গিয়ে বসলো আবদেলের কোলে। নাচতে সে যতোটা শিখেছে তার চেয়ে অনেক সুন্দরভাবে শিখেছে কোলে বসতে, জড়িয়ে ধরতে; কার কোলে বসতে হবে, তাও

চমৎকার শিখেছে। এ-তরুণীদের সাথে আবদেলের সম্পর্ক চমৎকার, সে যে-কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারে, ধরেও; তারা কিছু মনে করে না, খুশি হয় একটু বেশি ক'রে, তাদের প্রেমিকেরাও খুশিতে বিহ্বল হয়ে ওঠে। যে এমন পানের সুযোগ দিচ্ছে তাকে এটুকু দিতে তরুণদের বাধছে না, তরুণীরা তো দিতেই উৎসাহী। রাশেদের ভালো লাগলো যে বাঙলার ছেলেমেয়েরা এগিয়েছে, স্বাধীনতাই নিশ্চয়ই এগিয়ে দিয়েছে, পানটান আর জড়িয়ে ধরা, আর গালে বা চিবুকে বা গ্রীবায় একটু ভেজা চুমোকে তারা আর পাপ মনে করে না, তারা তাদের বাপদাদার অপরাধবোধের মধ্যে নেই। ওই যে-মেয়েটি হাঁটছে আর খাচ্ছে, খোঁপার মতো যার বুক দুটি, তার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে চিৎকার ক'রে উঠবে না, মদ লইয়া আইছ, লগে লোচ্চাগোও লইয়া আইছ। মেঝেতে ব'সে যে-মেয়েটি হুইস্কির গেলাশে চুমুক দিচ্ছে, ওর ঠোঁটের বাঁক দেখেই বোঝা যাচ্ছে ও খুব সুখ পাচ্ছে, ও কি বাসায় গিয়ে স্বীকার করবে ও হুইস্কি খেয়েছে? নাকি যখনই আজকের কথা কাউকে বলবে, তখনি বলবে আবদেলের এখানে যারা এসেছিলো তারা সবাই মদ খেয়ে চুর হয়ে গিয়েছিলো, শুধু সে একাই খেয়েছিলো কোমল পানীয়। মদটদ সে একদম সহ্য করতে পারে না, কোমল পানীয়ই তার প্রিয়। সে কি বলতে পারবে হুইস্কি সে পছন্দ করে, হুইস্কিতে খারাপ কিছু নেই? নাকি সেও হবে সেই মাগিটার মতো যে দূতাবাসগুলো চ'ষে বেড়ায়, সব ধরনের বোতল চুষতে চুষতে শেষে দুটি ষাঁড়ের কাঁধে চ'ড়ে বাসায় ফেরে বা ফেরে না, এবং পত্রিকায় গপ্পগুজবের পাতায় লেখে পার্টিতে সে শুধু খায় একটু কোমল পানীয়, মদটদ সে একদম সহ্য করতে পারে না? রাশেদের পাশে বসেছে এক ঝকঝকে তরুণ, দাড়িও রেখেছে ঝকঝকে, তাতে তার ঝকঝকে ভাবটা আরো বেড়েছে। তার পাশে বসেছে যে-মেয়েটি, সে নিশ্চিত তার প্রেমিকা; তারা হাত ধ'রে থাকছে, একটু বউ বউ ভাবও করছে মেয়েটি, ছেলেটিও একটু স্বামী স্বামী ভাব করছে। মেয়েটি কী খাচ্ছে? বিয়ার? বেশ, কিন্তু যখন এ-বালকের বউ হবে সে, তখন খেতে পারবে তো? বালক তাকে খেতে দেবে তো? নাকি তখন এ-বালক টানবে, বছর বছর মেয়েটির পেট বোঝাই করবে, মেয়েটি পানি ছাড়া কিছু ছোঁবে না, আর বালকটি বন্ধুদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেই চিৎকার করবে, মদ লইয়া আইছ, লগে লোচ্চাগোও লইয়া আইছ। টেলিভিশনে আজান শোনা গেলো, আজান শুনলেই রাশেদের কায়কোবাদকে মনে পড়ে, কে মোরে শুনাইল মধুর আজানের ধ্বনি। ছেলেদের কোনো বদল ঘটলো না, মনে হলো না কেউ উঠে গিয়ে অজু করতে শুরু করবে, জায়নামাজ খুঁজবে; কয়েকজন টেলিভিশনে ওই মধুরধ্বনি শুনতে শুনতে গেলাশ ভরলো। তাদের মর্মেমর্মে বেজে চলছে অন্য সুর; কিন্তু মেয়েরা ঘোমটা দেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো। জিন্সের সাথে তারা ওড়নাও পরে? বাজারে কি এরই মধ্যে ওড়না-জিন্স বেরিয়ে গেছে? ব্যাগে তারা বহন করে ঘোমটা? একটি মেয়ে মাথায় দেয়ার মতো কিছু জোগাড় করতে পারে নি, সে নিজের স্তন দুটি টেনে মাথায় তুলে দিতে চেষ্টা করছে। ধর্ম ও পানের মধ্যে

মিলন ঘটিয়েছে তারা, হুইস্কি ও ঘোমটায় কোনো বিরোধ নেই; তারা ঘুমোবে কিন্তু সতীত্ব বিসর্জন দেবে না। হুইস্কির কাজ হুইস্কি করবে, ঘোমটার কাজ করবে ঘোমটা। অন্ধ ধরনের একটি লোক ইসলাম, আল্লা, ও আরো অনেকের মহিমা আবেগে মেতে বর্ণনা করতে লাগলো টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে, তাকে দেখেই বোঝা যায় শোবিজ কতো প্রতাপশালী, ধর্মও শোবিজ হয়ে উঠেছে। ধর্মকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হ'লে শোবিজ ছাড়া উপায় নেই।-আচ্ছা বলুন তো, রাশেদ আবদেলকে জিজ্ঞেস করলো, আল্লা কি এ-লোকটিকে পছন্দ করতে পারে? তার কথা শুনে সবাই টেলিভিশনের দিকে ভালো ক'রে তাকালো। লোকটির মুখ ভ'রে কালো কালো দাগ, বড়ো বড়ো গর্ত, গালের পাশটা যেনো ছুরি দিয়ে ফালা ক'রে কেটে নেয়া হয়েছে, কপালটা কালো ঝামা, আর সে চোখ দুটি ওপরে নিচে এমনভাবে নামাচ্ছে উঠোচ্ছে যে তাকে অন্ধ মনে হচ্ছে, তবে সে অন্ধ নয়। সে নিশ্চয়ই ভিডিওখোর, হিন্দি কোনো ক্যাসেট হয়তো বাকি রাখে নি। সে আবৃত্তি ক'রে চলছে অতিশয়োক্তি, যে কেউ যা কেয়ামত পর্যন্ত, ঘিলু ছাড়াই, আবৃত্তি ক'রে যেতে পারে। আবদেল বললো, আমি নিশ্চিত আল্লা একে পছন্দ করতে পারে না, প্রভুর নিশ্চয়ই সৌন্দর্যবোধ রয়েছে। আবদেল তার কোলের তরুণীটির মুখ সকলের দিকে তুলে ধ'রে বললো, সৌন্দর্যবোধ থাকলে প্রভু পছন্দ করবে একে। সবাই হেসে উঠতে যাচ্ছিলো, তার আগেই রাশেদের পাশের ছেলেটি চিৎকার ক'রে উঠলো, আল্লারে লইয়া আমি ফাইজলামি পছন্দ করি না। দ্যাখেন ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তার চিৎকারে চমকে উঠলো সবাই, খুব বিব্রত হয়ে পড়লো তার পাশের মেয়েটি, যে হয়তো তার প্রেমিকা; আবদেলও খুব বিব্রত বোধ করলো। একটি মেয়ে বললো, ইসলাম নিয়ে ফাজলামো আমিও পছন্দ করি না। আমি মুসলমান, ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাতে কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। চোদ্দো শো বছর আগে ইসলামই প্রথম নারীদের মুক্তি দিয়েছিলো। রাশেদ চোখের সামনে একটি মুক্ত নারী দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হলো, যে চোদ্দো শো বছর ধ'রে মুক্ত, চোদ্দো শো বছর ধ'রে যে হুইস্কি খাচ্ছে, জিন্স পরছে, নাচছে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো রাশেদ, সময় দেখার জন্যে নয়, শতাব্দী দেখার জন্যে; তার ঘড়িটিতে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা দিন মাস বছর সব ধরা পড়ে, খুব দুঃখ হলো তার যে এটিতে শতাব্দী ধরা পড়ে না। একটু পরেই সে-বালকটি, যে আল্লাকে নিয়ে ফাজলামো পছন্দ করে না, সোফা থেকে গড়িয়ে পড়লো, ভক ভক ক'রে বমি করতে লাগলো। সে এরই মাঝে পাঁচ ছটি বিয়ার আর চার পাঁচটি হুইস্কি শেষ ক'রে দিয়েছে, রাশেদের দ্বিতীয়টিও তখন শেষ হয় নি। বমিতে সে কার্পেট ভাসিয়ে দিয়ে নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে রইলো, তাকে টেনে অন্য ঘরে সরিয়ে নিলো আবদেল। সবাই আবার পান করতে লাগলো, আর সে-মেয়েটি যে এর বউ হবে সে খুব অপরাধী বোধ করতে লাগলো, পান না ক'রে সে মেঝে পরিষ্কার করতে লাগলো। ওই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক পান করবে, পান করতে করতে চিৎকার করবে,

দ্যাখেন ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আর মেয়েটি সারাজীবন ওই ধার্মিকের বমিই পরিষ্কার ক'রে চলবে।

বাসায় ফিরে ঘুমোনোর চেষ্টা করছিলো রাশেদ, তার চোখের পাতায় ভিড় করছিলো তরুণ মুসলমান বাঙালিরা, স্বাধীনতার শস্য ও দেশের ভবিষ্যতেরা, জিন্স প'রে হুইস্কি বিয়ারের গেলাশ হাতে যারা মধ্যযুগে ফিরে গেছে। রাত একটার মতো হবে, কলিংবেল বেজে উঠলো; রাশেদ শুনতে পেলো এক লোক জোরে জোরে বলছে, স্যার, আমরা থানা থেকে এসেছি, আমি ওসি স্যার, একটু ওঠেন, আপনার সাথে একটু কথা আছে স্যার। থানা? তার সাথে থানার কী কথা থাকতে পারে? ঢাকা শহরে অনেক থানা আছে ব'লে রাশেদ শুনেছে, না থাকলেই ভালো হতো ব'লেও শুনেছে রাশেদ, কিন্তু কী সম্পর্ক তার থানার সাথে? থানায় কি খবর পৌঁছে গেছে যে রাশেদ আজ পান করেছে, হুইস্কি ও বিয়ার দুটোই, এবং মাঝেমাঝে পান করেছে তরুণীদের বাহু গ্রীবা স্তন থেকে গ'লে পড়া আবেদন? একটি মেয়ের গ্রীবা সে আজ একটু বেশি ক'রেই পান করেছে, তাতে একটু মত্ততাও এসেছিলো, এ-সংবাদ কি থানায় পৌঁছে গেছে? রাশেদ হাত বাড়িয়ে দেখে নিলো সে বাসায় শুয়ে আছে কিনা, পাশের নারীটি তার বউ কিনা, নাকি সে রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি ক'রে চলছে, পুলিশ তাকে তুলে নিতে এসেছে। না, এটি তার শয্যাই, ডোরাকাটা বালিশটিও তারই, পাশের নারীটিও তার স্ত্রীই, পরস্ত্রী নয় বেশ্যাও নয়, এবং আজ রাতে তার সাথে সে বৈধ বা অবৈধ কিছুই করে নি। তাহলে কি তার মুখ থেকে খুব গন্ধ বেরোচ্ছে, যা থানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেহেতু সে পেয়ারাপাতা চিবোয় নি? সামরিক আইনের শুরুর দিকে সব ব্যাটা বড়ো বেশি দায়িত্বশীল হয়ে পড়ে, পুলিশ একটু বেশি ক'রেই দায়িত্বশীল হয়, ঘুষও নিতে চায় না, নিলে পাঁচ গুণ বেশি নেয়। ঝুঁকি বেশি। সে মদ খেয়েছে, এটা পুলিশ জেনে গেছে, এতে একবার তার খুব শ্রদ্ধা হলো পুলিশের প্রতি। এমন পুলিশ থাকলে শ্রেষ্ঠ ধর্মের কোনো ভয় নেই, দেশের ভয় নেই, তবে পুলিশ কি খায়টায় না? শুধু ঘুষ খায়? মদ ছোঁয়ও না? রাশেদ দরোজায় এসে জিজ্ঞেস করলো, কে? ওসিটি অত্যন্ত বিনীত, সম্ভবত আইস্ক্রিম দিয়ে তৈরি, গ'লে গ'লে সে বলতে লাগলো, স্যার, এতো রাতে আপনাকে ডিস্টার্ব করছি ব'লে দুঃখিত। স্যার, আমরা তেতলার ফ্ল্যাটটা চেক করবো স্যার, ওখানো অবৈধ কাজ হয় স্যার, আমাদের সাথে একটু থাকতে হবে আপনাকে, স্যার। অবৈধ কাজ? কাকে বলে অবৈধ কাজ? পুলিশ যে তাকে এতো রাতে ডেকে তুলেছে, এটা বৈধ? ভাঁড়রা দেশ দখল করেছে, এটা বৈধ? অবৈধ কাজ, অর্থাৎ তাদের তেতলার ফ্ল্যাটে পতিতাবৃত্তি চলছে? অর্থাৎ অবৈধ সঙ্গম চলছে? মাস তিনেক ধ'রে ওরা আছে, অথচ একবারও রাশেদের সন্দেহ হয় নি। তিন মাস ধ'রে এ-দালানটি এক নবযুগের মধ্যে বাস করছে, উল্লাসের মধ্যেও, দালানটির শ্রেণীউত্তরণই ঘটে গিয়েছিলো, এটা ভালোই লেগেছে রাশেদের। আগে গাড়ি ক'রে এ-দালানে কেউ আসতো না বা সপ্তাহে এক—আধটি গাড়িতে আসতো কারো কোনো দূরসম্পর্কিত

আত্মীয়, এতে তো খারাপই লাগতো তার, মনে হতো বস্তিতে প'ড়ে আছি, দালানে একটাও উন্নত বাঙালির পদধুলি পড়ছে না; আর ওরা আসার পর গাড়ি আসছিলো আর যাচ্ছিলো, বেবি আসছিলো আর যাচ্ছিলো, আসছিলো আর যাচ্ছিলো সুন্দর সুন্দর বালিকারা আর পুরুষেরা। ওদের সম্পর্কে কোনোই সন্দেহ হয় নি তার, শুধু একদিন তার বন্ধু জহির তেতলার জানালার পর্দার আয়তন দেখে বলেছিলো, তোমাদের তেতলায় নিশ্চয়ই পর্দানসিনেরা এসেছে। বাড়িঅলার খঙ্কর ঘরজামাইটা, যে দিনরাত অজু করে সামনের কলে, সে তো দাঁড়িয়েই থাকতো ওদের জন্যে, দেখলেই, আফা, ভাল আছেন ত বলতে বলতে পেছনে পেছনে হাঁটতো, কোর্টে যে চোরের জামিন হয় ব'লে রাশেদ শুনেছে, সেও বুঝতে পারে নি কিছু? বেশ্যা ধরতে রাশেদ পুলিশের মতো তেতলায় উঠবে? পুলিশকে কি সে বেশ্যাদের থেকে বেশি বৈধ মনে করে? আর ওরা আছে ব'লেই তো সেদিন তার এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেলো, যার সাথে এক দশক ধ'রে দেখা নেই, যে খুব উন্নতি করেছে, দুটি কারখানা দিয়ে শিল্পপতি হয়েছে, যে বিশাল গাড়ি নিয়ে ঢুকেছিলো ভেতরে। সে বললো যে তেতলায় বোনের সাথে দেখা করতে এসেছে; তবে সে একা আসে নি, সঙ্গে তার এক বন্ধু ছিলো, যে একটি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক। রাশেদ পুলিশদের সাথে তেতলায় উঠলো, পুলিশেরা অনেকক্ষণ ধ'রে দরোজা খোলার জন্যে চিৎকার করলো, একসময় এক নারী দরোজা খুলে ওসিকে বললো, আপনি আবার জ্বালাতন করতে এলেন? আপনাকে তো দিচ্ছিই। ওসি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো, রাশেদ পুলিশের সাথে ভেতরে ঢুকলো। একটি সোফায় ব'সে আছে বছর ষাটেকের একটি লোক, অবাঙালি, আরেকটিতে এক বাঙালি, অত্যন্ত সুদর্শন, চল্লিশের মতো বয়স। একটি যুবক পুলিশ দেখেই দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে চিৎকার করতে লাগলো, আমারে মাপ কইরা দ্যান, আমি নতুন বিয়া করছি, আমারে মাপ কইরা দ্যান, আমি নতুন বিয়া করছি। যুবকটির জন্যে খুব দরদ বোধ করলো রাশেদ; আহা, চাইলে সে এখন, রাত দুটোর সময়, ঘুম থেকে জাগিয়ে বা না জাগিয়ে নতুন বউয়ের সাথে আরেকটি সঙ্গম করতে পারতো, কিন্তু সে এখন পায়খানায় ঢুকে কাঁদছে, বহুদিন আর সুযোগ পাবে না। পাশের ঘরে তিনটি সুন্দর বালিকা, ষোলো সতেরো বছর হবে, প্রায় নগ্ন ব'সে আছে। এ-বালিকা তিনটিকে রাশেদ বহুবার উঠতে নামতে দেখেছে, মুখে ইংরেজিও শুনেছে, ওদের প্রায় নগ্ন শরীর দেখে একবার কেঁপেও উঠলো রাশেদ। ওসি অশ্লীল ভাষায় ব'কে চলছে সবাইকে, বিশেষ ক'রে বাড়িঅলিকে। বাড়িঅলিকে অনেক শ্লীল মনে হলো ওসির থেকে, সে চলতি বাঙলাই বলছে, ইংরেজিও বলছে। এখন যদি ভোট হয়ে যায় তাহলে রাশেদ কাকে ভোট দেবে, বাড়িঅলিকে, ওই মেয়ে তিনটিকে, না ওসিকে? না, ওসি তার ভোট পাবে না। বুড়োটা বাঙলা-ইংরেজি-উর্দু মিশিয়ে জানালো সে এক পাকিস্থানি জাহাজের ক্যাপ্টেন। এ-বুড়োটার সাথেই শুয়েছিলো হয়তো ওই বালিকাদের একটি, বা দুটি, বা তিনটিই; রাশেদের রক্ত খসখস করতে লাগলো। বাঙালি মেয়েরা নিগ্রো

হটেনটট জুলু বুশম্যান যার সাথে ইচ্ছে ঘুমুক, রাশেদের আপত্তি নেই; কিন্তু পাকিস্থানির সঙ্গে ঘুমটা তার রক্তে কামড় দিলো। সুদর্শন লোকটির বসার ভঙ্গি দেখেই একটু দমে গিয়েছিলো ওসি, তাকে একবার প্রশ্ন ক'রেই থেমে গেলো। সে শক্তিমান কেউ হবে, হয়তো ছোটোখাটো কোনো ভাঁড় হবে, তাকে বেশি প্রশ্ন করা ঠিক নয়। ওসি অশ্লীল গালি দিয়ে চলছে বাড়িঅলিকে, শক্তির ভাষা এখানে অশ্লীল হ'তেই হয়। রাশেদ বললো, ওসি সাহেব, আপনি এমন গালাগালি করছেন কেনো? এদের নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যান। তার কথায় বিস্মিত হলো ওসি, সে এমন আশা করে নি; সে ভেবেছিলো রাশেদ মুগ্ধ হবে তার গালাগালিতে, তার নৈতিকতা রক্ষার পদক্ষেপকে প্রশংসা করবে, উল্লাসে রাশেদও দু-একটি গালি দেবে। সুদর্শন লোকটি এক সময় বললো, আমাদের কোথায় নেবেন, চলুন। তারা সবাই পুলিশের সাথে বেরিয়ে গেলো।

স্টেডিয়ামে একটা কাজ পড়েছে রাশেদের, মাঝেমাঝেই আসতে হচ্ছে। একটা যন্ত্র কিনেছিলো, দোকানদার যন্ত্রটির গুণ গাইতে গাইতে রাশেদকে অপরাধী ক'রে তুলেছিলো; রাশেদের মনে হয়েছিলো গুণাধিরাজকে না কেনা বিশ্বাসঘাতকতা হবে, কেননা দোকানদার রাশেদকে দেখেই বিশ্বাস ক'রে ফেলেছিলো রাশেদ যন্ত্রটা কিনবে; কিন্তু কেনার কয়েক দিন পরই সেটি নষ্ট হয়ে যায়। রাশেদের কাজ পড়েছে দোকানে এসে খোঁজ করা ওটি সারাই হয়েছে কিনা। আজও হয় নি, দোকানদার জানিয়েছে শিগগিরই হবে, এটা এক বড়ো ধরনের আশার কথা। আশাই হতভাগ্যদের, বাঙালির, বাঁচার প্রেরণা। রাশেদ এখন কোথায় যাবে? যাওয়ার জায়গা বেশি নেই দেশে, আর রাশেদের যাওয়ার জায়গা খুবই কম। আবদেলকে দেখে গেলে কেমন হয়? তার অফিস বেশি দূরে নয়, চৌরাস্তা পেরিয়ে কিছুটা পুবে গিয়ে একটা পাঁচতলায় উঠতে হবে। আবদেল অনেক দিনই বলেছে অফিসে যেতে, আজো যেতে পারে নি রাশেদ, আজ গেলে কেমন হয়? রাশেদের যেতেই ইচ্ছে করছে, যন্ত্রটি গোপনে গোপনে যে-যন্ত্রণা দিচ্ছে, আবদেলের ওখানে গেলে তার বিষ একটু কমতেও পারে। আবদেলের অফিসে ঢুকে মুগ্ধ হলো রাশেদ, বসার ঘরের কার্পেটে পা রাখতেই তার দ্বিধা হচ্ছিলো, নিজেকে মনে হচ্ছিলো নিজের পূর্বপুরুষ, যে পাটখেত নিড়োতে নিড়োতে সারা গায়ে মাটি মেখে এখানে ঢুকে পড়েছে। তার স্যান্ডলে নিশ্চয়ই মাটি লেগেছে। এ-কার্পেট নিশ্চয়ই মাটিলাগা স্যান্ডলের জন্যে নয়;-স্বাধীনতা, তুমি বাঙালি মুসলমানকেও কেমন উন্নত ও বিকশিত করো। একটি লোক জানালো, স্যার ভেতরে ব্যস্ত, রাশেদকে একটু বসতে হবে। এমন অফিস যার, তাকে অবশ্যই ব্যস্ত থাকতে হবে, ভেতরে ব্যস্ত থাকতে হবে বাইরে ব্যস্ত থাকতে হবে। ব'সে থাকতে চমৎকার লাগছিলো রাশেদের, আবদেল ভেতরে ব্যস্ত থাকুক, তার নিজের কোনো ব্যস্ততা নেই। কিছুক্ষণ পর আবদেলের ঘরের দরোজা ঠেলে একটি তরুণী বেরোলো, সুগন্ধে ভ'রে উঠলো পৃথিবী, সে প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বেরিয়ে গেলো। ওই তরুণীর একজোড়া পা না থেকে একজোড়া পাখনা থাকলেই ভালো হতো।

আবদেল কতোক্ষণ ব্যস্ত ছিলো? এমন প্রজাপতি ঘরে ঢুকলে কতোক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়? আবদেল কতোক্ষণ ব্যস্ত থাকতে পারে? লোকটি রাশেদকে ভেতরে যেতে বললো। রাশেদকে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়লো আবদেল; এটা তার গুণ, যেনো তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলো আবদেল। কফি, সামরিক আইন, দশটা টেলিফোন, বিলেত, ন্যুঅর্ক, বাঙলাদেশ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতিতে আপ্যায়িত হয়ে রাশেদ যখন উঠবে, আবদেল তার হাতে বেনসনের একটি প্যাকেট দিয়ে বললো, এটা আপনার জন্যে। আবদেল যেভাবে দেয়, তাতে বিনয়েও না করা যায় না। রাশেদ নেমে রিকশা নিলো। রিকশাটি যখন বায়তুল মোকাররামের উত্তর দিয়ে চলছে, তখন তার ইচ্ছে হলো একটি সিগারেট খেতে। আবদেলের দেয়া সিগারেট প্যাকেট খুলেই সে চমকে উঠলো, ভেতরে এটি কী? কোনো গোলাপি সাপ? আবদেল প্যাকেটে গোলাপি পাতলা মসৃণ সাপটি ঢুকিয়ে তার হাতে তুলে দিয়েছে? প্যাকেটটি রাশেদের হাত থেকে প'ড়ে যাচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি পকেটে রাখলো। আবদেল কী ব্যবহার করে? রাজা? ড্যুরেক্স? আবদেল নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিলো প্রজাপতিটির সাথে; তার উত্তপ্ত ব্যস্ততা সে ঢেলে দিয়েছে মসৃণ সাপের খোলশে, আর খোলশটি, যার ভেতরে আবদেলের ব্যস্ততা তরল ঠাণ্ডা হয়ে আছে, তুলে দিয়েছে রাশেদের হাতে। আবদেলের কমোডের ফ্ল্যাশ নিশ্চয়ই কাজ করছে না। নামাজিরা বেরিয়ে আসছে, তারা যদি টের পায় তার পকেটে রয়েছে একটি মসৃণ গোলাপি সাপের খোলশ? খোলশের ভেতরে রয়েছে তরল ঠাণ্ডা ব্যস্ততা? তারা পাথর ছুঁড়তে শুরু করবে? তাদের পকেটে নাকি সব সময় পাথর থাকে, ঢিল থাকে, সাপের মাথা ঘষার জন্যে। জলপাইরঙের ট্রাক আসছে কয়েকটি, ট্রাকগুলো কি টের পেয়ে গেছে যে তার পকেটে সাপ রয়েছে? না, টের পায় নি; শাঁই শাঁই ক'রে ট্রাকগুলো চ'লে গেলো। প্যাকটটি ছুঁড়ে ফেলে দেবে রাস্তায়? রাস্তায় প'ড়েই যদি প্যাকেট খুলে যায়, ভেতরের সাপ লাফিয়ে বেরোয়, আর মাথা দোলাতে থাকে, মাথা দোলাতে থাকে, মাথা দোলাতে থাকে? লোকজন কি তখন সাপের খেলা দেখবে? ডাস্টবিন দেখা যাচ্ছে একটা, ময়লা উপচে পড়ছে, রিকশা থামিয়ে রাশেদ ডাস্টবিনে ফেলে আসবে সাপের বাক্সটি? সবাই সন্দেহ করবে না? এদেশে ডাস্টবিনে কেউ কিছু ফেলে না, সে যদি রিকশা থেকে নেমে যত্নের সাথে ডাস্টবিনে প্যাকেটটি ফেলে, তখন রিকশাঅলাও তাকে সন্দেহ করবে, মনে করবে সে কোনো বোমা পুঁতে যাচ্ছে। সেগুনবাগিচাটা নির্জন, সেখানে পথের পাশে প্যাকেটটি ফেলার সুযোগ মিলতেও পারে। রাশেদ রিকশাঅলাকে সেগুনবাগিচায় ঢুকতে বললো; কিন্তু না, দেশের বারো কোটি বাঙালি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান বোধ হয় টের পেয়ে গেছে তার পকেটে সাপের বাক্স আছে। সাপের খোলশে রয়েছে তরল ব্যস্ততা। তারা অনেক দিন সাপের খেলা দেখে নি, আজ খেলা দেখতে চায়। রাশেদ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে রিকশা থেকে নামলো, ভাবলো উদ্যানের কোনো ঝোপের ভেতরে সাপটি ছেড়ে দেবে, সাপটি এঁকেবেঁকে কোনো খোঁড়লে ঢুকে পড়বে; কিন্তু একটি ঝোপের কাছে যেতেই

দেখলো এক যুবক খুব ব্যস্ত কাজ ক'রে চলছে এক যুবতীর স্তনাঞ্চলে। সে এমনভাবে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্লাউজের ভেতর দিয়ে যে যুবতীটির দম বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু সে কাজ ক'রে চলছে, কাজই এখন সত্য তার জীবনে; সুন্দর বিকল্প বের করেছে ছেলেটি, সাপের কাজ ক'রে চলছে হাত দিয়ে, ভেতরে ভেতরে সে খুব ব্যস্ত। এ-যুবক কতোক্ষণ ধ'রে এমন ব্যস্ত? ও সাপ দিয়ে ছোঁ দিয়ে খোলশ বদলাতে পারে না? আবদেলের মতো ওর জায়গা নেই? ছেলেটির কাজ শিথিল হয়ে পড়লো, এলিয়ে পড়লো সে। তার ব্যস্ততা শেষ হয়ে গেছে, মেয়েটি একটা বড়ো দম নিলো; এর পর সে এ-কর্মী যুবকের সাথে বেরোনোর সময় ব্লাউজ খুলে বাসায়ই রেখে আসবে। এখানে রাশেদ সাপটি ছাড়তে পারবে না। রাশেদ আরেকটি ঝোপের খোঁজে এগোতে লাগলো। ঝোপের ভেতর থেকে একটি লিকলিকে মিশমিশে লোক বেরিয়ে এলো, রাশেদের পাশে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্যালক্যাল ক'রে জিজ্ঞেস করলো, ছার, লাগবো? না, তার এখন কিছু লাগবে না; কিন্তু লোকটি ব্যবসা জানে, রাশেদকে দেখেই বুঝে ফেলেছে তার লাগবে। বললো, স্যার, টিভিস্টার, ফিলিমস্টার, পাঁচাজার ছার। রাশেদের এসব কিছু লাগবে না, তার দরকার একটি নীরব নির্জন ঝোপ, যেখানে সে সাপ ছাড়তে পারে। তার পকেটে এমন একটা সাপ, যেটা ফোঁসফাঁস করে না ঢুশঢাশ মারে না শুধু দুধভাত খায়। রাশেদ কি একটা বেবি নেবে, শহর পেরিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে আসবে সাপটি? কিন্তু সেটি যদি ভাসতে ভাসতে রাশেদের নাম বলতে বলতে চ'লে আসে শহরে, গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এসে ঢুকতে চায় তাদের জানালা দিয়ে? ডাক দেয় রাশেদের নাম ধ'রে? রাশেদ উদ্যানে হাঁটতে লাগলো, হাঁটতে হাঁটতে দেখলো কয়েকটি নেতা জটলা পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওরা কি সাপ ব্যবহার করতো? তখনো সাপ বেরোয় নি? তাহলে ওরা কী ব্যবহার করতো? কিছুই ব্যবহার করতো না? এজন্যেই আজো ওদের চেহারার মতো কাউকে কাউকে দেখা যায়? রাশেদের ইচ্ছে হলো বীররা কীভাবে ঘুমোয়, একটু দেখতে; তারা মাটির নিচে ঘুমিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না, তবে ঘুম হচ্ছে না ব'লেই মনে হচ্ছে। আহা, তখন যদি সাপ বের হতো তাহলে আজ ওরা শান্তিতে ঘুমোতে পারতো; সাপের অভাবে কতো অশান্তিই না ভোগ করতে হয়েছে ওদের। রাশেদের হাতেই ছিলো প্যাকেটটি, কেউ দেখলে ভাববে সে সিগারেট বের করবে এখনি; সে সিগারেট বের করবে না, তার হাত কাঁপছে, তার হাতে সাপের বাক্স, কেঁপে কেঁপে হাত থেকে খ'সে পড়লো প্যাকেটটি কারুকার্যের ওপর। একটি লোক আসছে দেখে সে প্যাকেটটি তোলার জন্যে হাত বাড়ালো; কিন্তু ভয় লাগলো তার যে সাপটি ঢাকনা খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে তাকে ছোবল দেবে। সে হাত টেনে পকেটে রেখে আস্তে আস্তে নিচে নামলো; কিন্তু দেখতে লাগলো পেছনে কারুকার্যিত মেঝের ওপর সাপটি লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, এদিকে সেদিকে ফণা দোলাচ্ছে, আর ফণা দোলাচ্ছে।

৪ ঘোলা জল, বিড়ালি, আর গোলাপ-মেয়ে

সব কিছু প'চে গেছে;-ওই বাড়িগুলো, বাড়ির ভেতরে মানুষগুলো, মানুষের ভেতরে মগজ, মাংস, রক্ত, অণ্ড, যোনিগুলো, যদি থাকে তবে আত্মাগুলোও প'চে গেছে। জমাট দুর্গন্ধে ঢাকা পড়ছে রাশেদ, তার ত্বকের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে ঢুকছে একেকটি পচাগলা লাশ, দুর্গন্ধে রক্তের প্রতিটি কণা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, প্রতিটি রক্তকণা তার ভেতরে বমি ক'রে চলছে, বমিতে তার ভেতরটা বেশ্যাবাড়ির নর্দমার মতো ঘিনঘিনে হয়ে উঠছে। মাথার ওপরের আকাশ আর মেঘ, স্তরে স্তরে বাতাস, দূর থেকে বিচ্ছুরিত রৌদ্র, সমগ্র জলবায়ু প'চে তার ওপর ঝ'রে পড়ছে, পচা বস্তুর অবিরল প্রপাতে রাশেদ ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে। বড়ো বেশি দুর্গন্ধ পাচ্ছে রাশেদ, হয়তো সে নিজেই প'চে গেছে; মাঝেমাঝে নিজের অজান্তেই ঘ্রাণ নিচ্ছে সে নিজের মুঠোর। কিছু ছুঁতেই তার ইচ্ছে হচ্ছে না, বাগানের ওই গোলাপটি ছুঁলেও তার হাত পঙ্কিল হয়ে উঠবে ব'লে মনে হচ্ছে, মানুষের কথাই নেই, প্রতিটি মানুষ পঙ্কস্তূপের মতো। একটি সম্পূর্ণ দেশ প'চে গেছে, অন্তত এ-শহর প'চে গেছে। এ-শহরে কয় লাখ বদমাশ বাস করে? এ-শহরে অধিবাস করে কয় লক্ষ শুয়োরের বাচ্চা? এ-শহরে সঙ্গম করে কয় লাখ কুত্তাকুত্তি? আমিও কি একটা বদমাশ, শুয়োরের বাচ্চা, একটা কুত্তা? রাশেদ সারাটা দেশের দিকে তাকাতে চায়, হাতের তালুর রেখার মতো দেখতে চায় গ্রাম নদী ধানখেত পুকুর শহরগুলো, তার চোখে কোনো দেশ পড়ে না গ্রাম পড়ে না নদী পড়ে না; চোখে দোমড়ানো বুট ভেসে ওঠে, লাশ ভেসে ওঠে, অসংখ্য পশুর চিৎকারে তার কান নষ্ট হয়ে যেতে চায়। আচ্ছা, এ-দেশের উত্তরে কী? দক্ষিণে কী? পশ্চিমে কী? পুবে কী? রাশেদ কিছুই দেখতে পায় না, সে অন্ধ হয়ে গেছে। পঞ্চগড় বগুড়া রংপুর রাজশাহি দিনাজপুর বোয়ালমারি চট্টগ্রাম কুমিল্লা নোয়াখালি ঠাকুরগাঁও মধুপুর মৌলভিবাজার ব্রাহ্মণবাড়িয়া যশোর নড়াইল রামপাল চরফেশন সিলেট কমলগঞ্জ সিরাজদিখান রাড়িখাল শ্রীনগর পাবনা ঈশ্বরদি কুষ্টিয়া জকিগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর নাচোল পীরগঞ্জ শেরপুর চকোরিয়া মনপুরা টেকনাফ বিলাইছড়ি শ্যামনগর ডুমুরিয়া হেতালবুনিয়া সাঁথিয়া চান্দিনা চাটখিল দাগনভুঁইয়া কচুয়া নড়াইল মধুপুর নাটোর নারায়ণগঞ্জ সাতকানিয়া রামগড় বান্দরবন কেন্দুয়া মিঠাপুকুর জলঢাকা মাইজপাড়া ভাগ্যকূল কান্দিপাড়া দিঘলি কবুতরখোলা ভারপাশা দামলা গাদিঘাট শিমুলিয়া সাতঘরিয়া কয়কীর্তন শ্যামসিদ্ধি ভাঙ্গা মাওয়া দোহার শেলামইত সরসা তালা নরিয়া কোথায়? কতো দূর নষ্ট শহর থেকে? কতো দূর গেলে, কতো হাজার বছর কতো হাজার মাইল হাঁটলে, আমি দূরে যেতে পারবো দুর্গন্ধের নগর থেকে, গলিত লাশের অভ্যন্তর থেকে? কিন্তু সুস্থ কি আছে মধুপুর, তার উরুতে পাছায় বুকে বগলে কুঁচকিতে কোনো ঘা হয় নি? হাঁটতে হাঁটতে যদি হরিণাকুণ্ড চ'লে যাই, তাহলে কি সেখানে দেখতে পাবো

গাছে পচন ধরে নি, পচন ধরে নি জলে, ঘাসের শেকড়ে, মাছের মুড়োতে, কচুর লতিতে, পুঁইফলে? কলাপাড়া, একটা নাম মনে আসছে, যদিও রাশেদ জানে না এমন কোনো নাম আছে কিনা ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলে, মনে হচ্ছে সে স্বপ্ন দেখেছে নামটি, কলাপাড়ায় কলাগাছের সারি আছে কিনা জানে না রাশেদ, তার জানতে ইচ্ছে হয় কলাপাড়ায় কলাগাছের সারি থাকলে তার কলার কাঁদিতে কি পচন ধরে নি? না, আমি এসবের মধ্যে নেই, সঙ্গে নেই; ওই টাওয়ারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, ওই শীততাপনিয়ন্ত্রণ, টেলিভিশন, সিনেমা, বঙ্গভবন, সচিবালয়, আমদানিরপ্তানি, বুট, ট্যাংক, স্টেনগান, কুচকাওয়াজ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা, দালাল, দেশপ্রেমিক কারো সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করে রাশেদের। আমি তোমাদের মতো বাঙালি নই তোমাদের মতো মুসলমান নই, আমি তোমাদের মতো বাঙালি হ'তে চাই না তোমাদের মতো মুসলমান হ'তে চাই না।

ভাঁড়গুলো বেশ জাঁকিয়ে বসছে, প্রচ্ছদে প্রচ্ছদে বড়ো ভাঁড়টার ছবি, সে এখন জাতীয় ছবি হয়ে উঠেছে, জাতীয় চরিত্র হয়ে উঠছে, খণ্ডকালীন জাতির পিতাও হয়ে উঠতে পারে, যদি সে চায়; তার জারজ পুত্র হওয়ার জন্যে অনেকেই তৈরি। অন্যান্য, ছোটো ছোটো, ভাঁড়গুলোও ছোটো ছোটো মহাপুরুষের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করছে, পেট ফুলিয়ে গাড়িতে উঠছে গাড়ি থেকে নামছে, তোরণের ভেতর দিয়ে ঢুকছে তোরণের ভেতর দিয়ে বেরোচ্ছে, ফিতা কাটছে, ফুলের মালা পরছে-হায় ফুল; তাদের পেছনে পেছনে, কুকরের মতো, ছুটছে বাঙালি, বাঙালি মুসলমান, চিরবিদ্রোহী জাতি, রক্তের কণায় কণায় যার বায়ান্নো আর একাত্তর। বাঙালি মুসলমানের মুখের দিকে তাকালে মাঝেমাঝে কুকুরের মুখ দেখা যায়, মানুষের মুখ আর কুকরের মুখের অদলবদল ঘটে; বাঙালি মুসলমান দু-চার বছর পর পর কুকুর হয়, ভালোবাসে কুকুর হ'তে; চারপাশে এখন কুকুরেরা জিভ বের ক'রে ছুটছে, পা চাটবে, প্রভুর পা চাটবে। প্রভু চাই, প্রভু দেখা দিয়েছে ব'লে খুব সুন্দর স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে বাঙালির মুসলমানের মুখগুলো। প্রত্যেক আবদুল আহাম্মদ মোহাম্মদ লাইন খুঁজছে, ডাস্টবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে; এখনো কামড়াকামড়ি শুরু হয় নি, শুরু হবে শিগগিরই। দুর্গন্ধ ভাগাড়ের একপাশে এখনো একটি কোমল নির্মল ফুল ফুটে আছে রাশেদের জন্যে, তার নাম মৃদু; যার পাশে বসলে রাশেদ কোনো দুর্গন্ধ পায় না, পায় আশ্চর্য সুগন্ধ যাতে তার রক্ত পরিস্রুত হয়ে ওঠে। রাশেদের ভালো লাগে মৃদুর সাথে কথা বলতে, আর সব কিছু তার ঘেন্না লাগে। রাশেদ জানে মৃদু, মৃদুর মতো শিশুরা সমাজরাষ্ট্র চালায় না, আহা সমাজরাষ্ট্র! সমাজরাষ্ট্র চালায় হারামির বাচ্চারা; হারামির বাচ্চা না হ'লে রাষ্ট্রের ভার পাওয়া যায় না, সমাজের ভার পাওয়া যায় না। পালে পালে শুয়োরের বাচ্চাদের অধীনে জীবন কাটালাম, অতীতে পালে পালে এসেছে, এখন একপাল এসেছে, ভবিষ্যতে পালে পালে আসবে, আমি তাদের অধীনে জীবন কাটাবো,

আমার জীবন ধন্য থেকে ধন্যতর হয়ে উঠবে, মনে হয় রাশেদের। মৃদুর হাতে রাষ্ট্র নেই, মৃদু তাকে কিছু দিতে পারে না, বা সেই পারে সব দিতে, যা ওই শুয়োরগুলো কোনোদিন কাউকে দিতে পারবে না। মৃদুর সাথে জীবন হচ্ছে জীবন, তার বাইরে গেলেই জীবন আবর্জনা জীবন ভাগাড় জীবন বেশ্যাবাড়ি; রাশেদের বাইরে যেতেই ইচ্ছে করে না, কোনোদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না, প্রতিদিন যা ছাপা হয়ে বেরোয় নোংরা নিউজপ্রিন্টে, তার দিকে তাকালে গলগল ক'রে বমি আসতে চায়। মৃদু তার কাছে শুধু গল্প চায়, গল্প শুনতে চায়, আরো গল্প চায়; রাশেদ গল্পের পর গল্প বানিয়ে চলে। মৃদু কোনো প্রশ্ন করে না, তার গল্পগুলো সত্যি কিনা জানতে চায় না, ওগুলো যে সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই মৃদুর, যদি জানতে পারে ওগুলো সত্য নয়, তাহলে হয়তো সে কেঁদে ফেলবে, বা ওগুলো যে মিথ্যে হ'তে পারে তা বোঝানো যাবে না তাকে; সে শুধু জানতে চায় তারপরে কী হলো? রাশেদও একদিন হয়তো এমনি চাইতো, তার কাছে সবই সত্যি ছিলো, শুধু গল্পের শেষ ছিলো না; যেমন মৃদুও বিশ্বাস করে গল্পের কোনো শেষ নেই, সব গল্পই সত্যি। সে যখন মৃদুকে গল্প বলে, তখন তার মনে হয় সেও আসলে ওই গল্প শুনছে, সে শুধু বলছে না শুনছেও, যেনো সেও মৃদুর মতো উদগ্রীব হয়ে থাকে গল্প শোনার জন্যে, তখন সেও মৃদু হয়ে যায়। মৃদুর থেকে বেশি মৃদু হয়ে যায়, মৃদু গল্প শোনে আর কল্পনায় হয়তো গল্পের ভেতরে ভেতরে ঘোরে, রাশেদ ঘুরতে থাকে তার বাল্যকালে। মৃদুর ওই বাল্যকাল নেই। রাশেদ একবার বলেছিলো, ছোটোবেলায় বোশেখ মাসে ঝড়ের মধ্যে আমরা আম কুড়োতে যেতাম; মৃদু প্রশ্ন করেছিলো, ঝড়ের মধ্যে কেনো আম কুড়োতে যেতে আব্বা? মৃদুর প্রশ্ন শুনে খুব ঘা খেয়েছিলো রাশেদ; সে ভেবেছিলো মৃদুও যেতে চাইবে আম কুড়োতে, তার বদলে মৃদু জানতে চেয়েছে কারণ। ঝড়ের মধ্যে আম কুড়োতে যাওয়ার আনন্দটা কোনোদিন বোঝানো যাবে না মৃদুকে, ওতে যে আনন্দ থাকতে পারে, তা সে কখনো বুঝবে না; তার কাছে এটাকে মনে হয়েছে একটা কাজ, তাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে কারণটা। মৃদুর জন্যে সে একটি নায়িকা তৈরি করেছে, মৃদু নায়িকাই চায়; তাকে রাশেদ গাছ মাছ ধান মেঘের গল্প ব'লে দেখেছে, সে সবচেয়ে পছন্দ করে নায়িকার গল্প। মৃদু কি গাছ মাছ ধান মেঘের বাইরে প'ড়ে যাচ্ছে, ওসব কি মিথ্যে হয়ে গেছে ওর জীবনে; সত্য হয়ে উঠছে লিপস্টিকপরা নায়িকা? ওর ভেতরেও কি পচন ধরছে? ওকেও কি পচিয়ে ফেলছে চারপাশ? ওর কি দোষ? ওকে তো কখনো মেঘের নিচে নিয়ে যাই নি গাছের পাতা জড়িয়ে ধরতে দিই নি ধান দেখাই নি মাছের আঁশের শোভা দেখাই নি কচুরিপানার ভেতরে ডুব দিতে দিই নি বৃষ্টিতে ভিজতে দিই নি। পৃথিবীর বদলে ও শুধু একটা টেলিভিশন পেয়েছে।

মৃদুর জন্যে একটি নায়িকা তৈরি করেছে রাশেদ; এটা নায়িকা আর নায়কদের সময়, চারপাশে নায়কনায়িকা, এতো নায়কনায়িকা আগে আর কখনো ছিলো না, পরেও কখনো থাকবে না, নাকি পরে শুধু পৃথিবী ভ'রে নায়কনায়িকাই থাকবে,

পাঁচ মিনিটের জন্যে সব মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ বিখ্যাত হবে;-একটি শাদা বিড়ালি;-একদিন রাশেদ তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষের দরোজা খুলতে গিয়ে দেখে দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিড়ালি! না, মৃদুর বিস্ময়বোধ নষ্ট হয়ে যায় নি, সে অবাক বিস্মিত বিহ্বল হ'তে পারে। বিড়ালি দাঁড়িয়ে আছে শুনেই ঝলমল ক'রে ওঠে মৃদু, বিড়ালি দাঁড়িয়ে আছে! দেখতে শাদা! তোমার ঘরের দরোজায়! কী মজা! রাশেদের বিদ্যালয়টি কেমন মৃদু জানে না; শুনেছে সেটা বিরাট দালান, বারান্দার পর বারান্দা, ছাত্র আর ছাত্রী, সেখানে বিড়ালি! মৃদু বলে, আমি যদি বিড়ালি হতাম, কী মজা হতো! রাশেদ বলে, বিড়ালিটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার ঠোঁট টুকটুকে লাল, কী চমৎকার লিপস্টি পরেছে! মৃদু লাফিয়ে ওঠে, বিড়ালি লিপস্টি পরেছে, টুকটুকে লাল, কী মজা, দেখতে খুব মিষ্টি, তাই না? কী লিপস্টি আব্বু? রাশেদ বলে, রেভলন, টুকটুকে লাল, সিঁদুরের মতো তার ঠোঁট, আমাকে দেখে বলে মিউ; তারপর লাফিয়ে বুকে উঠে জড়িয়ে ধরে আমাকে।
রাশেদ মৃদুর চোখের ভেতরে বিড়ালিকে দেখতে পায়, যে-বিড়ালিকে আগে সে কখনো দেখে নি, যাকে সে এইমাত্র মৃদুর জন্যে সৃষ্টি করেছে। রাশেদ যখন গল্প শুরু করেছিলো তখন বিড়ালিটিকে সে দেখে নি, ওটি ছিলো এক প্রাণীর নাম; মৃদুর মুখের, চোখের, ভুরুর, ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে সে রহস্যের মতো দেখতে পায় একটি শাদা বিড়ালিকে, যার ঠোঁট মেরেলিন মনরোর ঠোঁটের মতো লাল, যার শরীরের স্পর্শ সিল্কের স্বাদে পরিপূর্ণ। বিড়ালি রাশেদের সাথে ঘরে ঢোকে, ঢুকেই লাফিয়ে টেবিলে ওঠে, লাল ঠোঁটে ডাকতে থাকে মিউ মিউ। মৃদু চোখ এমনভাবে বড়ো করে যেনো সে দেখতে পাচ্ছে বিড়ালিকে, যে তার আব্বুর টেবিলে ব'সে মিউ মিউ ডাকছে, মৃদুর একটু ঈর্ষাও লাগছে, সে কোনোদিন আব্বুর ঘরে যায় নি, গিয়ে টেবিলে বসে নি। তারপর বিড়ালি কী করলো, জানতে চায় মৃদু। রাশেদ বলে, এমন সময় এক ছাত্রী দরোজায় এসে বললো, আসি স্যার? একটি ছাত্রী এসেছে শুনে মৃদু খুব সংকটে পড়লো, বললো, হায়, ছাত্রী এসে গেছে? বিড়ালির কী হবে? সে কোথায় যাবে? সে তো আর পড়তে জানে না! রাশেদ বলে, না না, বিড়ালি খুবই পড়তে জানে, বড়ো বড়ো বই পড়ে, কবিতা তার খুবই পছন্দ। মৃদুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না, আনন্দে পাতার মতো কাঁপতে থাকে; বলে, বিড়ালি কবিতা পছন্দ করে, বড়ো বড়ো বই পড়ে! বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই? কী কবিতা পছন্দ করে সে? অনেক কবিতা তার মুখস্থ? রাশেদ মৃদুকে গল্প বলতে থাকে, আর পেরিয়ে যায় নষ্ট নগর, অনেক দূর চ'লে যায়, দেখে কচুরিপানার ভেতরে একটি হাঁসের পাশে পাশে সে সাঁতার কাটছে, ঘাসের ওপর শুয়ে জড়িয়ে ধ'রে আছে একটি ছাগশিশুকে, প্রজাপতি উড়ছে, ঘাসের গন্ধে তার বুক ভ'রে উঠছে। মেঘের মতো ঠাণ্ডা মসৃণ কচুরিপানার পাতা তার গালের সাথে লেগে আছে। নতুন পানিতে পুকুর ভ'রে গেছে, লাল আলপনা আঁকা পুঁটিমাছের ঝাঁক একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে লাফিয়ে

চলছে; পুকুরের পানিতে একটু নামতেই রাশেদকে ঘিরে লাফাতে শুরু করে চঞ্চল রঙিন পুঁটির ঝাঁক।

রাশেদ একটি খাল দেখতে পায়, খালের ভেতর দিয়ে বয়ে চলছে ঘোলা জলের তীব্র কাটাল, ছুটে চলছে পদ্মার বালুকণা। ঘোলা জল মানেই পদ্মা, খালের ভেতর দিয়ে ছুটলেও পদ্মা, আর ষোলো মাইল পাশ ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে ছুটলেও পদ্মা। রাশেদের কেনো শুধু মামাবাড়ি যেতে ইচ্ছে করতো, মৃদু তো একবারও মামাবাড়ির কথা বলে না। ওর মামা নেই ব'লে? ওই গ্রামটি খুব পছন্দ ছিলো রাশেদের, কেননা ওখানে ওর মামাবাড়ি; আর ওই গ্রামের নরম বেলেমাটি, চাঁদের জন্যে পাগল বাঁশবন, পদ্মার ইলিশের জন্যে উন্মন লেবুবন তাকে টানতো, বর্ষা এলে তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যেতো কাটালভরা খাল। পদ্মা থেকে একেকটি খাল বেরিয়েছে, শুকনো কালে তাতে কোনো পানি থাকতো না, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস এলেই পদ্মানদী প্রচণ্ডভাবে ঢুকে পড়তো খাল দিয়ে, আর খাল উপচে খেত পালান কোলার ভেতর দিয়ে। খালের পানি ঘোলা, পদ্মার পানির মতোই, ওই পানি খালের দুপাশ কাঁপিয়ে বইতো বিলের দিকে। বিল ছিলো খালের সমুদ্র। খালের কাটাল ছিলো প্রচণ্ড, আখের পাতার মতো ধার, মনে হতো খালের দুপাশ-বেতঝোপ, লেবুজাম্বুরা কলার ঝাড়, নারকেল শুপুরির সারি কেটে কেটে টেনে টেনে নিয়ে যাবে বিলের ভেতরে। কাটাল উজিয়ে নৌকো বাওয়া ছিলো যেমন কষ্টের তেমনি উত্তেজনার, নৌকো একবার ডানে বেঁকে যেতো আরেকবার বাঁকতো বাঁয়ে, ডানে বেঁকে গিয়ে লাগতো বাঁশঝাড়ে বাঁয়ে বেঁকে গিয়ে লাগতো বেতঝোপে, উঠতে থাকতো ঘোলাজলের শোঁ শোঁ শব্দ। রাশেদ অবশ্য মামাবাড়ি গেলে ওই আট বছর বয়সে নৌকো বাইতে পেতো না, বাওয়ার সাহসও হতো না, নৌকোয় উঠলে নৌকোর গুরা শক্ত ক'রে ধ'রে থাকার উত্তেজনাই তার ভালো লাগতো; তবে তার সুখ লাগতো কলাগাছের ভেলা বাইতে। ওই গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে নৌকো ছিলো না, নৌকোর দরকারও পড়তো না, তবে কলাগাছের ভেলা থাকতো সবারই; তার মামাতো ভাইটিরও একটি ভেলা ছিলো। কলাগাছের ভেলায় উঠতেই কেমন যে সুখ লাগতো, পায়ের তলাটা সব সময় পিচ্ছিল থাকতো, একটু এদিক ওদিক হ'লেই উল্টে পানিতে প'ড়ে যেতে হতো, জড়িয়ে ধ'রে থাকতে হতো ভেলা, তারপর বুক দিয়ে বেয়ে বেয়ে উঠতে হতো ভেলায়। যখন খুব ছোটো ছিলো রাশেদ তখনো তার ভেলায় উঠতে খুব ইচ্ছে হতো, কিন্তু তাকে উঠতে দেয়া হতো না সে সাঁতার জানতো না ব'লে। পিছলে খালের কাটালে পড়লে রক্ষা নেই। সে-বছর সে সাঁতার শিখেছে, অনেকটা শিখেছে, ঘাট থেকে সাঁতরে কিছু দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে। দুজোড়া নারকেল জড়িয়ে ধ'রে সে সাঁতার শিখেছে, তাদের পাশের বাড়ির এক বুড়ো সাঁতার শিখিয়েছে তাকে; তার মনে হয়েছে মাটি এতোদিন যেমন তার পায়ের নিচে ছিলো এবার পানিও তার বুকের নিচে। সাঁতার শেখা হচ্ছে পানিতে হাত আর বুক দিয়ে হাঁটতে শেখা। এখন সে পানিতে হাঁটতে শিখেছে।

মৃদুর নায়িকা বিড়ালি এবার লাফ দিয়ে রাশেদের টেবিল থেকে গিয়ে পড়ে ছাত্রীটির কোলে, জড়িয়ে ধ'রে ঠোঁট ঘষতে থাকে তার গালে নাকে কানে; খিলখিল ক'রে ওঠে মৃদু, কী দুষ্টু কী দুষ্টু! বিড়ালির ঠোঁটের রেভলন লেগে ছাত্রীটির গাল গোলাপের মতো লাল হয়ে ওঠে, নাক লাল হয়ে ওঠে, কান লাল হয়ে ওঠে। রাশেদ যতোই বর্ণনা দিতে থাকে, ততোই খিলখিল ক'রে ওঠে মৃদু; রাশেদও বাড়াতে থাকে বর্ণনা, বলে বিড়ালি ছাত্রীটির গলায় ঠোঁট ঘষতে থাকে, ঠোঁট ঘষতে থাকে, ঠোঁট ঘষতে থাকে, বিড়ালির ঠোঁট থেকে আলতার মতো গল গল ক'রে বেরোতে থাকে লিপস্টি, মেয়েটির গলা গোলাপের মতো লাল হয়ে ওঠে। মেয়েটি ঘুমিয়েই পড়ে, স্বপ্ন দেখে সে গোলাপ হয়ে গেছে। মৃদু অবাক হয়, চোখে একটা বড়ো গোলাপ দেখতে পায়; তারও যেনো ইচ্ছে করে গোলাপ হ'তে। মৃদু জানতে চায়, তার জামা, শাড়ি? রাশেদ বলে, তার ব্লাউজ আগে কেমন ছিলো তা তো দেখি নি, তবে বাতাসে শাড়ি একটু উড়তেই দেখি তার ব্লাউজ গোলাপের পাপড়ির মতো লেগে আছে তার গায়ে, আর শাড়িও হয়ে গেছে গোলাপের পাপড়ি। ওই গোলাপের গায়ে ঝুলে আছে শাদা বিড়ালি। এমন সময় বিড়ালি মিউ বলতেই মেয়েটি চোখ মেলে তাকায়, জিজ্ঞেস করে, আমি কোন বাগানে ফুটেছি? আবার সে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ে, চেয়ার থেকে গড়িয়ে প'ড়ে যেতে চায়; বিড়ালি তাকে জড়িয়ে ধ'রে রাখে, মাথাটি দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দেয়। মেয়েটির শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোতে থাকে, সুগন্ধে সারা ঘর ভ'রে যায়। সে-গন্ধে, রাশেদ বলে, আমার ঘরের দরোজায় ভিড় জ'মে যায়; মনে হয় দেশের সব মানুষ এসে বলছে, আপনার ঘরে একটা গোলাপ ফুটেছে, তার গন্ধে সারা দেশ ভ'রে গেছে, আমরা গ্রাম থেকে ধান খেত থেকে নদীর ঢেউয়ের ওপর থেকে দূরের শহর থেকে শহরের গলি থেকে গোলাপটিকে দেখতে এসেছি। মৃদু নির্বাক হয়ে আছে, তার খিলখিল হাসি বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই, বিস্ময়ে সেও ঘুমিয়ে পড়তে চায়; এক সময় সে জানতে চায়, তুমি কি তাদের ওই গোলাপ দেখালে? ওই গোলাপ কি দেশের সবাইকে দেখানো যায়? ওই গোলাপ কি বিক্রির জন্যে যে সবার চোখের সামনে তাকে মেলে ধরতে হবে? রাশেদ অবশ্য ঠিক করতে পারছে না সে গোলাপটিকে সকলকে দেখাবে কী দেখাবে না, মৃদু কোনটা পছন্দ করবে? মৃদু নিশ্চয়ই চাইবে গোলাপটি আর কেউ দেখতে পাবে না, শিশুরা সুন্দরকে নিজের জন্যেই রেখে দিতে চায়, মৃদুও চাইবে তাই; গোলাপটি সকলের হয়ে উঠলে তার ভালো লাগবে না।

সাঁতার শিখেছে রাশেদ, এবং প্রথম সাঁতার শেখার পর মনে হয় যেনো সব সময়ই পানিতে রয়েছি, বাতাসকে মনে হয় পানি, বিছানাকে মনে হয় পানি, শরীর সব সময় সাঁতার কাটতে থাকে; রাশেদের ভেতরে রক্তের কণাগুলো সারাক্ষণ সাঁতার কাটছে, সব কিছুকেই জল মনে হচ্ছে আর লাফিয়ে পড়ছে, নাকে পানি ঢুকছে, চোখ লাল টকটক করছে, সে সাঁতার কেটে চলছে। সাঁতার শেখার পর মামাবাড়ি গেছে এই প্রথম, গেছে নৌকোয় চেপে, কিন্তু যাওয়ার সময় মনে

হয়েছে সাঁতার কেটে যাচ্ছে; তার গায়ে লাগছে আউশধানের ধারালো পাতা, গা খশখশ করছে, লাগছে কলমিলতা, দলঘাস, ধনচে। মামাবাড়ির খাল দিয়ে ছুটে চলছে ঘোলা কাটাল; খাল উপচে ঘোলা জল বয়ে চলছে পালানের কচুর ঝোপ, আর পাটচারা কাঁপিয়ে। ঘোলা জলে ঘুমিয়ে থাকার মতো প'ড়ে আছে কলাগাছের ভেলাটি। দুপুরের পর সে কলাগাছের ভেলাটিতে গিয়ে উঠলো। লগি দিয়ে ভেলা বাইতে গিয়ে সুখে ভ'রে গেছে তার শরীর; কচুঝোপের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় পাতাগুলো আস্তে আস্তে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে, শিরশির শব্দ হচ্ছে, একটা ছিনেজোঁক পানিতে লাফিয়ে পড়লো। লেবুপাতার গন্ধ পাচ্ছে সে, লেবুপাতার গন্ধ পেলে সে ইলিশের গন্ধও পায়, ভেলাটা একটু বেঁকে লেবুঝোপে ঢুকে পড়লো, বেশি ঢোকে নি, ঢুকলে কাঁটায় আটকে যেতো। এখানে পানিতে কাটাল কম, একটু পরেই খাল। রাশেদ জোরে লগি মারতেই ভেলাটি খালে গিয়ে পড়লো, স্রোতের ধাক্কায় গোত্তা খেলো ঘুড্ডির মতো, রাশেদ চেষ্টা করলো লগি মেরে ভেলাটিকে সোজা করতে, কিন্তু সেটি চরকির মতো ঘুরে কাত হয়ে গেলো। ধাক্কায় পিছলে রাশেদ ভেলা থেকে ছিটকে পানিতে গিয়ে পড়লো, প্রচণ্ড কাটাল তাকে অজগরের মতো টেনে সামনের দিকে ভাসিয়ে নিতে চাইলো। পানিতে প'ড়েই তলিয়ে গিয়েছিলো রাশেদ, ঘোলা পানিও খেয়েছে অনেকখানি, রাশেদ খালের মাটিতে পা চাপ দিয়ে দু-হাত উঁচু ক'রে ভেসে উঠে ভেলা ধরতে গিয়েই দেখলো ভেলাটি কাটালের টানে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, পাতার মতো ঘুরতে ঘুরতে কাঁপতে কাঁপতে বিলের দিকে চলছে, রাশেদ আর তাকে পাবে না। রাশেদ আবার পানিতে ডুবে গেলো, ডোবার সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সিরাজের মুখ, সিরাজ, যে গত বছর এ-খালেই ডুবে মারা গেছে, মরতে যার ভয় লাগতো, যে তার মতোই ভেলায় উঠতে পছন্দ করতো ব'লে মামাবাড়ি বেড়াতে আসতো, যে আর ভেলায় উঠবে না। না, আমি মরতে চাই না, আমি মরবো না, আমি আবার মামাবাড়ি বেড়াতে আসবো, মামীর হাতে দুধভাত খাবো, মনে মনে চিৎকার করতে করতে রাশেদ পানিতে ডুবে গেলো, পা দিয়ে সে খালের তলা খুঁজতে চেষ্টা করলো, এবং তলায় পা লাগতেই দু-পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে পানির ওপর ভেসে উঠলো। তাকে কি কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কেউ কি দেখতে পাচ্ছে না সে তলিয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

খুব অস্বস্তিতে পড়েছে মৃদু, যদি দেশের সব লোক এসে গোলাপটিকে দেখতে পায়, তাহলে গোলাপটির কী হবে? সে কোনো কথা বলছে না, তার চোখ এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে যে বোঝা যায় সে চায় না কেউ গোলাপটিকে দেখুক। ওই গোলাপ শুধু মৃদুর হয়ে থাক, শুধু আব্বুর হয়ে থাক। রাশেদ বললো, আমি দরোজায় গিয়ে দেখি কোনো মানুষ নেই, গ্রাম থেকে কেউ আসে নি শহর থেকেও আসে নি কেউ ধানখেত থেকেও কেউ আসে নি নদী থেকেও কেউ আসে নি, শুধু আমার দরোজায় ব'সে আছে একটি নীল পায়রা। চমকে উঠলো মৃদু, খুশিতে তার চোখমুখ ভ'রে উঠলো; মৃদু জানতে চাইলো, পায়রাটি কি ঢুকলো তোমার ঘরে?

রাশেদ বললো, হুঁ, আমি পর্দা সরাতেই পায়রাটি নীল মেঘের টুকরোর মতো ভাসতে ভাসতে আমার ঘরে ঢুকলো, বসলো আমার টেবিলে, বসতেই আমার টেবিলে গজিয়ে উঠলো সবুজ ঘাস, সেখান থেকে একটা প্রজাপতি উড়ে গিয়ে মেয়েটির মাথায় গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। বোঝাই গেলো না যে ওটি প্রজাপতি, ওটি সোনার প্রজাপতি হয়ে গেলো। মেয়েটি ঘুমের মধ্যেই একবার হাত দিয়ে চুল থেকে কাঁটার মতো খুললো প্রজাপতিটিকে, ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলো, আবার ডান হাতে নিলো, তারপর নিজের গালে ঘ'ষে প্রজাপতিটিকে সে পরিয়ে দিলো তার বুকে ঘুমিয়ে থাকা বিড়ালির মাথায়। মৃদু চুপ হয়ে গেছে, বিড়ালি গোলাপ-মেয়ে পায়রা ঘাস প্রজাপতি তাকে ঘিরে ফেলেছে, সে যে উৎফুল্ল হয়ে খিলখিল ক'রে উঠবে, সে-চেতনাও তার নেই, এতো স্বপ্ন একসাথে এসে উপস্থিত হয়েছে তার চোখের সামনে যে এখন সে পারে শুধু ঘুমিয়ে পড়তে। রাশেদ দেখতে পায় মৃদুও অনেকটা ওই গোলাপ-মেয়ে হয়ে গেছে, তার কোলে ঘুমিয়ে আছে বিড়ালি, বিড়ালির মাথায় সোনার প্রজাপতি, ঘুমিয়ে পড়ছে মৃদু। ঘুম থেকে জেগে উঠলে আবার মনে পড়বে তার বিড়ালিকে, গোলাপ-মেয়েকে, পায়রাকে, প্রজাপতিকে, তখন জানতে চাইবে তারা কোথায়?

রাশেদকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, রাশেদও দেখতে পাচ্ছে না কাউকে, তার মগজ জুড়ে আকাশফাড়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিচ্ছে সিরাজ, যে ভেলা ভালোবাসতো, যে গতবছর ভেলা থেকে প'ড়ে গিয়েছিলো, যাকে কেউ দেখতে পায় নি, যে ভেসে উঠেছিলো বিলের ধানখেতে, সন্ধ্যার পর যাকে খুঁজে পেয়েছিলো গ্রামের লোকেরা। রাশেদ ভেসে উঠেই একটা লেবুর ডাল ধরলো, ডালটি ভেঙে রয়ে গেলো তার মুঠোতেই, সে আরো অনেকখানি পানি খেলো, একবার সাঁতরাতে গিয়ে উল্টে গেলো, এবং তলিয়ে গেলো। সে দেখতে পেলো সে সমুদ্রে প'ড়ে গেছে, একটা বড়ো মাছ হাঁ ক'রে আসছে, কী মাছ সে বুঝতে পারলো না, মনে হলো সে ঢুকে যাচ্ছে মাছের পেটে, অনেক আগে কে যেনো ঢুকে গিয়েছিলো মাছের পেটে, তার মতো সে ঢুকে যাচ্ছে মাছটির পেটে, যেখানে সে আটকে থাকবে, কোনোদিন বেরোতে পারবে না, মাছ তাকে পেটের ভেতরে নিয়ে এই সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রের দিকে চ'লে যাবে। মায়ের মুখ তার মনে পড়লো একবার, সে-মুখ মায়ের কিনা সে বুঝতে পারলো না, দেখতে পেলো একটা লাটিম খড়ের গাদার নিচে লুকিয়ে আছে, একটা জাম্বুরার ফুটবল গড়িয়ে চলছে পুকুরের দিকে, তার হাত অবশ হয়ে আসছে, পা দিয়ে খালের তলা খুঁজতে গিয়ে তলা খুঁজে পাচ্ছে না, তার পৃথিবীতে কোনো বাতাস নেই, তাকে ঘিরে আছে মহাজল। মহাজগত মহাজল হয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। সে কী ম'রে যাবে, ভেলা থেকে পিছলে প'ড়ে ম'রে যাওয়ার জন্যে সে এতো ভালোবাসতো মামাবাড়ি আসতে, এতো ভালোবাসতো বেলেমাটি, ম'রে যাওয়ার জন্যেই সে এমনভাবে বেড়ে উঠেছিলো? খালের তলায় রাশেদের পা ঠেকেছে, একটু সুখ লাগলো তার, মাটির ছোঁয়া লাগলে যেমন সুখ লাগে; পা দিয়ে চাপ দিয়ে সে ভেসে উঠলো,

তাকে ভেসে উঠতেই হবে, সে সিরাজ হবে না, সে ধানখেতে ভেসে উঠবে না, সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকের অপেক্ষায় সে ধানখেতে ভাসবে না, সে খালের পাড়ে উঠবে, হেঁটে একা মামাবাড়িতে ফিরবে, তারপর বাড়ি যাবে। ভেসে উঠলেও ঘুরপাক খাচ্ছে রাশেদ, ধরার মতো কিছুই পাচ্ছে না হাতের কাছে, সে একবার সাঁতরানোর কথা ভাবলো, তারপর চিৎ হয়ে ভাসতে চেষ্টা করলো, কাটাল তাকে চিৎ হ'তে দিচ্ছে না, তবে তাকে চিৎ হ'তেই হবে, চিৎ হ'তেই হবে তাকে। চিৎ হ'তে গিয়ে একটা প্রচণ্ড কাটাল তাকে টান দিলো, রাশেদ ঘুরপাক খেয়ে খালের পাশে লেবুঝোপের ভেতরে ঢুকে আটকে গেলো, সে একটা লেবুগাছের গোড়া ডান হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ধরলো। আমি বেঁচে আছি, ভাবলো রাশেদ, বেঁচে থাকবো; কিছুক্ষণ সে শুয়ে রইলো লেবুঝোপের ভেতরে, শুয়ে থাকতে এতো ভালো লাগলো তার যেমন ভালো আর কখনো লাগে নি, মায়ের কোলে শুয়েও লাগে নি, কোনোদিন লাগবে না। কারা যেনো নৌকো বেয়ে যাচ্ছে, কাটাল উজিয়ে যাচ্ছে, শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে; রাশেদ চাইছে তারা যেনো তাকে দেখতে না পায়। কিছুক্ষণ আগেও রাশেদ চাইছিলো কেউ তাকে দেখুক, গ্রামের সবাই তাকে দেখুক; এখন মনে হলো কেউ যেনো তাকে দেখতে না পায়, সে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবে লেবুঝোপের ভেতরে, তাকে দেখুক শুধু এই লেবুঝোপ, যে তাকে বাঁচিয়েছে, আর সে দেখবে লেবুঝোপকে। কেউ যেনো না জানে সে পানিতে প'ড়ে গিয়েছিলো, সবাই জানুক সে কখনো পানিতে পড়ে নি, সবাই জানুক সে সাঁতার জানে।

গিয়ে দেখি, রাশেদ শুরু করে, আমার ঘরের দরোজায় গোলাপ-মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেনো সে ওখানেই ফুটেছে, আর ভেতরে রুমঝুম নূপুরের শব্দ হচ্ছে, নাচছে কে যেনো ঘরের ভেতরে, শব্দ উঠছে রুমঝুম রুমঝুম। মৃদু চঞ্চল হয়ে ওঠে, কে নাচে কে নাচে? তোমার ঘর বন্ধ ছিলো না? রাশেদ বললো, ঘর তো বন্ধ ক'রেই এসেছিলাম, কিন্তু তাতে কীভাবে যেনো এক নর্তকী ঢুকে যায়, আর ওই নর্তকী যে কে তা তো আমি জানি না। আচ্ছা, আমি কি আমার ঘর খুলবো? মৃদু বেশ বিপদে প'ড়ে যায়, রাশেদও ঠিক একই বিপদে, ঘর খুললে যদি নাচ বন্ধ হয়ে যায়? রাশেদ বললো, আমি মনে করেছিলাম নাচের শব্দ শুধু আমি একাই শুনছি, আর কেউ শুনছে না, কিন্তু গোলাপ-মেয়েটি বললো, স্যার, আপনার ঘরে কে যেনো নাচছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমিও নাচের শব্দ শুনছো? সে বললো, জি স্যার, আমিও শুনছি, তবে আর কেউ শুনছে না, শুনলে তারাও দাঁড়াতো। মৃদু বললো, আব্বু, মেয়েটির তো অনেক বুদ্ধি, সে বুঝতে পারলো, তুমি তো বুঝতে পারলে না। রাশেদ বললো, মেয়েরা এমনিই খুব বুদ্ধিমান, যেমন তুমিও বুদ্ধিমান, আমার থেকে তুমিও তো আগে বুঝে ফেলো কখন তোমার আম্মা ফিরবে। রাশেদ বললো, গোলাপ-মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম, খেয়ালই করি নি প্রথমে, পরে খেয়াল ক'রে দেখি সে শাড়ি প'রে আসে নি;-শুনে মৃদু চোখ বড়ো করলো,-রাশেদ বললো, দেখি সে জিন্স প'রে এসেছে, নীল রঙের, আর পরেছে লাল টুকটুকে গেঞ্জি, তাকে গোলাপ, ঠিক

গোলাপ ব'লেই মনে হলো। মৃদু চমকে উঠলো, ভালোও লাগলো তার আবার অস্বস্তি লাগলো, বললো, মেয়েরা জিন্সও পরে? রাশেদ বললো, কেনো, তুমি তো পরেছো। কে যেনো মৃদুর ভেতরে উত্তরটা আগেই ঢুকিয়ে রেখেছে, যেমন প্রশ্নটাও ঢুকিয়ে রেখেছিলো, বললো, আমি তো ছোটো, ছোটোরা জিন্স পরে, বড়ো হ'লে মেয়েরা শাড়ি পরে। সামাজিক ব্যাকরণের অনেক প্রত্যয়বিভক্তি এরই মাঝে ঢুকে গেছে মৃদুর ভেতরে। রাশেদ বললো, জিন্সে গোলাপ-মেয়েকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো, শাড়ির থেকে অনেক সুন্দর, হাতে তুলে নিয়ে ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। সে বললো, এমন মিষ্টি নাচের শব্দ আগে কখনো শুনি নি, মনে হয় এমন যে নাচতে পারে তাকে চোখে দেখা যাবে না, কিন্তু তাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। রাশেদের রূপকথার প্রতিটি শব্দ সত্য ব'লে মনে হচ্ছে মৃদুর, এমনকি রাশেদেরও তা সত্যি মনে হচ্ছে, যেনো সত্যিই তার ঘরে নাচছে কেউ, তার দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে গোলাপ-মেয়ে। রাশেদের দরোজা খুলতে ইচ্ছে করছে না, দরোজায় দাঁড়িয়ে শুধু নাচের শব্দ শুনতেই ভালো লাগছে তার; কিন্তু মৃদুর ইচ্ছে হচ্ছে নর্তকীকে দেখার। বললো, আব্বু, দরোজা খোলো, কে নাচছে দেখি। রাশেদ বললো, দরোজা খুলে দেখি নাচছে বিড়ালি।

পাশের বাসার কাজের মেয়েটির একবার চিৎকার আজ রাতেও শুনেছে রাশেদ, দু-এক রাত পরপরই মধ্যরাতে হঠাৎ সে চিৎকার ক'রে ওঠে, একবার, তারপর আর কিছু শোনা যায় না। ওর চিৎকারটা বিদ্যুতের মতো, হঠাৎ ঝিলিক দেয়, পরমুহূর্তে তার কোনো চিহ্ন থাকে না, কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিছুক্ষণ ধ'রে তার গর্জন চলতে থাকে শুধু রাশেদের মনে। মেয়েটির দুঃস্বপ্ন দেখার রোগ আছে? পাশের বাসার ভদ্রলোকের সাথে রাশেদের মাঝেমাঝেই দেখা হয়, বেরোনোর বা ফেরার সময়; তিনি গাড়িতে যান গাড়িতে আসেন, রাশেদের থেকে বছর পনেরোর বড়ো হবেন, মুখে গাল ঘেঁষে যত্নে কামানো দাড়ি; তাঁর বউর মুখে দাড়ি নেই, থাকতে পারতো, খুব ধার্মিক মহিলা, দুজনেই হজ করেছেন, ফিরে ভদ্রমহিলা স্ত্রীলোকদের একটি সাপ্তাহিকে 'কাবার আলো' নামে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখছেন, যাতে স্বামীর পায়ের নিচে সুন্দর সুন্দর বেহেস্ত তিনি বানিয়ে চলছেন, দুজনেই ইনশাল্লাহ্ ছাড়া কথা বলেন না, ছেলেমেয়েরা সবাই বিলেত বা সুইডেন বা আমেরিকা বা ইরানে, কী আশ্চর্য তাঁদের বাসার কাজের মেয়েটি মাঝরাতে একবার চিৎকার ক'রে ওঠে, তারপর আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। রাশেদেরও এমন বদভ্যাস গোলাগুলিতে ঘুম ভাঙে না, ঘুম ভেঙে যায় পাশের বাড়ির কাজের মেয়ের একবারের চিৎকারে, তারপর ঘুম আসতে কষ্ট হয়। অবশ্য কষ্টটা রাশেদের ভালো লাগে; বছরের পর বছর ধ'রে তার এতো ঘুম হচ্ছে যে মনে হচ্ছে সে গাধা হয়ে যাচ্ছে, যখন সে সিংহ হওয়ার স্বপ্ন দেখতো তখন রাতের পর রাত ঘুম হতো না, এখন কাজের মেয়েটির চিৎকারেও ঘুম ভেঙে গেলে তার ভালো লাগে একথা ভেবে যে সে বেঁচে আছে। মেয়েটিকে কি সে ধন্যবাদ জানাবে যে নিজে ম'রে গিয়ে মাঝেমাঝে রাশেদকে সে বাঁচিয়ে

ভুলছে? কাল ভোরে ভদ্রলোককে খুব প্রফুল্ল দেখাবে, কাজের মেয়েটির চিৎকারের রাতের পর দিন ভদ্রলোক খুব প্রফুল্ল থাকেন, দাড়িটা ধারালো ক'রে ছাঁটেন, ওই দিন তার স্ত্রীকে একবারও বারান্দায় দেখা যায় না। গাড়িতে বাইরে যাওয়া আর আসা, আর সম্ভবত ভ্রমণকাহিনী লেখা ছাড়া মহিলার কোনো কাজ নেই, আল্লা তাঁকে ঠিক পায়ের নিচেই রেখেছে, কিন্তু আগামী কাল তিনি বেরোবেন না, তার মক্কা থেকে আনা ঘোমটাটা দেখা যাবে না। কাজের মেয়েটিকে বারান্দায় দেখা যাবে দু-একবার, তার মুখটা বিষণ্ন দেখাবে ভরাটও দেখাবে। শুকুরজানকে আর দেখা গেলো না কেনো? অনেক বছর ধ'রেই রাশেদের অন্তত আরেকবারের জন্যে দেখতে ইচ্ছে করে শুকুরজানকে, সেও কি রাতে একবারের জন্যে চিৎকার ক'রে উঠতো? না, শুকুরজান চিৎকার ক'রে ওঠার মতো ছিলো না। খাঁ-বাড়ির বান্দী শুকুরজান তাদের গ্রামের সবচেয়ে বিখ্যাত যুবতীই ছিলো, শরীরে রূপে শক্তিতে সাহসে; পথ দিয়ে যখন সে হাঁটতো পুরুষরা দূর থেকেই ভয় পেতে শুরু করতো। রাত্রির থেকেও মধুর ছিলো তার কালো রঙ, এমন কালো আর দেখে নি রাশেদ, শরীর ছিলো মূর্তির মতো, তার হাঁটার সময় মাটি কাঁপতো। শক্ত ক'রে পেঁচিয়ে কাপড় পরতো, দুধ দুটি খড়ের গাদার মতো উঁচু হয়ে থাকতো, মনে হতো মাঝখানে লুকিয়ে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না, হাঁটার সময় ভয়ংকরভাবে কাঁপতো, তার সামনের পুরুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে পরিমাপ করা যেতো ওই কম্পনের ভয়ংকরতা। কথা বলার সময় মেঘের কণ্ঠস্বর শোনা যেতো। দেড় মণ দু-মণের ধানের ছালা সে অনায়াসে টেনে এদিকে থেকে ওদিকে নিয়ে যেতো, চাকরদের মাথায় তুলে দিতো, প্রত্যেকটা চাকর তার মুখোমুখি কুকুরের মতো দাঁড়াতো; এমনকি খাঁ-বাড়ির পুরুষগুলোও তার সামনে কুকুর কুকুর ভাব করতো। তাদের গ্রামের পুরুষরা দিনে অন্তত একবার যদি দূর থেকেও শুকুরজানকে দেখতে না পেতো, তাহলে বাজারে যেতে স্বস্তি পেতো না, ঘাস কাটতে গিয়ে বারবার হাতে কাচির পোচ লাগতো, যুবকরা খাঁ-বাড়ির পুকুরে গোশল করতে গিয়ে পা ঘষতো বগল ঘষতো মাথা ঘষতো, কিছুতেই গোশল শেষ করতে পারতো না। সেই শুকুরজানকে আর দেখা গেলো না। সে কি রাতে একবার চিৎকার ক'রে উঠেছিলো? না, শুকুরজান চিৎকার ক'রে ওঠার মতো মেয়ে ছিলো না। এই মেয়েটি আর কতো রাত চিৎকার ক'রে উঠবে?

৫ তালিমারা মানুষ, ফাটলধরা মানুষ

ঘর থেকে বেরিয়েই রাশেদের মনে পড়লো তার কোনো গন্তব্য নেই। কোনো প্রতীকী কথা নয়; এই মাটিতে এই জলে এই আগুনে আবার প্রতীক কী, সবই বাস্তব, সবই আগুনের মতো জ্বলছে, যা প্রতীকের থেকেও দুরূহ। সে যাবে কোথায়? যদিও তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যেখানেই যাওয়ার কথা

ভাবছে, সেখানেই আর যেতে ইচ্ছে করছে না। যে-রিকশাটিতে সে উঠে বসেছে, তার চালককে মনে হচ্ছে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাংক চালাতো, কিছুই মানছে না সে; মুখে দাড়ির বিস্তার দেখে বোঝা যাচ্ছে ইমানের জোরও তার প্রচণ্ড, মাঝেমাঝে নানা দোয়াও পড়ছে, দোয়া পড়ার সময় লোকটি চোখ বন্ধ করছে কিনা দেখতে পাচ্ছে না রাশেদ, কিন্তু ওই দোয়ায় রাশেদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আজকাল সব কিছুতেই দোয়া পড়তে হয়, দোয়া না পড়লে কিছুই ঠিক থাকে না, ঠিকমতো পাওয়া যায় না; যেমন মমতাজ অনেকগুলো দোয়া বের ক'রে ফেলেছে, বিদ্যুৎ চ'লে গেলে সে বিদ্যুতের দোয়া পড়ে, পানি না থাকলে পানির দোয়া পড়ে, টেলিভিশনের পর্দা হঠাৎ কালো হয়ে গেলে সে টেলিভিশনের দোয়া পড়ে। বিদ্যুৎ চ'লে গেলেই মৃদু চিৎকার করতে থাকে, আম্মু, বিদ্যুতের দোয়া পড়ো, আম্মু, বিদ্যুতের দোয়া পড়ো, এবং দোয়ায় বেশ কাজও হয়, মাঝেমাঝে দোয়া পড়ার সাথে সাথে বিদ্যুৎ চ'লে আসে। মমতাজ হয়তো গোপনে গোপনে কোনো নেয়ামুল কোরআন সংকলন করছে, বেরোনোর সাথে সাথে যা বেস্টসেলার হবে। রাশেদ মাঝেমাঝেই ভাবে মমতাজের কাছে থেকে সে কিছু জরুরি দোয়া শিখে নেবে, এখন ভাবছে মমতাজের কাছে থেকে সে যদি নিজের গন্তব্য জানার দোয়াটি শিখে নিতো, তাহলে এ-লোকটির ওপর নিজের গন্তব্যের ভার ছেড়ে দিতে হতো না। লোকটি নিশ্চয়ই স্পেন বিজয়ের সময় তারিকের দলে ছিলো, ওর নামে কোনো পাহাড়টাহাড়ের নাম আছে ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে রাশেদের।

লোকটি কি বুঝে ফেলেছে রাশেদের কোনো গন্তব্য নেই? নাকি সে দোয়া প'ড়ে রাশেদের গন্তব্য বের ক'রে ফেলেছে, তাই রাশেদকে জিজ্ঞেস না ক'রেই ছুটছে যেনো রাশেদ যাচ্ছে না যাচ্ছে সে-ই, আর সে-ই জানে রাশেদের কোথায় যাওয়া উচিত। একটা ট্রাককে এমনভাবে সে পাশ দিলো মনে হলো রিকশাটিকে আল্লা ট্রাকের চাকার নিচে থেকে নিজের হাতে টেনে রাস্তার পাশে সরিয়ে আনলো। নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনো শক্তি আছে লোকটির, লোকটিকে পেছন থেকে একটা সালাম দিয়ে রাখবে কি রাশেদ? কিন্তু লোকটিকে একটা গন্তব্য তো বলা দরকার, নইলে সে কোনো পাড়ার মুখে এনে যদি বলে, ভাইসাব, আল্লার রহমতে আইসা গ্যাছি, নামেন, তাহলে তো রাশেদ নামতে পারবে না, বলতেও পারবে না সে এখানে আসতে চায় নি। রাশেদ কয়েকবার লোকটিকে ডাকলো; লোকটি কারো ডাক শোনার জন্যে জন্ম নেয় নি, সে দোয়া প'ড়ে চলছে, গলায় তার শাইমুম চলছে, বালুঝড় এসে লাগছে রাশেদের চোখেমুখে। দোয়া শুনলে রাশেদের এমনিই ভয় লাগে, শরীর শিরশির করে, ফেরেশতাদের দৌড়াদৌড়ি দেখতে পায়, ছেলেবেলায় এক ফেরেশতাকে সে জড়িয়ে ধ'রেই ফেলেছিলো; এমন সময় ডান রাস্তা থেকে শাঁইশাঁই ক'রে একটা ট্রাক ছুটে এলো। রাশেদ একটা কালো ফেরেশতাকে দেখতে পেলো চোখের সামনে, এবং লাফিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাতে নামলো, সে যে লাফ দিয়েছে এটা বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো তারও; যখন বুঝলো সে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে তখন রাশেদ স্থির দাঁড়িয়ে দেখতে চাইলো

রিকশাটি ট্রাকের নিচে প্রজাপতির মতো পিশে গেছে; কিন্তু না, পথের সম্রাট ট্রাক বাঁ দিকের পথটিতে প্রচণ্ড পুলক জাগিয়ে ঢুকে পড়লো, আর রিকশাটি চ'লে গেলো সামনের দিকে। এটাকে এক অলৌকিক ঘটনা ব'লেই মনে হলো রাশেদের। রিকশাঅলা পেছনে ফিরে যখন তাকাবে বা রিকশাটাকে হাল্কা লাগবে, তখন কী ভাববে তার সম্পর্কে? ভাববে সে নিচে প'ড়ে ম'রে গেছে? ভেবে সে সুখ পাবে? রাশেদ সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো, সে আর রিকশা নেবে না, হেঁটেই যাবে, রিকশাটাকে পেলে পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে হাঁটবে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখলো রিকশাঅলা ফিরে আসছে, সেও খুঁজছে রাশেদকে, একটু ভয়ে ভয়েই রিকশাঅলা তাকাচ্ছে রাস্তার দু-দিকে। তাকে দেখে একটু লজ্জাই পেলো রাশেদ, হাত তুলে ডাকলো তাকে; কিন্তু রিকশাঅলা তাকে দেখেই ভয় পেলো, রিকশা থেকে অনেকটা প'ড়েই যাচ্ছিলো, রিকশাটি ঘোরাতে গিয়ে উল্টেই যাচ্ছিলো, তবে উল্টে না প'ড়ে বাতাসের বেগে সে সামনের দিকে ছুটে গেলো। রিকশাঅলা একবারও পেছনের দিকে তাকাচ্ছিলো না, যতো দ্রুত পারা যায় প্যাডেল মারছিলো; নিশ্চয়ই সে অনেকগুলো দোয়াও পড়ছিলো। রাশেদকে দেখে সে ভয় পেলো কেনো? রাশেদকে কি সে কোনো ভূত ভাবলো, না আওলিয়া ভাবলো?

প্রস্রাব ক'রে নেয়া দরকার একবার, যে-কোনো উত্তেজনার পর একবার প্রস্রাব করলে শান্তি পাওয়া যায়, উত্তেজনা তরল হয়ে বেরিয়ে যায়। দেয়ালের পাশে কোলাব্যাঙের মতো ব'সে একটি লোক বর্ষণ করার চেষ্টা করছে, ভালোভাবে পেরে উঠছে না, ট্রাউজার প'রে ব'সে এ-কাজটি করার থেকে ট্রাউজার ভিজিয়ে ফেলা অনেক সুখকর। লোকটি সব কিছু ক'রে চলছে স্বাভাবিকভাবে, যেনো নিজের বাড়িতেই বাঁশঝাড়ের পাশে ব'সে সে কাজটি করছে, দূরে কচুরিপানার ওপর দিয়ে একটা ডাহুকের দৌড়ও দেখছে, কিন্তু স্বাভাবিক হ'তে পারছে না ট্রাউজারের জন্যে। দুটি মেয়ে মুখ চেপে চ'লে গেলো, লোকটি একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো, কোনো অস্বস্তি বোধ করলো না, যেমন ডাহুক দেখে সে অস্বস্তি বোধ করে না। লোকটি হয়তো ট্রাউজারের নিচে কোঁচা দিয়ে লুঙ্গিও পরেছে, পেছন দিকটা বেশ ফুলে আছে। লোকটি কাজ শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু লোকটি এখানেই শেষ করতে রাজি নয়, আরো আনুষ্ঠানিকতা আছে তার, রাস্তাটা তার নিজেরই বাড়ির বাঁশঝাড়,-পকেট থেকে সে একটা কী যেনো বের করলো, মাটির ঢিল হয়তো, রাশেদের মনে পড়লো মওলানা সাব একবার তাদের কুলুপ নেয়া শিখিয়েছিলেন, কীভাবে মাটির ঢিল ছিদ্রের মুখে চেপে ধ'রে চল্লিশ কদম হাঁটতে হয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আর তারা মওলানা সাবের শোলমাছটি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। লোকটি তার শোলমাছের মুখে আধার চেপে ধ'রে উত্তরে-দক্ষিণে দক্ষিণে-উত্তরে বাঁশঝাড়ের ভেতরে হাঁটতে লাগলো। এ-দৃশ্য মওলানা সাব দেখতে পেলে খুব শান্তি পেতেন। মওলানা সাব তাকে দেখতে পাচ্ছেন না, রিকশায় ব'সে একটি মেয়ে তার শোলমাছ দেখে আঁৎকে উঠলো, রাস্তার পশ্চিম

পাশে মিলিটারিরা প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেনো ওরা এখনি ট্রাক থেকে নেমে নিজেদের শোলমাছ ধ'রে মার্চ করতে শুরু করবে। রাশেদ শোলমাছকে আধার খাওয়াতে পারবে না, কোলাব্যাঙের মতো বসতে পারবে না; সে হাঁটতে থাকে, তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাবটিতেই যেতে হবে। ক্লাবে ঢুকেই সে প্রথমে টয়লেটে গেলো, টয়লেটটা ধর্মসম্মত, দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের জন্যে যেমন দুটি ইউরিনাল আছে তেমনি ধার্মিকদের জন্যেও ব্যবস্থা রয়েছে। কুলুপের জন্যে একস্তূপ মাটিও আছে একপাশে। টয়লেটে ঢুকেই রাশেদ দেখলো জিপ্পু খুব বিপদে রয়েছে। সে জানতো না জিপ্পু টয়লেটে ঢুকেছে, তাহলে রাশেদ দু-পা চেপে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতো। জিপ্পু, প্রাথমিক বিদ্যালয়টির উপাশ্চার্য, উপাচার্য নয় উপাশ্চার্য শব্দই তাকে মানায়, অত্যাশ্চার্য আরো মানানসই, চারফুট আটইঞ্চি, প্রস্রাব করতে এসে খুব বিপদে প'ড়ে গেছে। তার নলটি কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না ইউরিনালের; সে বোতাম খুলে ফেলেছে, নলও বের ক'রে ফেলেছে, ভেতর থেকে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড চাপ আসছে, কিন্তু সে কিছুতেই ইউরিনালের নাগাল পাচ্ছে না, তার নল ইউরিনালের নিচে প'ড়ে যাচ্ছে। সে কি তাহলে এতোদিন ইউরিনালের নিচেই কাজটি ক'রে এসেছে, সেজন্যেই কি টয়লেটের প্রান্ত ঘিরে মেঘের রুপোলি পাড়ের মতো সব সময়ই চিকচিক ক'রে একটা সরু ধারা বয়? পাশের ইউরিনালেই দাঁড়িয়েছে রাশেদ, তাই এখন সে ইউরিনালের নিচ দিয়েও নির্ঝর ছোটাতে পারছে না, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও নলটিকে ইউরিনালের নাগালে আনতে পারছে না। একবার নল বের হয়ে গেলে কী জঘন্য ঘটনা ঘটে তলপেটে রাশেদ তা জানে, জিপ্পু এখন সেই বিপদে রয়েছে, আল্লা যেনো আর কাউকে কখনো এমন বিপদে না ফেলে; একবার শিৎশিৎ ক'রে একপশলা বেরিয়ে জিপ্পুর হাত ভিজে গেলো, জিপ্পু দু-হাতে নল চেপে ধ'রে ডেকে উঠলো, ইব্রাহিম, ইব্রাহিম। ইব্রাহিম ছুটে আসতেই সে চিৎকার ক'রে উঠলো, এইখানকার ইট দুইটা গ্যালো কই? আগে দুটি ইট ছিলো ইউরিনালের নিচে, তার ওপর দাঁড়িয়ে জিপ্পু নিশ্চিন্তে কাজটি করতো, আজ টয়লেট ধোয়ার সময় ঝাঁড়ুদার সে-দুটি সরিয়ে ফেলেছে, আর তাতে প্রকাশ পেয়ে গেছে জিপ্পুর মহিমা। একজোড়া ইট ছাড়া যে-জিপ্পু ইউরিনালের নাগাল পায় না, সে আকাশ ছুঁয়েছে।

ক্লাবে ইউরিনালের থেকে আকর্ষণীয় উৎকৃষ্ট সম্পদ আর কী আছে? সেটা ব্যবহার করা হয়ে গেলে রাশেদ বেরিয়ে পড়ে। বেরোতেই গেইটের পাশে বিড়ি টানছিলো যে-রিকশাঅলাটি, সে বুঝে ফেলে রাশেদের কোনো গন্তব্য বা ভেতরে কোনো চাপ নেই; রাশেদ তার সাথে যে-কোনো জাহান্নামে যেতে পারে। সে ডাকতেই রাশেদ তার রিকশায় উঠে বসে। সে কোথায় যাবে? যে-কোনো নামই সে বলতে পারে, তবে কোনো নামই বলতে ইচ্ছে করছে না, হঠাৎ মুখ থেকে গুলিস্থান শব্দটি বেরিয়ে পড়ে। ওইখানে রাশেদ অনেক বছর যায় নি, কলেজে

পড়ার সময় বারবার গেছে, তাই এখনো রিকশায় উঠলেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায় গুলিস্থান, এখনো সেভাবেই বেরিয়ে গেছে শব্দটি। গুলিস্থানে তার কোনো কাজ নেই, কোথাও তার কোনো কাজ নেই, কাজহীনতাই তার মুখে গুলিস্থান রূপে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। রাশেদ ভেবেছিলো রিকশাটি উড়তে শুরু করবে, কিন্তু খোঁড়াতে শুরু করে; মনে হয় রিকশাঅলা তার থেকেও গন্তব্যহীন, কোথাও যাওয়ার কোনো সাধ তার ভেতরে নেই, কোনোদিন ছিলোও না। তবু ভালো সে কোনো দোয়া প'ড়ে রাশেদকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে না। বাঁ পা দিয়ে প্যাডেল করার সময় তার মাজা একবার বাঁয়ে হেলে পড়ছে, হেলতে বেশ সময় নিচ্ছে, আবার ডান পা দিয়ে প্যাডেল করার সময় তার মাজা ডান দিকে হেলে পড়ছে, হেলতে বেশ সময় নিচ্ছে; তার মাজাটি এখনি খ'সে প'ড়ে রিকশার শেকলের সাথে জড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছে। প্যাডেল করার সময় সে তার লিঙ্গটি আস্তে আস্তে একবার বাঁ দিকে আরেকবার ডান দিকে ঘষছে আসনটির সাথে? তাই কি সে মাঝেমাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে? লোকটি কি বিয়ে করেছে, ক'রে থাকলে সে স্ত্রীর সঙ্গে কী করে, এমন প্রশ্ন জাগলো রাশেদের মনে, যেমন যে-কোনো নির্বোধকেই দেখলেই রাশেদের মনে প্রশ্নটি লাফিয়ে ওঠে। রাশেদ দেখেছে নির্বোধগুলো সেই কাজে বেশ অগ্রসর; একটা নির্বোধকে সে মাঝেমাঝে কিছু টাইপ করতে দেয়, ওটা একই ভুল করে বছরের পর বছর; একবার রাশেদ রেগে জিজ্ঞেস করেছিলো সে বিয়ে করেছে কিনা? নির্বোধটি জানায় সে পাঁচটি সন্তান এরই মাঝে স্ত্রীকে দিয়ে প্রসব করিয়েছে, রাশেদ চিৎকার ক'রে উঠতে চেয়েছিলো সে জন্ম দেয়ার রাস্তাটি কী ক'রে খুঁজে পায়? রাশেদ রিকশাঅলার কাছে জানতে চায় সে কটি বিয়ে করেছে। রিকশাঅলার কান দুটি খুব সজাগ, একবারেই রাশেদের কথা শুনে ফেলে; খ্যাখ্যা ক'রে হাসতে থাকে, কিছুটা লজ্জাও পায়, এবং জানায় যে তিনখান বিয়ে করেছে এ-পর্যন্ত। রাশেদ এমনই অনুমান করেছিলো, ওর মাজার অবস্থা দেখেই বোঝা যায় বউগুলো ওর মাজাটাকে শেষ ক'রে ফেলেছে। একটাকে বশে রাখার মতোও মাজার জোর ওর নেই; রিকশাটি যদি ওর বউ হতো, তাহলে অনেক আগেই লাথি মেরে ওকে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে ছালার ওপর কাত হয়ে শুয়ে ওর বাপদাদার আটাশ পুরুষ উদ্ধার করতো, আর কখনো ওকে চড়তে দিতো না। কিন্তু তিনখানা বউ দিয়ে ও কী করে? যা ইচ্ছে করুক, এখন মাজাটিকে একটু স্থির করুক, রিকশায় একটু গতি আনুক, রাশেদের মনে একটা গন্তব্যের বোধ জাগিয়ে দিক। রিকশাঅলা তুমি স্থির হও গন্তব্যে, আমাকেও গন্তব্য দাও, এমন প্রার্থনা করতে ইচ্ছে হলো তার। রাশেদের পাশ দিয়ে যারা চ'লে যাচ্ছে তাদের খুব হিংসা করছে রাশেদ, তাদের নিশ্চয়ই অনিবার্য গন্তব্য রয়েছে, তাই ছুটছে পাগলের মতো, না ছুটলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, হয়তো আর গন্তব্য খুঁজে পাবে না। কিন্তু রাশেদ ও তার রিকশাঅলার কোনো গন্তব্য নেই।

গন্তব্যের অভিমুখে প্রচণ্ডভাবে ছুটে আসছিলো তারা তিনজন; তাদের মোটর সাইকেলের চেহারা আর শব্দ জানিয়ে দিচ্ছিলো আর কারো গন্তব্য নেই, আছে শুধু তাদের। বিপরীত দিক থেকে তারা আসছিলো, হয়তো গুলিস্থানে গন্তব্য সম্পন্ন ক'রেই আসছিলো; তারা পাড়ার সম্রাট রাস্তার রাজা, যে-দিক ইচ্ছে সে-দিক দিয়ে ছুটতে পারে, ছুটছিলোও তাই; ছুটতে ছুটতে এসে রাশেদের রিকশাটাকে প্রায় ধাক্কাই দিচ্ছিলো। ধাক্কা অবশ্য লাগে নি, কিন্তু লাগার যে-উপক্রম হয়েছিলো তাতেই রিকশাঅলার মাজাখানি চৌচির হয়ে প'ড়ে যাচ্ছিলো; তবে তার মাজা নড়বড়ে হ'তে পারে, বুকটি নড়বড়ে নয়, সেটা সাহসের প্রকাণ্ড খনি। মোটর সাইকেলের সম্রাটরা যখন কিছুটা দূরে চ'লে গেছে, রিকশাঅলা পেছনের দিকে তাকিয়ে বীরের মতো ব'লে উঠলো, মস্তানি দ্যাহানের জায়গা পায় না। প্রকৃতি এক জায়গার ঘাটতি আরেক জায়গায় এভাবেই মিটিয়ে দেয়, মাজায় জোর না দিলে বুকে জোর দেয়। দেখা গেলো কথাটি বলার পর রিকশাঅলার মাজাটিও বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে, প্যাডেলও মারছে স্থিরভাবে; বুকে সাহস জাগলে অন্যান্য জায়গায়ও শক্তি দেখা দেয়। ভালোই লাগছিলো রাশেদের। সাধারণ মানুষের ভেতরে সাহস সুপ্ত হয়ে আছে, ওই সাহস মাঝেমাঝে প্রকাশ পেয়ে তাদের সুন্দর ক'রে তোলে, এমন একটা বিশ্বাস রয়েছে রাশেদের; রিকশাঅলাকে ওই বিশ্বাসের প্রতিমূর্তিরূপে চোখের সামনে দেখে যখন হর্ষ বোধ করছিলো রাশেদ, তখনি মোটর সাইকেলটি গোঁ গোঁ ক'রে রিকশাটির সামনে এসে দাঁড়ায়। তাহলে তারা রিকশাঅলার কথাটা শুনতে পেয়েছে। তারা বেয়াদবি সহ্য করে না। মোটর সাইকেল থেকে দুজন নামলো, নেমেই একজন রিকশাঅলার গালে একটা চড় মারলো। রিকশাঅলা ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়লো, অনেকক্ষণ নড়তে পারলো না, একবার উঠতে গিয়ে প'ড়ে গেলো। তখন আরেকজন তাকে বাঁ হাত দিয়ে টেনে তুলে আরেকটি চড় মারলো, রিকশাঅলা ঘুরতে ঘুরতে আবার কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়লো। এবার আর ওঠার চেষ্টা করলো না। রাশেদ রিকশায় ব'সে ব'সে দেখছে। একটা ভিড়ও জ'মে উঠেছে, রাক্ষসদের পাশে ওই ভিড়কে পোকার ভিড় মনে হচ্ছে। অত্যন্ত নিরীহ নিষ্পাপ তাদের চোখমুখ, তাতে কোনো অভিযোগ নেই, তবে চোখেমুখে রয়েছে পিষ্ট হওয়ার ভয়। রিকশাঅলা গোঙাচ্ছে, কেউ তাকে ধ'রে তুলছে না; তবে আবার টেনে তুললো প্রথম মাস্তানটি, তুলেই আরেকটি চড় মারলো। রিকশাঅলা নিচে চিৎ হয়ে প'ড়ে রইলো। ভিড়টা আরো বেড়েছে, চারদিকে পোকাগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রাশেদও রিকশায় ব'সে আছে পোকার মতো; গোলের ভেতরে তিনটি সিংহ, তাদের পায়ের নিচে একটা আধমরা মেষ। সিংহরা এখন চ'লে যাবে, তাদের শিকার সম্পন্ন হয়ে গেছে। কেউ কিছু বলছে না, রাশেদও না। ভিড়ের ভেতর থেকে একটি লোক রাশেদকে সালাম দিলো, সালামটি আশ্চর্যভাবে কাজ করলো রাশেদের ভেতরে; সে নিজেও পোকা হয়ে ব'সে ছিলো, সিংহদের দেখছিলো, সালামটি তাকে পোকা থেকে মানুষে পরিণত করলো। লোকটি চিৎকার ক'রে রাশেদের পরিচয়টা বারবার জানাতে

লাগলো, আর রাশেদও পোকা থেকে মানুষ আর মানুষ থেকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হ'তে লাগলো। ভিড়টা আরো বড়ো হয়ে উঠেছে, আরো জমাট বেঁধেছে, এবং রাশেদের পরিচয়টা জেনে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সিংহরা এবার চ'লে যাবে সিংহরা, তারা মোটর সাইকেলে উঠতে যাচ্ছে। রাশেদ তাদের ডাক দিলো, শুনুন। শুধু তারা তিনজনই নয়, পুরো ভিড়টাই চমকে উঠলো রাশেদের গলা শুনে, যেনো একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেছে। যে-দু মস্তান রিকশাঅলাকে চড় মেরেছে, ডাক শুনে তারা থমকে দাঁড়ালো। রাশেদ বললো, আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে আপনারা অপরাধ করেছেন? ভিড়ের কয়েকজন চিৎকার ক'রে উঠলো, হ্যাঁ, এরা অপরাধ করেছে। পুরো ভিড়টাই এবার চিৎকার ক'রে উঠলো, হ্যাঁ, এরা অপরাধ করেছে। মাস্তান দুটি কিছু বলছে না, রাশেদ আবার বললো, আপনারা কি বুঝতে পারছেন আপনারা অপরাধ করেছেন? তারা চারদিকে তাকিয়ে স্বীকার করলো যে তারা অপরাধ করেছে। রাশেদ বললো, এর জন্যে আপনাদের শাস্তি প্রাপ্য। ভিড় থেকে চিৎকার উঠলো, এদের শাস্তি দেন। রাশেদ বললো, আপনাদের শাস্তি হচ্ছে রিকশাঅলা আপনাদের গালে দুটি ক'রে চড় মারবে। শুনে কেঁপে উঠলো সবাই, সিংহরাও কেঁপে উঠলো। ভিড়ের চোখগুলো চিকচিক করছে, রিকশাঅলা মাস্তানদের চড় মারছে, এটা তারা দেখতে চায়; কিন্তু দেখার সাহস নেই ওই চোখে, রিকশাঅলা সত্যিই যদি চড় মারে তাহলে তারা চোখ বুজে ফেলবে। এমন অলৌকিক দৃশ্য তারা সহ্য করতে পারবে না। রাশেদ বললো, তবে এ-শাস্তি আপনাদের দিচ্ছি না। আপনারা রিকশাঅলাকে তুলে তার কাছে মাফ চান। শাস্তিটা জানতে পেরে ভিড়ের চোখমুখগুলো স্বস্তি পেলো। সিংহ দুটি এবার টেনে তুললো রিকশাঅলাকে, দু-হাত ধ'রে মাফ চাইলো তার কাছে। সিংহরা পোকা হয়ে গেছে, রিকশাঅলার হাতের নিচে দুটি পোকার মতো ঝুলছে তারা। তারপর পোকার মতো তারা বেরিয়ে গেলো ভিড়ের ভেতর থেকে, মোটর সাইকেলটিকেও একটা পোকার মতো দেখাতে লাগলো।

রাশেদকে তো গুলিস্থানে যেতে হবে, একটি গন্তব্য সে পেয়েছিলো, সে-গন্তব্য যতোই নিরর্থক হোক তবুও সেটাকেও কি সে হারিয়ে ফেলবে? রিকশাঅলা এবার বেশ চালাচ্ছে, তার মাজা কাঁপছে না, হেলছে না, রিকশাটাকেও বেশ সুখী মনে হচ্ছে। রাশেদ গুলিস্থানের দক্ষিণে একটি চৌরাস্তায় নামলো। নামতেই রিকশাঅলা তার পা জড়িয়ে ধরলো। রিকশাঅলা যদি জড়িয়ে ধ'রে তাকে চুমো খেতো, তাহলেও এতো অস্বস্তি লাগতো না, সেও না হয় একটা চুমো খেতো রিকশাঅলার গালে; তাতে অন্যরা অস্বস্তি বোধ করতো হয়তো, কিন্তু রাশেদের এতোটা অস্বস্তি লাগতো না। রিকশাঅলা এখনো ঘোরের মধ্যে রয়েছে, মাস্তানরা যে তার কাছে মাফ চাইতে পারে এটা সে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করছে না; তাই রাশেদের পায়ের ধুলো তার দরকার। সে কিছুতেই ছাড়া নেবে না। তার জীবন ভ'রে উঠেছে, জীবনে সে এতোটা মর্যাদা কখনো পায়

নি, সে এখন সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু রাশেদ এ-কোথায় এসে পড়েছে? রিকশাঅলাকে বিদায় দিয়ে সে একটা লম্বা দ্বীপের ওপর দাঁড়ালো। কেউ তাকে ভয় দেখাচ্ছে না, কেউ তার দিকে ছুরি লাঠি বন্দুক নিয়ে ছুটে আসছে না, কিন্তু সে ভয়ে আঁৎকে উঠলো, বন্য পশুর পাল নয়, মানুষ রাশেদকে ভীত ক'রে তুললো। রাশেদ না মানুষ ভালোবাসতো? উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে ময়লার স্রোতের মতো গড়িয়ে আসছে মানুষ, হামাগুঁড়ি দিয়ে আসছে মানুষ, ভেসে আসছে মানুষ, উঁবু হয়ে আসছে মানুষ, বাঁকা হয়ে আসছে মানুষ, কাঁৎ হয়ে আসছে মানুষ, রিকশায় চেপে আসছে মানুষ, বাসে গুঁজে আসছে মানুষ, ট্রাকের নিচে মাথা গলিয়ে আসছে মানুষ, ছাইমাখা মাছের মতো কাঁতরাতে কাঁতরাতে আসছে মানুষ, পশুর মতো আসছে মানুষ, শুধু মানুষের মতো আসছে না মানুষ। রাশেদ কি আগে মানুষ দেখে নি, এই প্রথম দেখলো মানুষ, এবং মানুষ দেখে ভয় পেয়ে গেলো? আসছে রঙচটা মানুষ, ফাটলধরা মানুষ, শ্যাওলাপড়া মানুষ, মচকানো মানুষ, পোকাধরা মানুষ, ভাঙা মানুষ, প'চে-যাওয়া মানুষ, ঝুললাগা মানুষ, চন্টাওঠা মানুষ, তালিমারা মানুষ, রোঁয়াওঠা মানুষ, ছ্যাঁতাপড়া, জংধরা মানুষ, ঘুনেখাওয়া মানুষ, উইলাগা মানুষ। রাশেদের কি ঘেন্না ধ'রে যাচ্ছে মানুষে? ঘেন্না ধরলে চলবে না, এটা ঘেন্নার দেশ নয়, ভালোবাসার দেশ, রাশেদকে ভালোবাসতে হবে। এখানে সবাই মানবপ্রেমিক, রাশেদকেও মানবপ্রেমিক হ'তে হবে। এজন্যেই রাজনীতিকদের রাশেদ এতো শ্রদ্ধা করে, যাদের একবার দেখেই রাশেদের ভয় আর গোপনে ঘেন্না লাগছে, তাদের জন্যে ভালোবাসায় ঘুম হয় না দরদী রাজনীতিকদের, তবে এখন একটু ঘুমোনোর সুযোগ পেয়েছে, মুক্তি পেয়েছে ভালোবাসার দায় থেকেও; ওই ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে ভাঁড়টি, সে এখন প্রচণ্ডভাবে মানুষ ভালোবেসে চলছে, ভালোবাসার তোড়ে ঘুমোতেও পারছে না। কোন কারখানায় এরা উৎপন্ন হয়? সব কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে বা ধ্বংসের মুখে ব'লে অনেক বছর ধ'রে শুনে আসছে রাশেদ, শুধু একটি কুটিরশিল্পই চলছে দিনরাত; রাশেদ তাঁতের খটখট শব্দ শুনতে শুরু করে, খটখট ক'রে তাঁত চলছে, চলছে তাঁত, খটখট খটাখট, মেয়েমানুষের ওপর পুরুষমানুষ, খটাখট খটখট, পুরুষমানুষের নিচে মেয়েমানুষ, খটাখট খটাখট, মেয়েমানুষের ওপর পুরুষমানুষ, উৎপন্ন হচ্ছে বাঙালি, বাঙলাদেশি, বাঙালি মুসলমান, মুসলমান বাঙালি, হিন্দু, বাঙালি হিন্দু, হিন্দু বাঙালি, বাঙলাদেশি হিন্দু। ভালোবাসতে হবে মানুষকে, ভালোবাসার ওপরে কিছু নেই।

এরা সবাই সঙ্গমের ফলে উৎপন্ন হয়েছে? এদের প্রত্যেককে আজ দুপুরে গুলিস্থানের চৌরাস্তায় আসার জন্যে সঙ্গম করতে হয়েছে একটি মেয়েমানুষ ও একটি পুরুষমানুষকে, পুরুষমানুষটি আর মেয়েমানুষটি চিৎ আর উপুড় না হ'লে তারা এখানে আজ আসতো না? সঙ্গম ছাড়া এদের কেউ উৎপন্ন হয় নি?-এমন প্রশ্ন ভয়ঙ্কর প্রত্যাদেশের মতো রাশেদের মনে জাগতেই সে শুধু ভয়ই পেলো না,

তার শরীর এবং ভেতরে কী একটা যেনো আছে, যেটাকে মনই বলতে চায় সে, দুটিই আঠালো আদিম তরল পদার্থের প্লাবনে চটচট করতে লাগলো। কোটি কোটি সঙ্গমের দৃশ্য তার চোখের সামনে; চটের ওপর, মেঝের ওপর, খাটের ওপর, গলির অন্ধকারে, একতলায়, বস্তির ভেতরে, কুঁড়েঘরে, দোতলায়, দালানে, তেতলায়, শনের ঘরে, ছেঁড়া পলিথিনের নিচে, ইস্টিশনে, ইটের পাঁজার ভেতরে শুধু নিরন্তর নগ্ন নোংরা সঙ্গম। মেয়েমানুষ পা ফাঁক ক'রে দিয়েছে, ফাঁক করতে চাইছে না, তবু ফাঁক করছে, পুরুষমানুষ প্রলম্বিত একটি প্রত্যঙ্গ ভেতরে ঢুকোতে চেষ্টা করছে, ঢুকোতে পারছে না, পিছলে অন্যদিকে চ'লে যাচ্ছে, ঢুকোচ্ছে বের ক'রে আনছে, পারছে না, পারছে, শিথিল হয়ে প'ড়ে যাচ্ছে। খুব ঘিনঘিনে লাগছে রাশেদের, বারবার তরল পদার্থ ছলকে প'ড়ে পাঁচতলা দালান ভাঙা বাস রিকশা দোকান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অভিনেত্রীদের বক্ষদেশ প্লাবিত ক'রে ফেলছে, সব কিছু চটচট করছে। কী সুখ পেয়েছিলো তারা? গড়িয়ে গড়িয়ে, রাশেদের সামনে, ভিক্ষে করছে পাঁচটি অন্ধ, রাশেদ ভেবেছিলো তাদের ছেঁড়া চাদরটার ওপর একটা টাকা ছুঁড়ে দেবে, এখন আর দিতে ইচ্ছে করছে না; যদি সঙ্গমের ফলে উৎপন্ন না হতো ওরা, তাহলে টাকাটা দিতো, পকেটে যা আছে সব দিয়ে দিতো। রাশেদ একটি মানুষ চায় যে সঙ্গমের ফলে উৎপন্ন হয় নি। এক মওলানা সাব, হয়তো নামের শুরুতে তার হজরত মওলানা শাহ সুফি রয়েছে, আতর কিনছেন, চোখে সুরমা পরেছেন, কালামকেতাব ছাড়া কিছু জানেন না মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে উৎপন্ন হ'লেই তাঁকে বেশি মানাতো, তিনিও ওই সঙ্গমের ফলেই উৎপন্ন, এবং তিনিও সঙ্গমযোগে উৎপাদন করেন? এমন এক পুণ্যবান ব্যক্তিকে উৎপাদন করার জন্যে ক-মিনিট সময় নিয়েছিলেন পিতা? দেড় মিনিটের বেশি নেন নি; তার মাতাকে ছালার ওপর ফেলে কয়েকবার জাঁতা দিয়েই হয়তো পয়দা করেছিলেন একটি পুণ্যবানকে, যার ফলে এখন গুলিস্থানের চৌরাস্তায় সুরমাপরে তিনি আতর কিনছেন। এই আতর গর্দানে মেখে মাগরেবের পর তিনি হয়তো একবার সোহবত করবেন। তিনটা বাস দুটি ট্রাক গোটা চারেক ঠেলাগাড়ি ঢুকে গেছে একটা আরেকটার ভেতরে, কুকুরকুকুরির মতো, খুলতে সময় লাগবে; নীল আর লাল রঙের ট্রাক দুটির ড্রাইভার দুটির মুখের ওপর তাদের জনকজননীর ধস্তাধস্তির ছাপটা স্পষ্ট লেগে আছে। রাশেদের ঘেন্না লাগছে, সে জানে ঘেন্না লাগলে চলবে না; কেউ ঘেন্না করে না এখানে, ঘেন্না করা পাপ, সবাই এখানে ভালোবাসে, রাশেদকেও ভালোবাসতে হবে। কিন্তু মানুষকে যে আর মানুষ মনে হচ্ছে না রাশেদের, মনে হচ্ছে অশ্লীল সঙ্গম, তার শরীর ঘিনঘিন করতে থাকে; দৌড়োতে ইচ্ছে হচ্ছে তার, সে এমন কোথাও যেতে চায় যেখানে সঙ্গম নেই, কিন্তু সে দৌড়োতে পারছে না, তাকে হাঁটতে হচ্ছে। সে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে, আর দিকদিগন্ত থেকে উচ্ছ্রিত লালা এসে পড়তে থাকে তার শরীরে।

আমি কি মানুষ ভালোবাসি না তাহলে, ঘৃণা করি মানুষ, রাশেদ জিজ্ঞেস করে নিজেকে, অন্যরা কী ক'রে এতো ভালোবাসে মানুষ, যেমন ভালোবাসে রহমত আলি, যে মানুষকে ভালোবাসার ধর্মে দীক্ষা নিয়ে দল থেকে দলে যাচ্ছে, দল বদলাচ্ছে, ওপর থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে, এবং নিরন্তর মানুষ ভালোবেসে চলছে? যখন সে আওয়ামিতে ছিলো, তখন মানুষ ভালোবাসতো সে প্রচণ্ডভাবে, মানুষ বলতে তখন সে বুঝতো বাঙালি, আর কিছু বুঝতো না; পঁচাত্তরের পর সে দেখে আওয়ামিতে থেকে আর মানুষ ভালোবাসা সম্ভব হচ্ছে না, মানুষ ভালোবাসার জন্যে দল বদল দরকার, তখন সে দেখে জাতীয়তাবাদীতে থেকেই শুধু অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা সম্ভব মানুষ, যে-মানুষ ক্ষমতার উৎস, মানুষ বলতে তখন সে বোঝে শুধু বাঙলাদেশি, বাঙালি আর তার কাছে মানুষ নয়, বাঙালি ব'লে কোনো মানুষ নেই; এখন অবশ্য সে কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিচ্ছে মানুষ ভালোবাসা থেকে, বাধ্য হয়েই সে বিশ্রাম নিচ্ছে, ক্লান্তিতে নয়; কিন্তু ভালোবাসা তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না, বিশ্রাম নিতে পারছে না সে, মানুষকে ভালোবাসবে ব'লে এরইমাঝে সে সেনাপতিদের সাথে যোগাযোগ সম্পন্ন করেছে। প্রেমপ্রীতি-ভালোবাসা কখনো বিফলে যায় না, শতধারায় তা ফিরে আসে নিজের উৎসমুখে; রহমত আলির বাড়িতে তা বারবার ফিরে এসেছে সহস্রধারায়, ওর বনানীর বাড়িটা দেখলে তা কিছুটা আঁচ করা যায়। মাত্র একটি রহমত আলিই যে মানুষ ভালোবাসছে, তা নয়; কয়েক হাজার রহমত আলি আছে দেশে, যারা মানুষ ভালোবাসছে ব'লে মানুষ আজো আসতে পারছে গুলিস্থানের চৌরাস্তায়, ঢুকে যেতে পারছে একে অন্যের ভেতরে। কিন্তু রাশেদ মানুষ ভালোবাসতে পারছে না, রহমত আলির মতো জড়িয়ে ধরতে পারছে না মানুষ। রহমত আলি যদি আজ এখানে আসতো, তাহলে সে নিশ্চয়ই জড়িয়ে ধরতো ওই ভিখিরিগুলোকে, অন্ধ ভিখিরি ছেলেটাকে হয়তো কাঁধে তুলে আইস্ক্রিমই কিনে দিতো; কিন্তু রহমত আলি এখানে আসার সময় পায় না, আগে ভালোবাসার বক্তৃতা দিতে আসতো। কী ক'রে আসবে, এখন তাদের প্রেম ছিনতাই ক'রে নিয়ে গেছে জলপাইরঙপরা লোকগুলো, যাদের বুকে জেগেছে তীব্র ভালোবাসা, তারাও মানুষ ভালোবাসতে চায়, এবং তারা মানুষের জন্যে একটি নতুন নাম খুঁজছে, বাঙালি বা বাঙলাদেশির মতো নষ্ট নামে তারা মানুষকে ভালোবাসতে চায় না, একটি অনাঘ্রাত নাম তারা শিগগিরই বের ক'রে ফেলবে। রাশেদের নিজের প্রতিই মায়া হয়, সে যদি জড়িয়ে ধরতে পারতো ওই ট্রাকড্রাইভারটিকে, গাল ঘষতে পারতো ভিখিরিটার গালে, কোলে তুলে নিতে পারতো রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা অন্ধ শিশুটিকে, সেও সুখী হ'তে পারতো রহমত আলির মতো; তা সে পারছে না, নিজেকে তার ঘেন্না করা উচিত ব'লে মনে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে রাশেদ পবিত্রগৃহটির কাছাকাছি এসে যায়, তার শরীর কয়েকবার শিউরে ওঠে। ছেলেবেলা থেকেই পবিত্রগৃহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার শরীর শিরশির ছমছম করে; দূর থেকে পবিত্রগৃহ দেখলেই সে অনেকটা পথ ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু

পেরে ওঠে না। পবিত্রগৃহটির দিকে তাকালে রাশেদের দু-রকম অনুভূতি হয়, মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকালে তার ভয় লাগে, আর মাথা নিচু ক'রে সামনের দিকে তাকালে খুব আনন্দ হয়। রাশেদ দেখতে পায় চারদিকে হাজার হাজার মানুষ আনন্দে রয়েছে, তারাও মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকাচ্ছে না, হয়তো ভয় পাবে ব'লে; তাই তারা সামনের দিকে তাকিয়ে খুব আনন্দে রয়েছে।

পবিত্রগৃহটির চারপাশে যারা আছে, তাদের মুখে পবিত্রতা দেখার খুব সাধ হচ্ছে রাশেদের। সে পবিত্র কিছু দেখতে চায়, অনেক দিন পবিত্র কিছু দেখে নি সে, কিছুক্ষণ আগে ট্রাকড্রাইভারদের মুখে, অভিনেত্রীদের স্তনের খাঁজে এতো অপবিত্রতা দেখে এসেছে যে পবিত্র কিছু না দেখলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তার নিজের মুখটিকেও কি খুব পবিত্র দেখাচ্ছে? হয়তো দেখাচ্ছে না, সে অনেক পাপ করেছে, কিছুক্ষণ আগেই পবিত্র মানুষকে ঘৃণা ক'রে সে বুক অপবিত্র ক'রে ফেলেছে, তাই তার মুখ পবিত্র দেখাবে না ; কিন্তু অন্যদের মুখ পবিত্র দেখাবে না কেনো? রাশেদ যার মুখের দিকেই তাকাচ্ছে, তার মুখই খুব অপবিত্র মনে হচ্ছে, পাপের দাগ লেগে আছে মুখে মুখে, যদিও রাশেদ ঠিক করতে পারছে না কার মুখে লেগে আছে কোন পাপের দাগ। ওই দাগ কি মোছা যায় না? নাকি অনেক মোছার পরও এটুকু রয়ে গেছে? খুব বেচাকেনা চলছে, এ-কাজটিই সবাই করছে পবিত্রভাবে; রাশেদ হাঁটতে পারছে না, প্রত্যেক ঘর থেকে ডাক আসছে, রাশেদ সাড়া দিতে পারছে না ব'লে নিজেকে অপরাধী বোধ করছে। রাশেদকে নিশ্চয়ই খুব বোকা দেখাচ্ছে, প্রত্যেকে দোকানিই ভাবছে সে কিছু কিনবে, যদিও তার কিছু কেনার নেই; পারলে সে আজ সব দোকানের সব কিছু কিনে কোনো ভাগাড়ে সেগুলো জড়ো ক'রে আগুন ধরিয়ে দিতো। ওই আগুনের ভেতর থেকে হয়তো পবিত্রতা বেরিয়ে আসতো। রাশেদ যা কিছুর দিকে তাকাচ্ছে, তাই মনে হচ্ছে অবৈধ, প্রতিটি পণ্যকে মনে হচ্ছে পাপ। পাপ পণ্য হয়ে দোকানে দোকানে জ্বলছে। ওপরেই পবিত্রগৃহ, রাশেদ দাঁড়িয়ে আছে পবিত্রগৃহের তলদেশে, পবিত্রগৃহের তলদেশে এসব কী? একটা টেলিভিশন-ভিসিআরের দোকানের সামনে দাঁড়ালো রাশেদ, দাঁড়াতে বাধ্য হলো, রঙ আর সুরের উন্মাদনা তাকে ঘা মেরে থামিয়ে দিয়েছে; ওপরেই পবিত্রগৃহ, একটি বোম্বায়ি নায়িকা পর্দায় মাংসের রঙিন উৎসব শুরু ক'রে দিয়েছে, ওপরেই পবিত্রগৃহ, তার শত শত স্তন দুলছে, শত শত উরু দুলছে, শত শত নিতম্ব দুলছে, বাহু দুলছে, কাম দুলছে, বিশ্ব দুলছে, পবিত্রগৃহ দুলছে। রাশেদ আর দাঁড়াতে পারছে না, সে পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগলো, বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, কাম থেকে, ক্ষুধা থেকে, পণ্য থেকে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে। সে বেরোবে উত্তরের পথটিতে; উত্তরের পথের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলো পথটি বন্ধ। রাশেদ ভয় পেয়ে গেলো। রাস্তার পুব দিকে মঞ্চ, সেখান থেকে ওয়াজ ক'রে চলছে একজন, হাজার হাজার টুপি আর পাঞ্জাবি আর মাথায় শাদা চাদর জড়ানো মানুষ তা শুনছে, চিৎকার ক'রে উঠছে।

ধার্মিকদের মাঝে রাশেদকে মানাচ্ছে না, তার মাথায় চাদর নেই টুপি নেই। ধার্মিকদের অনেকের হাতে লাঠি। দেশ থেকে সামরিক আইন উঠে গেছে হয়তো। না, এটা রাজনীতিক সভা নয়, এটা ইসলামি জলসা; কিন্তু যে-ওয়াজ ক'রে চলছে, সে ধর্ম আর রাজনীতির সীমা মানছে না, ধর্মের সীমার বাইরে আর রাজনীতির সীমার মধ্যেই থাকতে পছন্দ করছে। দেশ থেকে কাফেরদের বিনাশ ক'রে ফেলতে হবে, সে বলছে, মুরতাদদের গলা কাটতে হবে, সে ঘোষণা ক'রে চলছে। সবাই আল্লাহু আকবর, নারায়ে তকবির ব'লে শ্লোগান দিচ্ছে। সে বলছে, বাঙলাদেশ আমরা মানি না, একাত্তরে আমরা ভুল করি নাই, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যারা বলব তাগ গলা কাটতে হইব। সমাজতন্ত্রের কথা যারা বলব, তাগ গলা কাটতে হইব। গণতন্ত্রের কথা যারা বলব, তাগ গলা কাটতে হইব। আমরা চাই ইসলামি শাসন। নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর। মঞ্চে তার মতো আরো জনদশেক ব'সে আছে, তারা হয়তো একই ঘোষণা দিয়েছে এবং দেবে, তাদের কারো মুখেও কোনো পবিত্রতা নেই। কোনোদিন সম্ভবত ছিলো না। একটু আগে দোকানে দোকানে যাদের দেখে এসেছে রাশেদ, এখন তাদের মুখগুলোকে অনেক পবিত্র মনে হ'তে লাগলো তার; এ-মুখগুলোতে দেখতে পেলো রক্তের দাগ। ঠোঁটে রক্ত জিভে রক্ত দাঁতে রক্ত হাতে রক্ত। আরেকজন ওয়াজ করছে এখন; সে বলছে, সামরিক আইনকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। ইসলামের স্যাবা করলে আমরা তাদের সাথে সব সময়ই থাকব। দ্যাশে আমরা কোনো কাফের আর মুরতাদ রাখব না। যতোই শুনছে রাশেদ ততোই ভয় পাচ্ছে; একাত্তরে সে একসাথে এতো রাজাকার দেখে নি, রাজাকারদের এতো সাহসের সাথে ওয়াজ করতে দেখে নি। সামরিক আইনের সাথে চুক্তি ক'রেই ওরা নিশ্চয়ই জলসা করছে, পয়সাটা সেখান থেকেই এসেছে হয়তো, তবে পয়সার অভাব ওদের নেই, মরুভূমি থেকে পাইপের ভেতর দিয়ে গলগল ক'রে ওদের দিকে পয়সা আসছে। একদিন ওরা দেশ দখল করবে। দেশে তখন মানুষ থাকবে না। দেশে তখন লাশের ওপর লাশ থাকবে। রাশেদ থাকবে না, রাশেদের লাশ থাকবে।

রাশেদ ভয় পাচ্ছে, হয়তো এখন তাকেই মুরতাদ ঘোষণা ক'রে বসবে মঞ্চের মোষের মতো লোকটি, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না; তার হাত পা ছিঁড়েফেড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে ওরা। পশ্চিমেও যাওয়ার উপায় নেই, রাশেদ দক্ষিণে পা বাড়াতেই বোমা ফাটার শব্দ শুনতে পেলো। রাশেদ দৌড়ে একটি দোকানে ঢুকলো, দোকানদার তাকে ঢুকতে দিলো ব'লে কৃতজ্ঞ বোধ করলো রাশেদ। ঢুকলো আরো অনেকে। দোকানের দরোজা বন্ধ ক'রে দেয়া হলো, ঝপঝপ ক'রে দরোজা বন্ধ করার আওয়াজ উঠতে লাগলো। একের পর এক বোমা ফাটছে, আল্লাহু আকবর নারায়ে তকবির উঠছে, অসংখ্য লাঠির শব্দ উঠছে। একটি মুরতাদকে তারা ধ'রে ফেলেছে, চিৎকার শোনা যাচ্ছে মুরতাদ মুরতাদ, আল্লাহু আকবর ব'লে তারা মুরতাদের চোখ তুলে ফেলছে, হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলছে, পা

ছিঁড়ে ফেলছে; মঞ্চ থেকে ঘোষণা হচ্ছে মুরতাদদের অফিসে আগুন লাগান। রাশেদ দেখতে পাচ্ছে না, হাজার হাজার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, বোমার শব্দ শুনতে পাচ্ছে, এরই মাঝে হয়তো মুরতাদদের পার্টির অফিস দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। হাজার হাজার বন্য পশুর পায়ের শব্দে আর হুঙ্কারে কেঁপে উঠছে চারদিক; ওই পশুদের চোখ নেই, ওই পশুদের পূর্বপুরুষদের চোখ ছিলো না ওই পশুদের উত্তরপুরুষদেরও চোখ থাকবে না, ওরা মানুষ ছিঁড়েফেড়ে খাবে। যখন হুঙ্কার ক'মে গেছে, মুরতাদ মুরতাদ আর আল্লাহু আকবর শোনা যাচ্ছে না, তখন শোনা গেলো কয়েকটি গুলির শব্দ, রাশেদ বুঝতে পারলো ওদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, পুলিশ এসেছে। এখন দোকান খোলা ঠিক হবে না, দোকানি জানালো, পুলিশ এখন দায়িত্ব পালন করবে; কিছু লোককে পেটাবে, দোকান খোলা দেখলে দোকানে ঢুকে পেটাবে, জিনিশপত্র ভাঙবে, কয়েকজনকে ধরবে। আধঘন্টা পর দোকান খুললে রাশেদ বেরোলো, আবার সে উত্তর দিকেই এগোলো, সে দেখে যেতে চায় পশুরা কীভাবে কাজ করে। দোকানের পর দোকান ভাঙা, ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে দিকে দিকে, যেনো বর্বররা কিছুক্ষণ আগে এ-পথ দিয়ে চ'লে গেছে, রাস্তার একপাশে গড়িয়ে যাওয়া রক্ত কালো হয়ে আছে। কারো ছেঁড়া হাত কি প'ড়ে আছে, প'ড়ে কি আছে কারো ছেঁড়া পা, মুণ্ডু? ওসব নেই, হয়তো ঘরে নিয়ে গেছে তারা। রাস্তার উত্তর পাশে কাফেরদের অফিসটির দক্ষিণ দিকটা ঝলসে গেছে, ভেতরে পুড়ছে কাগজপত্র চেয়ারটেবিল, ধুঁয়ো উঠছে, দেয়াল ভেঙে প'ড়ে আছে। রাশেদ পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগলো। ওই দিকে পুলিশের ট্রাক, দূরে জলপাইরঙের ট্রাক, পথে এলোমেলো মানুষ। হঠাৎ একটু বাতাস এলো, বাতাস জানে না আধঘন্টা আগের খবর, বাতাস খেলতে শুরু করলো পোড়া আর ছেঁড়া কাগজ নিয়ে। রাশেদ হাঁটছে, হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে যেতে হবে তাকে, আর তার আগে আগে উড়ে উড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে এক টুকরো পোড়া কাগজ, কাস্তেহাতুড়ির ছেঁড়াফাড়া একটি পোস্টার।

৬ জেনারেল উদ্দিন মোহাম্মদ

বড়ো ভাঁড়টি বেশ নায়ক হয়ে উঠছে, দিন দিন ঘটছে তার নানা রঙের বিকাশ, এভাবে চালাতে পারলে, পারবে ব'লেই মনে হচ্ছে, সে মহানায়ক হয়ে উঠবে কোনো এক ভোরবেলা। দশকে দশকে এখানে একেকটা উৎকট পরিহাস নায়ক হয়ে দেখা দেয়, এর আগেও একটিকে দেখেছে রাশেদ, তার আগেও দেখেছে একটিকে, তারও আগে একটিকে দেখেছে, বেঁচে থাকলে পরেও একটিকে দেখবে, তার পরেও একটিকে দেখবে। প্রথম একটা খুব জরুরি কাজ সে করেছে, ঠিকঠাক ক'রে নিয়েছে নিজের নামটা; মোহাম্মদ ছলিমউদ্দিন নাম মানায় না

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে, যে একটার পর একটা রাষ্ট্রপতি রাখতে পারে, যেগুলোর নাক ঘষতে পারে বুটের গোড়ালি দিয়ে, যে একটার পর একটা উপদেষ্টা রাখছে, যেগুলো করছে তার চাকরের কাজ, কোনোটিকে দিয়ে রাস্তা ঝাঁড়ু দেয়াচ্ছে কোনোটিকে দিয়ে মুজো ধোয়াচ্ছে কোনোটিকে দিয়ে পা টেপাচ্ছে; নিজের নামটা ভেঙে পেছনের দিকটা আগে এনে, আর ছলিমের বানান আধুনিক রীতিতে সংস্কার ক'রে সে হয়েছে জেনারেল উদ্দিন মোহাম্মদ সালিম। ভাঁড়টার প্রতিভায় রাশেদ মজা পাচ্ছে যেমন পাচ্ছে অনেকে, রাশেদ ভাবছে ওকে একটা পিএইচডি বা পিউবিক হেয়ার ড্রেসার উপাধি দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, হয়তো এ সম্পর্কে কোনো উপাশ্চার্য চিন্তাভাবনাও করছেন। উপাশ্চার্য শব্দটি চমৎকার, জিগ্নুদের বেশ মানায়। পত্রিকায় তার নতুন নাম ছাপা হচ্ছে বড়ো বড়ো অক্ষরে, আরো বড়ো অক্ষরে ছাপা হতো যদি কম্পিউটারগুলো আরো বড়ো অক্ষর প্রসব করতে পারতো; টেলিভিশনের বালিকাগুলো ওই নাম চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে ঠোঁট বাঁকা ক'রে ফেলছে, আধ বছরের মধ্যে তারা আর ওই ঠোঁট দিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো কাজকামই করতে পারবে না। ক্ষমতায় এসেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকেরা নিজেদের একটা পদোন্নতি দেয়, তাতে দেশের ও জনগণের মর্যাদা বাড়ে; উদ্দিন মোহাম্মদও নিজেকে দিয়েছে আরেকটি পদোন্নতি, আরেকটি তারা ঝুলিয়েছে উর্দিতে; বিশপঁচিশটি পদোন্নতি দিলেও কেউ আপত্তি করতো না, অতোগুলো পদোন্নতি দেয়ার সুযোগ নেই ব'লেই দেয় নি, আর একবারেই ফিল্ড মার্শাল হওয়া হাস্যকর হবে, তা সে নিজেও বুঝতে পারে। যত্নের সাথে সে গোঁফ ছাঁটছে, নতুন নাপিত রেখেছে গোঁফের জন্যে, ক'টি রেখেছে সে-ই জানে; আগে গোঁফে এতো ঝিলিমিলি ছিলো না, এখন খুব ঝিলিক দিচ্ছে, টেলিভিশন তা ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশ জুড়ে; মুখের এ-পাশ ও-পাশ ছড়িয়ে হাসার কৌশলও সে আয়ত্ত করছে। কখনো হাসছে প্রতিভাবানের মতো, কখনো মেধাবী ফার্স্ট বয়ের মতো, কখনো লাহোরি সিনেমার নায়কের মতো, শেষে বিধাতার মতো। সে লৌহমানব হ'তে চায় না, হ'তে চায় সম্ভবত হৃৎকম্প; তার উপদেষ্টা-দাসেরা গবেষণা ক'রে তাকে শিখিয়েছে লৌহমানবদের আর আবেদন নেই জনগণের কাছে, জনগণ অনেক লৌহমানব দেখেছে, বাঙলা ভাষায় লৌহমানব কথাটি ভালোও শোনায় না, জংধরা লোহা লোহা মনে হয়। শ্রেষ্ঠ আবেদন এখন যৌনাবেদনের, ওই আবেদন ছাড়া এখন কিছু কাটে না, ভিখিরি ভাতের থালা দেখে সাড়া না দিতে পারে, পিপাসার্ত জল দেখে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু যৌনাবেদনে সাড়া দেবে না এমন হ'তে পারে না; তাই হ'তে হবে তাকে মদনমোহন, মোহনমানব, হৃদয়বল্লভ, যাকে দেখে কাঁপবে ভিখিরি থেকে যুবতী। তার উপদেষ্টারা তাকে শিখিয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালির দুটি রোগ বাঙলা ভাষা ও কবিতা, সে যদি ও-দুটি দখল করতে পারে, তাহলে মধ্যবিত্তের মন সে সহজে দখল করতে পারবে। গুছিয়ে বাঙলা বলছে সে, যা দেশের নেতাগুলো কখনো পারে নি, পারবে ব'লেও মনে হয় না; কবিতাও লিখতে শুরু করেছে, তার কবিতা

ছাপা হচ্ছে দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায়;-কবিতা মুদ্রণে সে সৃষ্টি করেছে ইতিহাস। নানা উপলক্ষে সে কবিতা লিখে চলেছে, ঝড় হ'লে লিখছে ঝড়ের কবিতা, বন্যা হ'লে বন্যার, উমরা করতে গেলে উমরার কবিতা। এমন গুজবও রটছে যে তার কবিতাগুলো লিখে দেয়ার জন্যে সে পুষছে একদল দাসকবি, সংখ্যায় যারা নগণ্য নয়, যাদের সে বকশিশ দিচ্ছে নানা রকম। তার কবিতা সাড়া জাগিয়েছে, সমালোচকেরা সে-সব সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছেন; এক ছান্দসিক তার কবিতার ছন্দোবিশ্লেষ ক'রে দেখিয়েছেন ওই কবিতায় ছন্দের অভাবিত বিকাশ ঘটেছে, যা গত ষাট বছরে ঘটে নি। প্রবন্ধটির জন্যে ছান্দসিক বনানী গোরস্থানে বিনামূল্যে কবরের জমি পেয়েছেন।

একটি পুত্রও সে জন্ম দিয়েছে কয়েক মাসের মধ্যে, তার যন্ত্রটি শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। পুত্রটির জন্মদিনের ছবি পত্রিকাগুলো পাঁচস্তম্ভ জুড়ে ছেপেছে, তাতে যুবরাজকে চারপাঁচ মাসের মতো দেখাচ্ছে, একদিনের কিছুতেই মনে হচ্ছে না। এতে অস্বাভাবিক কী আছে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যদি জন্ম দেয়, তাহলে এমনই দেয়া উচিত; তবে লোকজন খুবই সন্দেহ করছে। জনগণের বিশ্বাস সে নপুংসক, আঁটকুড়ো, জন্ম দেয়ার শক্তি তার নেই, থাকলে অনেক আগেই জন্ম দিতো; এমন একটা জনশ্রুতিও রয়েছে যে তার স্ত্রীটির জরায়ু বিয়ের আগেই কেটে ফেলতে হয়েছিলো, যেহেতু তারা বিয়ের আগেই একটা দুর্ঘটনা বাঁধিয়েছিলো। সে অবশ্য দাবি করছে বাগদাদের এক পিরের দরগার গিলাফ জড়িয়ে কাজ করার ফলেই সে পিতা হ'তে পেরেছে। গিলাফটি টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, গিলাফটি গলায় জড়িয়ে সে এক মহফিলে ভাষণও দিয়েছে; ভবিষ্যতে সে ওই গিলাফ জড়িয়ে আবার কাজ করবে কিনা, তা জানায় নি; বাগদাদের পিরের দরগা থেকে যে-পাণ্ডা গিলাফ এনে দিয়েছে, যে দেখতে দোজখের প্রহরীর মতো, তাকে সে উপদেষ্টা রেখেছে। কেউ খলনায়ক মনে করছে না তাকে, নায়কই মনে করছে; কয়েক বছর আগে তার সানগ্লাসপরা পূর্বসূরীটি খুন হয়ে যাওয়ার পর জনগণ একটা নায়কের অভাবে খুব শূন্য শূন্য বোধ করছিলো, মনে মজা পাচ্ছিলো না, সিনেমার হোদলগুলোও জনগণকে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত করতে পারছিলো, এ-ভাঁড় তাদের সে-অভাব মিটিয়েছে; যেখানেই যাচ্ছে, যাচ্ছে সে সবখানেই, তাকে দেখার জন্যে পোকার মতো ভিড় হচ্ছে মানুষের, সে পোকাদের জড়িয়ে ধরছে, পোকারা ধন্য হচ্ছে, সে জয় ক'রে ফেলেছে পোকাদের মন। শুধু পোকাদের মন নয়, এমন চাঞ্চল্যকর সংবাদও ছড়িয়ে পড়ছে যে সে দেহও জয় ক'রে ফেলেছে কয়েকটি নারীর, যাদের মধ্যে কুমারী, সধবা ও বিধবা সব স্বাদের নারীই রয়েছে; তবে সে যে সধবাদের শরীরই বিশেষ পছন্দ করে, তাও রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। পুরুষগুলো বাঙলায় অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হ'তে হ'তে সেগুলোর আর কিছু বাকি নেই; নারীগুলোকেও নষ্ট করা দরকার, ভাঁড়টি সে-কাজ শুরু করেছে, নারীরাও আনন্দের সাথেই নষ্ট

হচ্ছে। তারা এতোদিন নষ্ট হওয়ার মতো সুযোগ পাচ্ছিলো না। একটা কালোবাজারিকে সে এসেই ধরেছে, বা লোকটিকে ধরবে ব'লেই তাকে কালোবাজারি নাম দিয়েছে, তার দোষ তার একটা রূপসী স্ত্রী রয়েছে। রূপসী স্ত্রীটি স্বামীকে ছাড়াতে গিয়ে উদ্দিন মোহাম্মদ সালিমের সাথে দেখা করেছে, দেখা করতে করতে সালিমের সাথে ঘুমোতে শুরু করেছে, ঘুমোতে ঘুমোতে স্বামীর কথা ভুলে গেছে; সে আর ছাড়া পাবে না। একটা আমলাকে সালিম তিনটি পদোন্নতি দিয়েছে যেহেতু তার একটা উপভোগ্য স্ত্রী রয়েছে; সালিম মাঝেমাঝে তার স্ত্রীকে নিয়ে শয্যাকক্ষে রাত্রি যাপন করছে, আমলাটি পরিচারিকাকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে বাইরের ঘরে। এক অনুষ্ঠানে লিলির দেখা হয়েছে উদ্দিন মোহাম্মদ সালিমের সাথে,-লিলি এখন টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছে, যে-অনুষ্ঠানের আগে একবার আজান বাজে, মাঝে সংবাদের নামে ওই দিন সালিম কী কী মহৎ কাজ করেছে, তা দেখানো হয়, শেষ হওয়ার আগে আরেকবার আজান বাজে, তাই কেউ তার অনুষ্ঠান দেখে না, তবু লিলি ঘন ঘন শাড়ি বদলিয়ে হিতোপদেশ দেয় জনগণকে; উদ্দিন মোহাম্মদ সালিম লিলিকে বলেছে লিলির অনুষ্ঠান দেখে সে মুগ্ধ, লিলির অনুষ্ঠান সে মিস করে না, নামাজ পড়ার আগে তার অনুষ্ঠান দেখে। লিলি সালিমকে আরো মুগ্ধ করার জন্যে ওই সন্ধ্যায়ই প্রস্তুত হয়ে পড়েছিলো, কিন্তু সালিম তাকে আর কোনো সংকেত দেয় নি ব'লে কয়েক রাত ধ'রে লিলি ঘুমোতে পারছে না, ঘুমোনোর জন্যে সে নিজেকে নিজেই তৃপ্ত ক'রে চলছে। লিলি রাশেদকে বলেছে, উদ্দিন মোহাম্মদ সালিম মারাত্মক সুপুরুষ, টেলিভিশনে ঠিক বোঝা যায় না, কাছে গেলে বোঝা যায়। লিলি আরো একটু কাছে যেতে চেয়েছিলো, যেতে পারে নি; তবে সালিম যে সুপুরুষ সে-কথা বলার সময় লিলি থরথর ক'রে পুলক বোধ করছিলো। নিজে জিপ চালিয়ে উদ্দিন মোহাম্মদ সালিম শহর ভ'রে ঘুরছে, জিপ থামিয়ে চৌরাস্তায় বুক মেলাচ্ছে জনগণের সাথে, পোকারা পাগল হয়ে তার হাত ছুঁচ্ছে, তার সামনে পেছনে দৌড়োচ্ছে। জনগণকে সে খুলাফায়ে রাশেদিনের কালের স্বাদ দিচ্ছে সপ্তাহে দু-তিন দিন; জিপ চালিয়ে সরাসরি গিয়ে ঢুকেছে কোনো রিকশাঅলার বাড়িতে, তার কিডনি-নষ্ট শিশুটিকে এনে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছে হাসাপাতালে, টেলিভিশন সে-দৃশ্য দেখাচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে; হেলিকপ্টারে ক'রে গ্রাম থেকে নিয়ে আসছে কোনো অন্ধ বালিকাকে, হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিচ্ছে, তার অপারেশন হচ্ছে, চোখ মেলে সে প্রথম দেখছে উদ্দিন মোহাম্মদ সালিমের মুখ, সালিম তাকে জড়িয়ে ধরছে, টেলিভিশন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে ওই দৃশ্য। জনগণ কাতর হয়ে উঠছে, তাদের চোখে জল টলমল করছে। সাইকেল চালিয়ে সে অফিসে যাচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে পোকারা, টেলিভিশনে ওই সব অভিনব দৃশ্য দেখছে সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। পত্রিকাগুলো তার সামনের পেছনের ডানের বাঁয়ের ছবি ছাপছে, প্রথম পাতায়, পাঁচ কলাম জুড়ে; বৃহস্পতি, শুক্র,

শনিবারের গুজব পত্রিকাগুলোর প্রচ্ছদে প্রচ্ছদে ছাপা হচ্ছে সে। বাঙলাদেশে নতুন নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে।

সালিম শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে, পাজেরোতে, হেলিকপ্টারে ছুটে চলছে দেশের দিকে দিকে। সে বিশেষ ক'রে যাচ্ছে মসজিদগুলোতে। তার এক পূর্বসূরী বাঙালি মুসলমানকে আবার মুসলমান ক'রে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলো, খুন হয়ে যাওয়ায় ওই স্বপ্ন বাস্তবায়িত ক'রে যেতে পারে নি, উদ্দিন মোহাম্মদ সে-ভার তুলে নিয়েছে; সে একেক শুক্রবার হানা দিচ্ছে একেক মসজিদে। মসজিদগুলোতে লোকজন উপচে পড়ছে, দেশ জুড়ে নতুন নতুন মসজিদ উঠছে, হেলে-পড়া টিনের মসজিদগুলো হঠাৎ লাল ইটের মসজিদ হয়ে উঠছে; শুধু গরিবেরা নয়, টয়োটা পাজেরো ভ'রে শিল্পপতিরা, আমলারা, চোরাকারবারিরা আসছে মসজিদে। উদ্দিন মোহাম্মদ আগে থেকেই ঠিক করে সে কোন শুক্রবার যাবে কোন মসজিদে, তার গোয়েন্দারা সাত দিন আগে থেকে ঘিরে ফেলে মসজিদটি, চারপাশের ছাদের ওপর উঠে পাহারা দিতে থাকে; কিন্তু শুক্রবারে সে এমনভাবে গিয়ে উপস্থিত হয় যেনো সে হঠাৎ এসেছে। নামাজের পর সে বক্তৃতা দেয়, তার দামি সিল্কের পাঞ্জাবি আর টুপি ঝলঝল করতে থাকে টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে, বক্তৃতা দেয়ার সময় সে পুণ্যবানের মতো গ'লে পড়তে থাকে, সে আল্লা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। বক্তৃতার শুরুতেই সে বলে গতরাতে সে স্বপ্ন দেখেছে এক আওলিয়া দরবেশ তাকে বলছেন তুমি এই মিসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ো। তাই সে ছুটে এসেছে এই মসজিদে। কেঁদে কেঁদে সে জানায় এই মসজিদে নামাজ প'ড়ে তার বুক শান্তিতে ভ'রে গেছে, সে কিছু চায় না, ক্ষমতা চায় না, চায় মুসলমান আর ইসলামের ভালো। সে শুধু একটু খাঁটি মুসলমান হ'তে চায়। আরেক শুক্রবার সে যায় আরেক মসজিদে, সাতদিন আগে থেকে যেটিকে ঘিরে ফেলে তার গোয়েন্দারা। নামাজের পর সে বক্তৃতায় বলে যে দশ বছর আগে সে স্বপ্ন দেখেছে এই মসজিদটিতে সে নামাজ পড়ছে, এতোদিনে তার মনের বাসনা পূর্ণ হলো; দশ বছর ধ'রে সে মনে মনে এই মসজিদটিতে নামাজ পড়ছে, আজ এখানে নামাজ পড়তে পেরে তার বুক শান্তিতে ভ'রে গেছে। সে কিছু চায় না, ক্ষমতা চায় না, চায় মুসলমান আর ইসলামের ভালো। সে শুধু একটু খাঁটি মুসলমান হ'তে চায়। টেলিভিশন তার আকুল বক্তৃতা প্রচার করছে দিনের পর দিন।

উদ্দিন মোহাম্মদ সেনাবাহিনীতে না গিয়ে যদি বায়োস্কোপে ঢুকতো, যদি নিজের নাম রাখতো সালিমকুমার বা ডালিমকুমার, তাহলে আরো সফল হ'তে পারতো। নামাজকেও সে অভিনয়ে পরিণত করেছে, সে ক্যামেরার মুখোমুখিই নামাজ পড়তে পছন্দ করে, কোনো পির হয়তো তাকে শিখিয়েছে যে ক্যামেরার মুখোমুখি নামাজ পড়লে আশিগুণ সোয়াব কামেল হয়। মসজিদে নামাজের অভিনয়ের পর সে হেলিকপ্টারে উড়ে যায় পিরের দরগায়। সময়টা হয়ে উঠেছে পিরদের দশক, দেশ ভণ্ডপিরে ছেয়ে যাচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় পিরদের দরগা উঠছে, খুনি আসামী ডাকাতরা পির হয়ে ব্যবসা খুলে বসছে, খুব লাভ হচ্ছে,

কালোবাজারিতেও এতোটা লাভ হয় না। অনেক পির অবশ্য পিরব্যবসায়েই সন্তুষ্ট থাকছে না, কালোবাজারিও করছে, শিল্পপতিও হচ্ছে। উদ্দিন মোহাম্মদ সালিম পিরদের বড়ো ভক্ত, সে উড়ে যাচ্ছে ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল পিরদের বাড়িতে। এক টাকা মূল্যে পিরদের লিখে দিচ্ছে শহরের বিঘে বিঘে জমি, পিররা তাকে দোয়া করছে, আর লাখে লাখে বাড়ছে পিরদের ভক্ত। প্রতিটি অফিসের বড়ো, মাঝারি, ছোটোকর্তারা পিরের মুরিদ, পিরের নাম না নিয়ে তারা কথা বলে না, এবং কথা বলতে বলতে পিরের নাম বলে। ঢাকা শহরের কোণে কোণে পিরের দরগা উঠছে; অফিসের কর্তাদের কেউ পুবকোণের মুরিদ, কেউ পশ্চিমকোণের মুরিদ, কেউ দক্ষিণ কোণের মুরিদ, কেউ উত্তর কোণের মুরিদ। উদ্দিন মোহাম্মদ যে-পিরের দরগায়ই একবার যাচ্ছে, সে-পিরেরই ব্যবসা জ'মে হয়ে উঠছে, সেনাপতিরা জিপ নিয়ে ভিড় করছে, আমলারা তার আস্তানা টয়োটায় ভ'রে ফেলছে, ব্যাংকের ব্যবস্থাপকেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাশ্চার্যরা, দারোগা পুলিশ কেরানিরা তার দরগায় গিয়ে লুটিয়ে প'ড়ে পিরের পায়ের ধুলো চাটছে। সবচেয়ে ভালো ব্যবসা করছে ফরিদপুরের পিরটা, উদ্দিন মোহাম্মদ তার দরগায় প্রত্যেক শুক্রবারেই যায়, টেলিভিশনে তার আস্তানা দেখানো হয় প্রতি শুক্রবার। ওই পির ঠিক ক'রে দিচ্ছে কে কোন পদ পাবে, পদোন্নতিগুলো স্থির হচ্ছে তারই আস্তানায়, তাই তার আস্তানার দিকে গাড়ি ছুটে চলছে দিনরাত। উদ্দিন মোহাম্মদ বুর্জোয়াগুলোর কোমর আর মেরুদণ্ড এমনভাবে ভেঙে দিচ্ছে যে তারা আর মাথা তুলতে পারছে না, পা দেখলেই তারা মাথা ঠেকাচ্ছে, মাথা তুলতে পারছে না; ওগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছিলো, কেউ কেউ প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলো, আমলা প্রকৌশলী চিকিৎসক আরো অনেক কিছু হয়েছিলো, বিলেত আমেরিকা গিয়েছিলো, স্যুটটাই পরেছিলো এবং এখনো পরছে, বড়ো বড়ো পদও দখল করেছিলো, এখনো দখল ক'রে আছে, আরো বড়ো পদ দখল করতে চায়, উদ্দিন মোহাম্মদ দেখিয়ে দিয়েছে ওগুলো ভেতরে ভেতরে নিরক্ষরই রয়ে গেছে, একটুও বুর্জোয়া হয় নি, অশিক্ষিত পিরের পায়ে ওগুলো চাষী আর মুদির থেকেও বেশি ভক্তিতে মাথা ঠেকাচ্ছে। পিরগুলোও বেশ ঝানু, ওদের বেশ শিক্ষা দিচ্ছে। উত্তরকোণের পিরটার মুরিদ হ'তে হ'লে তার থুতু খেতে হয় একগ্লাশ। পিরটা তার গদিতে ব'সে বাণী দিতে থাকে, যার সবটাই ছাইপাঁশ, তার পাশেই থাকে পানিভর একটা বড়ো গামলা, ওই গামলায় সে অনবরত ফেলতে থাকে থুতু ও কফ, তার পানের পিকের লাল ও থুতুকফের শাদাটে রঙ মিলে গামলার পানি ঘিনঘিনে থিকথিকে হয়ে ওঠে। যারা তার মুরিদ হ'তে চায় প্রথমে তাদের খেতে হয় ওই গামলার একগ্লাশ পানি। স্যুটটাইপরা মুরিদরা সারি বেঁধে ওই পানি খেয়ে মুরিদ হচ্ছে; তাদের চোখেমুখে কোনো ঘেন্নার ভাব নেই, ভক্তিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। পুবকোণের পিরটা তার পা দুটি ভিজিয়ে রাখে একটি গামলায়, মাঝেমাঝে উঠে গিয়ে খালি পায়ে সে ঘুরে আসে বাইরের নোংরা পায়খানা থেকে, গোয়ালে গিয়ে পা দিয়ে গোবর পরিষ্কার ক'রে আসে, আবার পা ভিজিয়ে রাখে

গামলায়। তার মুরিদ হ'তে হ'লে প্রথমে খেতে হয় ওই গামলার একগ্লাশ পানি। স্যুটটাইপরা আমলারা ব্যবস্থাপকেরা ওই পানি প্রাণভ'রে খাচ্ছে, তার মুরিদ হচ্ছে, পিরের পা দুটি তারা গামছা তোয়ালে দিয়ে মুছতে দিচ্ছে না, পিরের পা চেটে চেটে তারা মুছে ফেলছে। রাশেদ যেখানেই যাচ্ছে, সেখানেই দু-চারটি পিরের মুরিদ পাচ্ছে, পিরের বাড়ি আর মসজিদ ছাড়া যারা আর কোথাও যাচ্ছে না বছরখানেক ধ'রে।

উদ্দিন মোহাম্মদ আর শুধু প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নয়, সে এখন রাষ্ট্রপতি, অবসরপ্রাপ্ত যে-বিচারপতিটিকে সে রাষ্ট্রপতি রেখেছিলো, যেটা প্রাণপণে তার জুতো পরিষ্কার করছিলো, আরো অনেক দিন করার স্বপ্ন দেখছিলো, সেটিকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেটা স্বপ্নভঙ্গের দুঃখে রাতের পর রাত আত্মহত্যার কথা ভেবেছে, আত্মহত্যা করতে গিয়ে ভয় পেয়ে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা গেছে। উদ্দিন মোহাম্মদ সেটাকে জাতীয় কবরস্থানে কবর দিয়েছে, বাঙলার মাটি তার আরেক মহৎ সন্তানকে নিজের বুকের মধ্যে পেয়ে সুখী হয়েছে। উদ্দিন মোহাম্মদ সব কিছু গুছিয়ে আনছে; মসজিদ, পির, আর পোকাদের গুছিয়ে এনেছে, কিন্তু তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছে না, সে জানে ওগুলো কাজ দেবে, তবে বেশি কাজ দেবে না; টিকে থাকতে হ'লে শক্ত রাখতে হবে তার ভিত্তিটাকে, যা তার শক্তির উৎস, অনেক জেনারেল তৈরি করতে হবে, তাদের তৃপ্ত রাখতে হবে, তাদের সব কিছু দিতে হবে, এবং তাদের সব কিছু দিচ্ছেও, কিন্তু তাতেই চলবে না; সে টিকে থাকতে চায়, দেড়-দু-দশক ভোগ করতে চায় দেশটাকে, তার জন্যে কাজে লাগাতে হবে সেই শাশ্বত শয়তানগুলোকে, যেগুলো রাজনীতির নামে দালালি করে, যেগুলো নেতা নামে পরিচিত। উদ্দিন মোহাম্মদ শুরু থেকেই সেগুলোকে তার বুটের ভেতরে আনার চেষ্টা ক'রে আসছে, অনেকগুলোই তার বুটের ভেতরে এসে গেছে; তার আরো শয়তান দরকার, আরো শয়তান দরকার, আরো শয়তান দরকার, বাঙলাদেশের সমস্ত শয়তান তার দরকার। সুখের কথা বাঙলাদেশ অঢেল শয়তান জন্ম দিয়েছে, সে জানে শয়তান সে পাবে দলে দলে। দেশ দখল করার পরই সে কয়েকটি শয়তানকে ধরেছিলো, এসেই শয়তান ধরা সামরিক রীতি, তাদের মধ্যে বড়ো শয়তানগুলোকে সে ছেড়ে দিয়েছে, সেগুলো উদ্দিন মোহাম্মদের বন্দনা গাইছে দেশ জুড়ে, যেমন তারা গাইতো আগের প্রভুদের বন্দনা। তারা সভা করছে, সভায় বলে বেড়াচ্ছে উদ্দিন মোহাম্মদ দেশকে উদ্ধার করেছে, মহামান্য উদ্দিন মোহাম্মদ না এলে এতোদিনে দেশ ধ্বংস হয়ে যেতো, দেশের জন্যে উদ্দিন মোহাম্মদকে আরো বহু বছর দরকার। তারা উদ্দিন মোহাম্মদের নামের আগেপাছে লাগাচ্ছে বিশেষণের পর বিশেষণ, তাকে মহামানব আখ্যা দিচ্ছে, বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসে এমন মহামানব আর দেখা যায় নি ব'লে চিৎকার ক'রে চলছে, মহামান্য না ব'লে তার নাম উচ্চারণ করছে না। ভিড় বাড়ছে উদ্দিন মোহাম্মদের সচিবালয়ে, শয়তানরা তাকে ঘিরে ফেলছে; সে আরো দালাল চায়, আরো শয়তান চায়, সে যতো

শয়তান চাইছে দালাল চাইছে ভিড় হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তার পূর্বসূরীটি, যে খুন হয়ে গেছে, যার খুনের সাথে উদ্দিন মোহাম্মদ জড়িত ছিলো, হয়তো সে-ই ছিলো প্রধান পরিকল্পনাকারী, সে একটি রাজনীতিক দল তৈরি করেছিলো, গণতন্ত্রবাদী নাম রেখেছিলো, যা সে ভ'রে ফেলেছিলো অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতিতে, এবং দলে সে জড়ো করেছিলো কুখ্যাত রাজাকারদের, ও নকল সমাজতন্ত্রীদের। সে রাজনীতিবিদদের জন্যে রাজনীতি কঠিন ক'রে তুলেছিলো, আর সহজ ক'রে তুলেছিলো সুবিধাবাদীদের জন্যে। উদ্দিন মোহাম্মদ আসে ওই গণতন্ত্রবাদীদের উৎখাত ক'রে, ক্ষমতায় থাকতে হ'লে তাকে প্রথম নষ্ট করতে হবে ওই দলটিকেই।

গণতন্ত্রবাদীদের নষ্ট করছে উদ্দিন মোহাম্মদ, বা ওই দলের নষ্টরাই বেশি ব্যগ্র হয়ে পড়ছে আরো নষ্ট হওয়ার জন্যে, তারাই দলে দলে ঢুকে পড়ছে উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের ভেতরে। একপাল অবসরপ্রাপ্ত রয়েছে ওই দলে, রাজনীতিতে ঢোকার কথা ছিলো না তাদের, উদ্দিন মোহাম্মদের পূর্বসূরীটি তাদের নিয়ে এসে মন্ত্রী করেছিলো, সে রাজনীতি কঠিন ক'রে তুলতে চেয়েছিলো রাজনীতিকদের জন্যে, তারা আবার মন্ত্রী হ'তে চায়, মন্ত্রী হওয়া সুখকর; গাধা হ'লেও তারা বুঝতে পারছে গণতন্ত্রবাদী থেকে আর মন্ত্রী, এমনকি বাহরাইন বা কাতারে রাষ্ট্রদূতও হওয়া যাবে না। গণতন্ত্রবাদীতে আর থাকা চলে না, থাকতে হবে উদ্দিন মোহাম্মদে, এবং তারা উদ্দিন মোহাম্মদের হয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার একটি অবঃ উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের ভেতরে ঢুকলে শনিবার ঢুকছে তিনটা অবঃ। গণতন্ত্রবাদীদের জনক একপাল ব্যারিস্টার বা ছাগল ঢুকিয়েছিলো নিজের গোয়ালে ছাগল সব কিছু খায় জেনে; ছাগলরা বুঝতে পারছে গণতন্ত্রবাদী থেকে আর ঘাস মিলবে না কাঁঠালপাতা মিলবে না,-তারা পালে পালে উদ্দিন মোহাম্মদের গোয়ালে ঢুকছে। নকল সমাজতন্ত্রীতে দেশ ভ'রে উঠেছিলো, রাশিয়া আর চিনের কাছ থেকে যা পাচ্ছিলো তাতে পেট ভরছিলো না তাদের, বুঝতে পারছিলো জীবনে তারা কিছুই পাবে না, তাই দলে দলে যোগ দিয়েছিলো গণতন্ত্রবাদীতে। ঢুকে বুঝতে পেরেছিলো শ্রেণীসংগ্রামের থেকে শোষণ অনেক সুখকর, ক্ষমতা অত্যন্ত মনোহর; গণতন্ত্রবাদী থেকে আর ক্ষমতা সম্ভব নয় শোষণ সম্ভব নয়, তাই তারা দলে দলে এখন উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের ভেতরে ঢুকছে। বড়ো শয়তানগুলো তো ঢুকবেই, ছোকরাগুলোও ঝানু শয়তান হয়ে উঠেছে, তারাও যাচ্ছে উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের ভেতরে। রাশেদ একটা ছোকরাকে স্নেহ করতো, চমৎকার ছোকরা, বিদ্যালয়ের বারান্দা সে শ্লোগানে মাতিয়ে রাখতো, মূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে মার্ক্স মার্ক্স লেনিন লেনিন ক'রে শ্রোতাদের ক্ষেপিয়ে তুলতো, সেটাও উদ্দিন মোহাম্মদের বুটে ঢুকে গেছে। ছোকরাকে রাশেদ চিনতো না, চেনে এক ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্য দিয়ে। রাশেদ বিদ্যালয়ের চা খাওয়ার ঘরে ব'সে চা খাচ্ছিলো; এমন সময় পাঁচ ছটি ছোকরা দৌড়ে আশ্রয় নিতে আসে সেখানে, তাদের তাড়া ক'রে আসে আরো দশবারোটা, ছোকরাটা রাশেদের চেয়ারের নিচেই আশ্রয়

খুঁজছিলো। তিন চারটি হকিস্টিক এসে পিটিয়ে তার মাথা ভেঙে দেয়, সে প'ড়ে থাকে রাশেদের চেয়ারের পাশে, রক্তে মেঝে কালো হয়ে ওঠে। রাশেদ চিনতো না ছোকরাকে, ছোকরাকে টেনে তোলার মতো কেউ ছিলো না তখন চারপাশে। রাশেদ তাকে টেনে তোলে, মাথার রক্ত মুছে দেয়, ধরাধরি ক'রে হাসপাতালে পাঠায়। ছোকরা এখন উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের ভেতরে। গণতন্ত্রবাদীতে ঢুকেছিলো দলে দলে রাজাকার, তারা রাজার সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করে, তাই এখন তারা উদ্দিন মোহাম্মদের পায়ে। আওয়ামির অবস্থা খারাপ বহু বছর ধ'রেই, স্বাধীনতার পর তারা খুব স্বাধীনতা পেয়েছিলো, বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার ক্ষতি তারা পূরণ নিতে চেয়েছিলো দু-এক বছরেই, সাড়ে তিন বছরে সাড়ে তিন হাজার বছরের স্বাধীনতা ভোগ করার পর দেখতে পায় তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। আওয়ামি থেকে একদল ঢোকে গণতন্ত্রবাদীতে, তারা এক সময় বাঙালিতে বিশ্বাস করতো, গণতন্ত্রবাদীতে ঢুকে বাঙলাদেশিতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তারা গণতন্ত্রবাদী ছেড়ে ঢোকে উদ্দিন মোহাম্মদের বুটে, এবং এতোদিন যারা মাটি কামড়ে প'ড়ে ছিলো আওয়ামিতে, গণতন্ত্রবাদীতে ঢুকতে লজ্জা পাচ্ছিলো, তাদের অনেকে আর নীরস মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকতে চায় না, তাদের লজ্জাও কেটে গেছে, তারা ঢোকে উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের ভেতরে। উদ্দিন মোহাম্মদের বুটই বাঙলাদেশ।

উদ্দিন মোহাম্মদের স্ত্রীটিকে দেখলে ছেলেবেলার ডাইনিদের মনে পড়ে, মনে হয় রূপকথায় যে-ডাইনিদের কথা শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গেছি, কিন্তু চোখের সামনে যাদের কখনো দেখি নি, তাদের প্রধানটিকে দেখছি। সেও বেরিয়ে পড়েছে। রাশেদ প্রথম তাকে দেখতে পায় শুক্রবারের একটি গুজবকাগজের প্রচ্ছদে, দেখেই ডাইনি দেখার ভয়ে তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায়। সেও, উদ্দিন মোহাম্মদের মতো, ভর করছে দেশের ওপর, দেশটা যেমন উদ্দিন মোহাম্মদের দেশটা তারও; সেও দিকে দিকে যাচ্ছে, উদ্দিন মোহাম্মদের মতো তাকেও তিন ঘন্টা ধ'রে দেখানো হচ্ছে টেলিভিশনে, নতুন নতুন জামদানি প'রে সে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় ফিতে কাটছে, তার জন্যে একটা জামদানির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে, সে ভিত্তিপ্রস্তর বসাচ্ছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, তার ডাইনিস্বরে কান ছিঁড়েফেড়ে যাচ্ছে শ্রোতাদের, তবে তার পেছনেও পোকার অভাব হচ্ছে না, মেয়েমানুষ তাকে ঘিরে ফেলছে পুরুষমানুষ তাকে ঘিরে ফেলছে। সে দেশের প্রথম মহিলা, এমন মহিয়সী আগে দেখা যায় নি; পত্রিকায় উদ্দিন মোহাম্মদের সমান জায়গা জুড়ে থাকছে সে, অনেক সময় বেশি জায়গাই জুড়ছে, তিনস্তম্ভের নিচে তার ছবি ছাপা হচ্ছে না, কোনোদিন ছাপা হ'লে পরের দিন চারস্তম্ভে ছাপতে বাধ্য হচ্ছে পত্রিকাগুলো। আমলারা তাকে আম্মা বলছে, তার পা ছুঁয়ে দোয়া চাইছে, তার দোয়ায় পদোন্নতি পাচ্ছে। দেশের কল্যাণের জন্যে সে অতিবাহিত করছে ব্যস্ত সময়; সে নারীদের কল্যাণ দেখছে, শিশুদের কল্যাণ দেখছে, গরিবদের কল্যাণ দেখছে, মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, পত্রিকার প্রথম পাতা ও টেলিভিশন জুড়ে থাকছে। যা

কিছু বাইরের, তাই দেখাচ্ছে আর ছাপছে টেলিভিশন আর পত্রিকাগুলো, ভেতরের কিছু তারা দেখাচ্ছে না ছাপছে না, কিন্তু ভেতরের সত্যও বেরিয়ে পড়ছে। কোনো কিছুই চাপা থাকছে না, সবাই জেনে ফেলছে যে উদ্দিন মোহাম্মদ কোটি কোটি টাকা বানাচ্ছে, বিদেশে পাচার করছে, তাকে টাকা না দিয়ে দেশে কোনো কাজ হচ্ছে না, একটা রাস্তাও খোঁড়া হচ্ছে না; আর সে নারী ভোগ করছে, তার এক নারীকে সে রাখছে শহরের উত্তরে, আরেকটিকে পুবে, আরেকটিকে দক্ষিণে, কোনোটিকে রাখছে বিদেশে। উদ্দিন মোহাম্মদের স্ত্রীটিও তাই করছে, সেও টাকা বানাচ্ছে, তাকেও টাকা না দিয়ে বহু কাজ হচ্ছে না। আর সে যুবক পছন্দ করে, সে যুবক উপভোগ করছে, কয়েকটি যুবক তার সেবা করছে, বারবার সে যুবক বদল করছে। কয়েকটি যুবক তার সেবা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে নাকি একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে উদ্দিন মোহাম্মদের বিরুদ্ধে, তার অভ্যুত্থানের কাহিনীটি খুব জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। উদ্দিন মোহাম্মদ একদিন যখন জরিনা নামের এক উপস্ত্রীর সাথে লিপ্ত ছিলো, তখন সে সচিবালয়ে গিয়ে উদ্দিন মোহাম্মদকে নগ্ন অবস্থায় হাতেনাতে ধ'রে ফেলে, উদ্দিন মোহাম্মদের দিকে সে একটা ছাইদানি ছুঁড়ে মারে। উদ্দিন মোহাম্মদের নাকটি তাতে ভেঙে যায়, ফলে কয়েক দিনের জন্যে উদ্দিন মোহাম্মদ টেলিভিশনে নিজেকে দেখানো থেকে বিরত থাকে; ওই সময় তার স্ত্রীটি টেলিভিশনে প্রথম মহিলারূপে আবির্ভূত হয়। উদ্দিন মোহাম্মদ তার সাথে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হয়, তাকে নিজের ক্ষমতার এক অংশ আর যুবকসংসর্গের অধিকার দেয়।

দুটি পার্টিতে যাওয়ার ভাগ্য হয়েছে রাশেদের এর মাঝে; একই লোকের পার্টি, লোকটি ঘন ঘন পার্টি দিচ্ছে, মারাত্মক প্রগতিশীল ব'লে সে বিখ্যাত, রাশেদ গিয়ে দেখে বাড়িটা একটা ছোটোখাটো বাঙলাদেশ। সেখানে সব আছে, সিনেমার ৭টা অভিনেত্রী আছে, ১পাল আমলা আছে, ৫টা অবসরপ্রাপ্ত আছে, ২টি নেত্রী আছে, তাদের ঘিরে আছে তাদের গোটাদশেক গণতান্ত্রিক প্রহরী, এমনভাবে ঘিরে আছে নেত্রীদের যেনো তারা গণতন্ত্রের দেবীদের ঘিরে আছে, আছে উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের ভেতরের অধিবাসীরা। উত্তর দিকে এক নেত্রী, তাকে ঘিরে তার প্রহরীরা; দক্ষিণ দিকে আরেক নেত্রী, তাকে ঘিরে তার প্রহরীরা; সবচেয়ে উজ্জ্বল পশ্চিম দিকটা, যেখানে উদ্দিন মোহাম্মদের মন্ত্রীরা পান করছে, অন্যরা তাদের পান করার দৃশ্য দেখে দেখে মুগ্ধ হচ্ছে, শুধু স্যার, স্যার শোনা যাচ্ছে। ঝকঝক করছে উদ্দিন মোহাম্মদের মন্ত্রীরা। রাশেদ একপাশে ব'সে পান করছিলো ১টি কবি, ২টি ঔপন্যাসিক, ৩টি সাংবাদিক-প্রাবন্ধিকের সাথে, খুব বিখ্যাত তারা, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের জন্যে যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে। দেশে গণতন্ত্র নেই ব'লে তারা তৃপ্তির সাথে পান করতে পারছিলো না, চুমুকে চুমুকে গণতন্ত্র গণতন্ত্র শব্দ করছিলো, একজনের গণতন্ত্রের হিক্কা ওঠার ক্রম হচ্ছিলো; এমন সময় উদ্দিন মোহাম্মদের একটা মন্ত্রীকে নিয়ে পার্টিদাতা তাদের দিকে এগিয়ে আসে, সে তাদের মন্ত্রীটির সাথে পরিচয় করিয়ে ধন্য করতে চায়। রাশেদ দেখে একটা পাড়ার

মাস্তান, কয়েক দিন আগেও যে প্রকাশ্যে ছিনতাই করতো, যার নাম সে কিছুতেই মনে করতে পারছিলো না। ওই মাস্তানটা, যে উদ্দিন মোহাম্মদের মন্ত্রী, তাদের দিকে এগিয়ে আসতেই বিনয়ে গ'লে দাঁড়িয়ে পড়ে কবি আর ঔপন্যাসিক আর সাংবাদিক-প্রাবন্ধিকগুলো, একের পর এক হাত বাড়াতে থাকে, পারলে চার-পাঁচটি ক'রে হাত বাড়িয়ে দিতো তারা, নিজ নিজ নাম বলতে থাকে অষ্টম শ্রেণীর বালকদের মতো, দুজন উত্তেজনায় নিজেদের নাম বলতেও ভুল করে। মাস্তানটি মহাপুরুষের মতো মৃদু হাসে। রাশেদ ব'সেই ছিলো, ওই মাস্তানের দিকে হাত বাড়ানোর আর নিজের নাম বলার কোনো ইচ্ছে তার নেই। মাস্তানটি মহাপুরুষের মতো তারও দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, আশা করতে থাকে রাশেদ দাঁড়াবে; রাশেদ ব'সেই থাকে, তার হাতের দিকে অন্যরা তাকিয়ে আছে ব'লে এক সময় ব'সেই হাত বাড়ায়, এবং জিজ্ঞেস করে, এর কী নাম? পার্টিদাতা ও কবি ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিকগুলো বিচলিত হয়ে পড়ে, তারা চিৎকার ক'রে বলতে থাকে, উনি মাননীয় মন্ত্রী, উনি মাননীয় মন্ত্রী, উনি মাননীয় মন্ত্রী, এবং কী একটা নামও বলে। মাস্তানটি তখনো রাশেদের হাত ধ'রে রেখেছে, রাশেদ তাকে জিজ্ঞেস করে, বুটের ভেতর থাকতে কেমন লাগে? মাস্তানটা কেঁপে ওঠে, একবার হোঁচট খায়, এবং রাশেদের হাত ছেড়ে অভিনেত্রীদের দিকে এগিয়ে যায়।

রাশেদ ভেবেছিলো একটি নেত্রীর সাথে কথা বলবে, কী গণতন্ত্র সে একদিন আনবে সে-সম্পর্কে একটু জানবে, বাসায় গিয়ে একটু গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখবে, গণতন্ত্রের গালে একটু গাল ঘষবে; কিন্তু তাকে ঘিরে চক্রটা বেশ শক্ত, সেটা ভেঙে তার দিকে যাওয়া অসম্ভব। গণতন্ত্রের চক্রও বেশ শক্ত বঙ্গে। রাশেদ দূর থেকে বলে, আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। পাঁচটা প্রহরী রাশেদকে ঘিরে ধরে, পারলে তারা রাশেদের মুখ চেপে ধরতো; তাদের নেত্রীর সাথে এভাবে কথা বলতে নেই, খুব বিনয়ে তার পায়ের দিকে তাকিয়ে তার সাথে কথা বলতে হয়। রাশেদ ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারবে না। রাশেদ গণতন্ত্রের মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে, প্রহরীদের ভিড়ে সে ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের মুখ দেখতে পায় না, হয়তো গণতন্ত্রের মুখ নেই শুধু পা আছে। হাঁ হাঁ ক'রে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে রাশেদের, কিন্তু সে হাসে না, তাকে মাতাল ভাবতে পারে সবাই, পার্টিতে প্রত্যেকে অন্যকে মাতাল ভাবে, বা ভাবতে পারে সে গণতন্ত্রের অনুপযুক্ত, ভবিষ্যতে দেশ ভ'রে যে-গণতন্ত্র আসবে রাশেদ তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে না। রাশেদকে প্রস্তুত হ'তে হবে গণতন্ত্রের জন্যে, এখন থেকেই শুধু পায়ের দিকে তাকানোর অভ্যাস করতে হবে। কয়েক মাস পর আরেক পার্টিতে রাশেদ ওই নেত্রীকে দেখতে পায়, কিন্তু তখনো রাশেদের পায়ের দিকে তাকানোর অভ্যাস আয়ত্ত হয় নি, সে দূর থেকে নেত্রীর মুখের দিকেই তাকায়; সে আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে উত্তরকোণে, বেশ মলিন দেখাচ্ছে তাকে, তার গণতান্ত্রিক প্রহরীর সংখ্যা ক'মে গেছে, দু-তিনটিতে ঠেকেছে। যে-প্রহরীগুলো রাশেদকে সেবার কথা বলতে দেয় নি তার সাথে, তারা এবার নেত্রীর সাথে নেই, তবে

পার্টিতে আছে; তারা এখন আছে অন্য কোণে, একটা নতুন কোণ উজ্জ্বল ক'রে তারা পান করছে। তাদের তিনটা উদ্দিন মোহাম্মদের মন্ত্রী হয়েছে, উদ্দিন মোহাম্মদের বুটের মতোই ঝকঝক করছে তাদের মুখমণ্ডল।

রাশেদ একটা স্বপ্ন দেখেছে; এক রাতে ঘুমিয়েই স্বপ্নটি সে দেখেছিলো, তার পর থেকে জেগে জেগেই সে স্বপ্নটি দেখতে থাকে, মাঝেমাঝেই স্বপ্নটি তার মগজ ফেড়ে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটা উৎসবে গেছে রাশেদ, উৎসবটা হচ্ছে প্রাসাদের ভেতরে যেখানে তার যাওয়ার কথা নয়, কিন্তু সে যায় যেমন স্বপ্নে মানুষ যায়, প্রাসাদে ঢোকার আগে সে দেখতে পায় চারপাশে স্তূপ স্তূপ হাড় প'ড়ে আছে। অতো হাড় কোথা থেকে এলো সে বুঝতে পারে না, প্রাসাদের বাইরে হাড় প'ড়ে থাকাও তার কাছে অদ্ভুত লাগে। উৎসবে যারা এসেছে, তারা প'রে এসেছে তাদের শ্রেষ্ঠ স্যুট, পাজামা, শেরোয়ানি, সাফারি, উর্দি, শাড়ি; কিন্তু রাশেদ যার সাথেই হাত মেলাতে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে সে-ই তার দিকে একটা থাবা বাড়িয়ে দিচ্ছে, থাবার নখে রক্ত ঝলমল করছে; তাদের কারো মুখ সিংহের কারো মুখ বাঘের কারো মুখ শেয়াল কুকুর শুয়োরের। রাশেদ কোনো মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মানুষের মুখ দেখার জন্যে তার খুব পিপাসা জেগে উঠছে, যেনো হাজার বছর ধ'রে সে মানুষের মুখ দেখে নি। সে কি হাজার বছর ধ'রে প্রাসাদের ভেতরে উৎসবের ভেতরে রয়েছে? সিংহগুলো গম্ভীরভাবে হাঁটছে, বাঘগুলোও গম্ভীর; তারা মুখোশ প'রে আছে ব'লে মনে হচ্ছে, গম্ভীর না হ'লে মুখোশ খ'সে প'ড়ে যেতে পারে। কুকুরগুলো তাদের ঘিরে ঘিরে ঘুরছে, শেয়াল শুয়োরগুলো তাদের ঘিরে ঘিরে ঘুরছে; আরেক পাশে কারা যেনো খুঁজছে বাঘের মুখোশ সিংহের মুখোশ, কিন্তু সবগুলো মুখোশ পরা হয়ে গেছে, তারা মুখোশ পাচ্ছে না। হাড় জ'মে উঠছে প্রাসাদের দেয়ালের বাইরে, নখে রক্ত ঝলমল করছে। রাশেদ স্বপ্নটি মগজে বয়ে বয়ে জীর্ণ হয়ে পড়ছে, কাউকে বলতে পারছে না।

৭ রক্তমাংসের রহস্য

বিলু আপা তোমাকে মনে পড়ছে মেঘ উড়ছে দেখতে ইচ্ছে করছে কতোদিন তোমাকে দেখি না সরোবর দেখি না পদ্ম দেখি না তোমাকে দেখলে মাথা জুড়োতো এইসব দুঃস্বপ্ন ফুরোতো সামরিক আইন গণতন্ত্র দানব দেবী থাকতো না লাশ ফাঁস বদমাশ মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ রাজাকার গাঁজাকার সাজাকার দালাল আমলা কামলা আলবদর তালবাঁদর মন্ত্রী সান্ত্রী মাস্তান জেনারেল গেনারেল ভেনারেল থাকতো না বিলু আপা তুমি দক্ষিণ ঘরের পাশের পেয়ারাপাতার সুগন্ধ তুমি জোনাকিভরা লেবুঝোপের ঘ্রাণ তোমার মুখ মনে হ'লে আমি পেয়ারাপাতার গন্ধ পাই গোঁড়ালেবুর গন্ধ পাই তোমার মুখ মনে হ'লে দেখি ডালিম ফুল ফুটছে উঠোন লাল হয়ে যাচ্ছে দইকুলি বসছে ঘুমিয়ে পড়ছে আতার গন্ধ উঠছে আচ্ছন্ন

হয়ে পড়ছে দুপুরবেলা লাল মোরগের শিখা জ্বলছে কুয়াশা নামছে রোদ উঠছে বৃষ্টি হচ্ছে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে পশ্চিম পুকুরে কচুরিপানার ওপরে ডাহুক হাঁটছে। রাশেদ একটি বই পড়তে শুরু করেছিলো, অত্যন্ত জঘন্য বই, ওই বই পড়ার সময় এমন আবেগ ধাক্কা দেবে রাশেদ ভাবতে পারে নি; অবশ্য এমন বিষম ব্যাপার তার ঘটে কখনো, দশ বছরে একআধবার, একবার একটা বিদঘুটে লোকের জানাজায় দাঁড়িয়ে রাশেদের বারবার মনে পড়ছিলো একটি প্রেমের কবিতার পংক্তি, তার ভয় হচ্ছিলো সে হয়তো জোরে পংক্তিটি উচ্চারণ ক'রে ফেলবে। রাশেদ দেখতে পাচ্ছে বিলু আপা কাজ করছে, সে তো সারাদিনই কাজ করতো, তার কাজের শেষ ছিলো না, একটার পর একটা কাজ সৃষ্টি হয়ে উঠতো তার হাতে; বিলু আপার হাতে একটা কাজ শেষ হয়ে আসছে দেখে যখনই রাশেদ ভাবতো বিলু আপার হাতে আর কাজ নেই, তখনই অবাক হয়ে রাশেদ দেখতো আরেকটি কাজ সৃষ্টি হয়েছে তার হাতে। বিলু আপা পুকুর থেকে মাটির কলসি কাঁখে ক'রে পানি আনতো, কী সুন্দর বেঁকে গিয়ে হাঁটতো, একটার পর একটা কলসি সাজিয়ে রাখতো কাঠের চকে, ফিটকিরি দিতো, ওই পানি খেতে জিভ জড়িয়ে যেতো রাশেদের। বিলু আপা এতো ঝকঝক ক'রে বাসন মাজতে পারতো;-পশ্চিম পুকুরঘাটে বিলু আপা ছাই দিয়ে বাসন মাজতো, নারকেলের আঁশে ছাইমেখে ঘষতে থাকতো, তার হাতের আঙুল নাচের মুদ্রার মতো নাচতো, তার আঙুলের ঘষায় সোনা হয়ে উঠতো পেতলের থালা গেলাশ বাটি, যা দাঁত দিয়ে কামড়াতে ইচ্ছে হতো রাশেদের। অন্য সবাই ভাত খেতো টিনের থালায়, বাবা আর রাশেদের জন্যে ছিলো পেতলের থালা গেলাশ; বিলু আপা পেতলের থালা আর গেলাশ মাজতে সম্ভবত পছন্দ করতো, অনেকক্ষণ ধ'রে মাজতো, তারপর ধোয়ার জন্যে তলোয়ারের মতো থালা ঢুকিয়ে দিতো পানিতে, পানিতে একটা মধুর শব্দ উঠতো, পানির নিচে চাঁদের মতো জ্বলতো তার থালাটি, পাশের হেলেঞ্চার ছোট্ট চালিটি ঢেউ লেগে লেগে কাঁপতে থাকতো। বিলু আপার মাজা পেতলের থালার দিকে তাকিয়ে থাকতে কেমন একটা সুখ লাগতো রাশেদের, রক্তের ভেতরে সে একটা ঝলমলে সোনালি আলোর নাচ অনুভব করতো।

রাশেদের পড়ার ঘর ঝেড়ে দিতে সাজিয়ে দিতে খুব সুখ লাগতো বিলু আপার। তার টেবিলের সামনের ঢেউটিনের বেড়ায় লাল নীল কাগজ লাগিয়ে দিয়েছিলো বিলু আপা, রাশেদ তাকালেই দেখতো লাল নীল ঢেউ, তার ওপর কাগজ কেটে বড়ো বড়ো ইংরেজি অক্ষরে লাগিয়ে দিয়েছিলো রাশেদের নাম, ইংরেজি অক্ষরে নিজের নাম দেখলে নিজেকে অন্য রকম মনে হতো, অনেক দূরে চ'লে গেছি মনে হতো, পাশে ইংলন্ডের রানির একটা ছবি লাগিয়েছিলো রাশেদ, তার সাথে একটা লিকলিকে লোকের ছবিও ছিলো। রাশেদ নিজেই তো গুছিয়ে রাখতো তার পড়ার টেবিল, বিলু আপা তারপরও গোছাতো, মাঝেমাঝে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রাশেদের বাঙলা বই খুলে অনেকক্ষণ ধ'রে পড়তো, নিশ্বাস ছেড়ে বলতো, তুই

কী সুন্দর সুন্দর পড়া পড়িস। বিলু আপা প্রাইমারি ইস্কুলে যেতো, অনেক বছর ধ'রে যায় না, শাড়ি পরার পর থেকেই যায় না। বিলু আপার সইরাও যায় না; তারা সবাই শাড়ি পরে, কাজ করে, কুশিকাঁটা দিয়ে শেলাই করে, বালিশে আর রুমালে ফুল তোলে, আর সময় পেলে বাড়ির আমগাছের পাশে দাঁড়িয়ে, হেলান দিয়ে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা খুব দূরের দিকে তাকায়, যেনো খুব দূরে, দিগন্তের ওই পারে, আকাশের পশ্চিম উত্তর পুব দক্ষিণ পাশে, তাদের কেউ রয়েছে। খুব মজা করতে পারতো বিলু আপা। রাশেদ বায়না ধরেছিলো ঝাঁকিজালের; বাবা জালের কথা একদম সহ্য করতে পারেন না, রাশেদকে মাছ ধরতে হবে না, তাকে শুধু পড়তে হবে, কিন্তু জাল দিয়ে মাছ ধরতে ইচ্ছে করে রাশেদের। মাছ ধরার থেকে মজার হচ্ছে জাল খ্যাও দেয়া, ডান হাতের কনুইয়ে জালের একগুচ্ছ আটকে রেখে ডান আর বাঁ হাত দিয়ে ফ্রকের মতো ধ'রে দুলে দুলে দূরে জাল ছড়িয়ে দেয়া। বিলু আপা চুপে চুপে একটি জাল বুনছিলো রাশেদের জন্যে। ভাদ্র মাসে বুনতে শুরু করেছিলো, সন্ধ্যায় ছোটোঘরে ব'সে ব'সে পাশের বাড়ির বউদের সাথে সইদের সাথে গল্প করতে করতে জাল বুনছিলো বিলু আপা। এক হাত বাড়লেই একটি ক'রে আলতার দাগ দিচ্ছিলো, জালটিকে লালপেড়ে শাদা শাড়িপরা বউয়ের মতো দেখাচ্ছিলো। রাশেদ সন্ধ্যায় চিৎকার ক'রে ক'রে পড়তো, খুব ভালো লাগতো চিৎকার ক'রে পড়তে, মাঝেমাঝে সে ছোটোঘরে গিয়ে দেখে আসতো কতোটুকু হলো জালটি। রাশেদের পড়ার টেবিলে ছিলো পেতলের একটি উঁচু হারিকেন, তাতে ছিলো ধবধবে বাদুড়মার্কা চিমনি; চোখে তাপ লাগতো ব'লে রাশেদ চিমনিতে এক টুকরো কাগজ লাগিয়ে রাখতো। অন্ধকারে হারিকেনের আলো ধবধব করতো, চোখ এক সময় বই ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতো না। সে-সন্ধ্যায় যে রাশেদের জাল বোনা হয়ে গেছে, রাশেদ জানতো না, সে মন দিয়ে চিৎকার ক'রে দুলে দুলে পড়ছিলো। এমন সময় সে পেছনে একটু শব্দ শুনতে পায়, এবং চোখ ফিরিয়ে একটা আকাশছোঁয়া ভূতবউ দেখে চিৎকার ক'রে ওঠে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে সে ভূতবউটিকে জড়িয়ে ধরে। তার চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এসে দেখতে পায় রাশেদ বিলু আপাকে জড়িয়ে ধ'রে চিৎকার করছে। এমন ঘটবে বিলু আপা ভাবতেই পারে নি। সে-সন্ধ্যায় জাল বোনা হয়ে গেলে বিলু আপার মন আনন্দে ভ'রে যায়, রাশেদকে চমকে দেয়ার জন্যে সে মাথার ওপর জাল প'রে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে এসে রাশেদের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রাশেদকে ডাকে। রাশেদ চোখ ফিরিয়ে দেখতে পায় ভূতবউ দাঁড়িয়ে আছে পেছনে, তার মাথা ঘরের চাল পেরিয়ে গাছের মাথা পেরিয়ে আকাশে উঠে গেছে। চিৎকার ক'রে সে জড়িয়ে ধরে বিলু আপাকে। বিলু আপা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলো এতে, রাশেদও খুব লজ্জা পেয়েছিলো, আর রাশেদকে খেতে হয়েছিলো একবাটি নুনগোলানো পানি, এটাই ছিলো সবচেয়ে বিচ্ছিরি।

বিলু আপা, আর তার সইরা, পুষু আপা আর পারুল আপা. এতো মিষ্টি ছিলো! তাদের শাড়ি থেকে উঠতো এতো মিষ্টি গন্ধ, চুল থেকে উঠতো এতো মিষ্টি গন্ধ, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করতো সেখানকার বাতাস গন্ধরাজ ফুলের গন্ধে ভ'রে যেতো। হাঁটলেই শরীর দুলতো তাদের, মনে হতো তাদের হাড় নেই, তাদের ভেতরে আছে দুধের জমাট সর, অনেক মাখন আছে তাদের চামড়ার ভেতরে। তারা যখন ব'সে ব'সে গল্প করতো, তাদের ব্লাউজের নিচের প্রান্তের পরে মাংসের ঢেউ দেখা যেতো, ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হতো রাশেদের; পুষু আপা রাশেদকে তার মাংসের ঢেউ ধ'রে দেখতে দিতো, রাশেদ দু-আঙুলে ওই ভাঁজ ধ'রে জোরে টান দিতো আর পুষু আপা চিৎকার ক'রে উঠতো, তারপর খিলখিল ক'রে হাসতো। মেয়েরা অদ্ভুত চিৎকার দিতে পারে, রাশেদ সেই তখনই বুঝেছিলো, কষ্টের সাথে সুখ মিশিয়ে তারা চিৎকার দিতে পারে। বিলু আপা, পুষু আপা, পারুল আপা কখনো বাড়ির বাইরে যেতো না; অনেক বছর আগে তারা বোর্ডইস্কুলে যেতো, ইস্কুলের জঙ্গলে ভরা মাঠে ছিয়া লো ছিয়া তোর মার বিয়া ধান নাই পান নাই চোতরাপাতা দিয়া ব'লে ঝড়ের মতো দৌড় দিয়ে খেলতো, রাশেদ তাদের দৌড়িয়ে ছুঁতে পারতো না, এখন মনে হয় তারা কেউ কখনো দৌড়োয় নি, তারা দৌড়োতে জানে না। তারা বাইরে যেতো না, বাইরে গেলে সাড়া প'ড়ে যেতো, কিন্তু সব সংবাদ তারা আগেই কী ক'রে যেনো পেয়ে যেতো; তারা এমন অনেক সংবাদ পেতো, যা রাশেদ কখনোই পেতো না। বাতাস না পাখি যেনো তাদের জন্যে সংবাদ নিয়ে আসতো। একদিন রাশেদ তাদের ফিসফিস ক'রে কী যেনো বলতে শোনে, রাশেদ শুধু 'রাবুর মা' কথাটি বুঝতে পারে, আর কিছু বুঝতে পারে না। রাশেদকে দেখে তারা চুপ হয়ে যায়। রাশেদ রাবুকে দেখেছে, রাবুর মাকে কখনো দেখে নি, ওদের বাড়িও কখনো যায় নি, বিলু আপা পুষু আপা পারুল আপাও কখনো যায় নি। ওদের বাড়িটা গ্রামের পশ্চিম পাশে-এতো পশ্চিম পাশে যে মনে হয় অন্য গ্রাম, চারপাশে ঘন জঙ্গল, অনেক সাপ আছে ব'লে শুনেছে রাশেদ। সেই রাবুর মাকে নিয়েও গল্প আছে বিলু আপাদের? আপাদের এক অভ্যাস, তারা নিজেদের মধ্যে খিলখিল ক'রে হাসে, ফিসফিস ক'রে কথা বলে, কিন্তু রাশেদ কাছে গেলেই তারা শুধু কাজের কথা বলে, রাশেদের পড়ার কথা জানতে চায়, ফিসফিস করে না খিলখিল করে না। তারা সব জানে শুধু জানে না রাশেদের ভালো লাগে তাদের খিলখিল তাদের ফিসফিস।

দু-দিন পর বিকেলবেলা আজিজ মাঝপুকুর থেকেই রাশেদকে ডাকতে থাকে, তার কোশানৌকোটি ভিড়োয় রাশেদদের উত্তরের ঘাটে, একটা খবর আছে ব'লে রাশেদকে তুলে নেয়। বছর দুয়েক বড়ো আজিজ তার থেকে, একই ক্লাশে পড়ে তারা, দু-এক বিষয়ে ফেল ক'রে ওপরের ক্লাশে ওঠে আজিজ, কিন্তু তার জ্ঞানের শেষ নেই; বইয়ের বাইরে যতো জ্ঞান আছে সবই আছে তার, নতুন নতুন জ্ঞান সে নিয়মিত দেয় রাশেদকে। ওই জ্ঞানে রাশেদ চঞ্চল বিহ্বল কাতর হয়ে ওঠে।

এইটে ওঠার পর থেকেই রাশেদের চোখে সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগছে মেয়েদের, মিশরের পিরামিড ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান ওই বিস্ময়ের কাছে হাস্যকর, কিন্তু তা সে কাউকে বলতে পারছে না; আজিজ ওই বিস্ময়কে, কোনো কোনো বিকেল আর দুপুরবেলা, ক'রে তুলছে আরো রহস্যময়, আরো চাঞ্চল্যকর, এমনকি ভয়াবহ। মেয়েদের বুক প্রথম কুলের মতো ওঠে, তারপর সফেদার মতো হয়, তারপর হয় কৎবেলের মতো, এ-জ্ঞান আজিজ তাকে দিয়েছিলো কিছু দিন আগে, রাশেদ কয়েক রাত সহজে ঘুমোতে পারে নি, সে চারদিকে দেখতে পাচ্ছিলো কুল সফেদা কৎবেলের বাগান, পৃথিবীটা ফলের বাগান হয়ে উঠেছিলো তার চোখে। আজো নিশ্চয়ই আজিজ কোনো রহস্য খুলে দেবে তার সামনে, তার জন্যে মনে মনে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। চারপাশে ভাদ্রের ভরা জল, আজিজ নৌকো বেয়ে ঢুকছে আমন ধানখেতের ভেতরে, সবুজ ঘাসফড়িং লাফিয়ে যাচ্ছে ধানের পাতা থেকে পাতায়, বিকেলের রোদ গ'লে পড়ছে। আজিজ রাবুর মার কথা বলে; শুনে রাশেদ চমকে ওঠে, দু-দিন আগে বিলু আপারা তো রাবুর মাকে নিয়েই কথা বলছিলো। তারাও কি সংবাদ পেয়ে গেছে, যা পেতে আজিজেরও দেরি হয়েছে দু-দিন? আজিজ বলে রাবুর মার পেট হয়েছে। এতে রাশেদ একটুও চমকে ওঠে না, পেট হওয়া কাকে বলে সে জানে; কথাটি শুনলে তার ঘেন্না লাগে, রাবুর মার কথা শুনেও তার ঘেন্না লাগলো, আজিজ আশা করেছিলো রাশেদ চমকে উঠবে। রাশেদ চমকে না ওঠায় আজিজ বিস্মিত হয়। রাশেদ বলে যে বিয়ে হ'লে পেট সব মেয়েরই হয়, রাবুর মার পেট হওয়া এমন কী সংবাদ, তাদের গ্রামের মেয়েদের তো বছর ভ'রেই পেট হচ্ছে। আজিজ হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে, রাশেদ যে আস্ত বোকা তাতে তার সন্দেহ থাকে না; আজিজ বলে, বিয়ে হ'লে পেট হয় ঠিকই, তবে স্বামী বাড়িতে থাকলে হয়, স্বামী বাড়ি না থাকলে হয় না। এটা এক বিস্ময়জাগানো নতুন জ্ঞান রাশেদের কাছে; সে মনে করতো বিয়ে হ'লেই মেয়েদের বছর বছর পেট হয়, কুমড়োর মতো পেট ফুলে ওঠে, কুৎসিত দেখাতে থাকে, তাদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। রাশেদের ভেতরে এক অস্থির ব্যাকুলতা দেখা দেয়, সে জানতে চায় স্বামী বাড়িতে থাকতে হবে কেনো? আজিজ অনেকক্ষণ ধ'রে, আস্তে আস্তে, ব্যাখ্যা করে; বলে, বিয়ে হ'লেই হয় না, স্বামীকে স্ত্রীর ভেতরে একটা কাজ করতে হয়, কাজের সময় স্ত্রীর পেটে স্বামীর ভেতর থেকে মণি ঢোকে, তবেই পেট হয়। কীভাবে ঘটনাটি ঘটে, তাও বর্ণনা করে আজিজ, তার হাতঠোঁটমুখ কাঁপতে থাকে, মোচড় দিয়ে উঠতে চায় রাশেদের শরীরটিও; সে বলে যে রাবুর বাবা দেশে থাকে না, দশ বছর ধ'রে দিনাজপুর থাকে, তাই অন্য কারো সাথে কাজের ফলে রাবুর মার পেট হয়েছে। ঠিকই রাবুর বাবা দেশে থাকে না, তবে রাশেদের মনে প্রশ্ন জাগে, রাবুর বাবা যদি দশ বছর আগে রাবুর মার পেটে মণি ঢুকিয়ে গিয়ে থাকে? কথাটি বলতেই আজিজ হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে আবার, বলে, দশ বছর আগে ঢোকালে হয় না, প্রত্যেকবার নতুন ক'রে ঢোকাতে হয়। আজিজ বলে যে রাবুর বাবা দেশে আসে না, তার দিনাজপুরে আরেক বউ আছে; রাবুর মার সাথে

বারেক স্যারের প্রেম, বারেক স্যার রাতে ওই বাড়িতেই থাকে, তাই পেট হয়েছে রাবুর মার। প্রেম শব্দটি আরো দু-একবার শুনেছে রাশেদ, খুব ভণ্ডকথা এটা, শুনে রাশেদের শরীর কেঁপে ওঠে; ভাব হ'লেও চলতো, ভাব মনের ব্যাপার, কিন্তু প্রেম, এটা অত্যন্ত ভণ্ডকথা। ভাদ্রের বিকেলে রাশেদ একটা জ্ঞান লাভ করে, আদম যেমন লাভ করেছিলো; বই প'ড়ে যখন সে কোনো জ্ঞান লাভ করে তখন সে এমন থরথর ক'রে কাঁপে না, ভেতরটা এমন গনগন করে না, কিন্তু আজিজের জ্ঞান তাকে ভূমিকম্পের মতো কাঁপায়, যা চলতে থাকে কয়েক দিন ধ'রে। বাচ্চা কী ক'রে হয় সে মাঝেমাঝেই ভাবে, বুঝে উঠতে পারে না, কারো কাছে জিজ্ঞেসও করতে পারে না। আজিজই একবার তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো স্বামীরা বউদের পেটে মণি ঢুকিয়ে দেয়, তাতে পেট হয়, বাচ্চা হয়। জিনিশটা কেমন রাশেদ জানে না, তবে খুব ঘেন্না লেগেছিলো তার, খুব নোংরা জিনিশ হবে ব'লে তার সন্দেহ হয়েছিলো। তার ধারণা হয়েছিলো বিয়ের পর স্বামীরা বউদের পেট কানায় কানায় ওই নোংরায় ভ'রে দেয়, আর ওই নোংরা থেকে বছর বছর বাচ্চা হয়।

রাশেদ জানে একজনের বউয়ের পেটে আরেকজনের, বা বিয়ে না ক'রে, মণি ঢোকানো বড়ো অপরাধ, জেনা,-আজিজই তাকে জেনা কথাটি শিখিয়েছিলো, ওই অপরাধের জন্যে পুরুষ আর মেয়েলোকটিকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে হয়। খুব ভয় পেয়েছিলো রাশেদ, অনবরত পাথর ছোঁড়া দেখতে পেয়েছিলো চোখের সামনে। এটা বড়ো কলঙ্ক; এমন কলঙ্ক হ'লে মুখ দেখানো যায় না, পুরুষেরা পালিয়ে আসাম ত্রিপুরা চ'লে যায়, মেয়েরা গলায় ফাঁসি দেয়, কলসি বেঁধে পানিতে ডুবে মরে, যেমন ফাঁসি দিয়ে মরেছিলো কেরানিবাবুর মেয়ে। রাশেদ কখনো তাকে সামনে থেকে দেখে নি, দূর থেকে দেখেছে, শুধু শুনেছে তার ফাঁসির কথা। তার অনেক বয়স হয়েছিলো, বিয়ে হয় নি ব'লেই সে ফাঁসি দিয়ে মরেছে, এমন কথা শুনেছিলো রাশেদ; তবে রাশেদ বড়োদের ফিসফিস ক'রে কথা বলাও শুনেছে। রাবুর মাও কি ফাঁসি দিয়ে মরবে? তবে কলঙ্ক থেকে, রাবুর মার ম'রে-যাওয়া থেকে, রাশেদকে বেশি পীড়িত করছে ওই ব্যাপারটি। আজিজ যেভাবে বর্ণনা করেছে তাতে তার জগত ঘিনঘিনে হয়ে উঠেছে, ভাদ্রের ধানখেত ভরা জল সোনালি রোদ নোংরায় ভ'রে যাচ্ছে। বিলু আপার বিয়ে হ'লেও কি অমন কাজ করবে সেই লোকটি, যাকে সে দুলাভাই বলবে, বিলু আপাও কি তার নিচে অমনভাবে শোবে, আর লোকটি, আজিজ যেমন বলেছে, সেভাবে কাজ করবে? না, না, বিলু আপা অমন কাজ করতে দেবে না, বিলু আপা কখনো অমন ময়লায় পেট ভ'রে তুলবে না। কিন্তু বিলু আপাও যদি অমন করে, বাধ্য হয় অমন করতে? কিছু দিন আগে রাশেদ এক খালাতো বোনের বিয়েতে গিয়েছিলো, একটা অসভ্য লোকের সাথে বিয়ে হয়েছে তার, লোকটাকে সে কিছুতেই দুলাভাই বলবে না, ডালিম গাছের নিচে লোকটা হ্যাজাক লাইট পাম্প করতে করতে রাশেদকে

ফিসফিস ক'রে বলেছিলো, বুঝলি তর আফারে এইভাবে। ঘেন্নায় লোকটার কাছ থেকে স'রে গিয়েছিলো রাশেদ। আজিজ বলছে, বারেক স্যারের খুব বিপদ হতো, রাবুর মারও খুব বিপদ হতো, কিন্তু তারা খালাশ ক'রে ফেলেছে ঢাকা গিয়ে, নইলে গ্রামের মানুষ তাদের ছাড়তো না। গ্রামের মানুষ একটা কিছু করবেই, তবে তাদের অসুবিধা হচ্ছে রাবুদের বাড়ির সাথে গ্রামের লোকদের কোনো সম্পর্কই নেই, আর বারেক স্যারও গ্রামের মানুষদের মূর্খ গাধা মনে করেন, তাদের সাথে কোনো কথাই বলেন না। কয়েক বছর আগে বারেক স্যার নাইনে বাঙলা পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন ধর্মটর্ম সব বাজেকথা, ওইগুলো মানুষই বানিয়ে আল্লাভগবানঈশ্বরের নামে চালিয়ে দিয়েছে; তাতে পণ্ডিতবাবু কোনো রাগ করেন নি, বলেছিলেন কে জানে কোনটা সত্য, কিন্তু ছোটো মৌলভি সাব, যিনি চিৎকার না ক'রে কথা বলতে পারতেন না, কথা বলার সময় যার মুখ থেকে থুতু ছিটকে পড়তো, ক্ষেপে তাকে মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে মারতে গিয়েছিলেন, পারেন নি ছাত্ররা বাধা দিয়েছিলো ব'লে। এবার স্যারকে তারা একটা শিক্ষা দেবে, কীভাবে দেবে সেটা মাতবররা বুঝে উঠছে না। তারা ডাকলে বারেক স্যার আসবেন না, তাদের মূর্খ ব'লে গালি দেবেন, এটা তারা জানে; কিন্তু তাকে শাস্তি দিতেই হবে।

রাশেদ জানতে চায় রাবুর মার যে পেট হয়েছে, কেউ দেখেছে; আজিজ জানায় কেউ দেখে নি। তাহলে কি স্যারের শত্রুরা এটা বানিয়েছে তাঁকে বিপদে ফেলার জন্যে? রাশেদ আর আজিজ ঠিক ক'রে উঠতে পারে না ঘটনাটি সত্য কী সত্য নয়। সত্য কী ক'রে হবে, ওই বাড়িতে তো গ্রামের কেউ যায়ই না, তারাও যায় না কারো বাড়িতে, তাই কে দেখেছে রাবুর মায়ের পেট হয়েছে? আজিজ বলছে, স্যার ওই বাড়িতে যান, রাতেও থাকেন, তাই ঘটনা সত্য হ'তেও পারে। কিন্তু তিনি যে রাতে থাকেন, তা কেউ দেখেছে? তা দেখে নি, তবে তিনি বিকেলে ওই বাড়িতে যান, তাকে কেউ আর বেরিয়ে আসতে দেখে না, তাই মনে হয় তিনি রাতে থাকেন ওই বাড়িতে। পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষ একলা থাকলে ওই কাজ না ক'রে পারে না। আজিজ একটা বইয়ে পড়েছে পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষ একলা থাকলে শয়তান হাজির হয় মাঝখানে, শয়তান কানে কানে ওই কাজ করতে বলতে তাকে, শয়তান বলে ওই কাজ আঙুরের মতো মিষ্টি বেদানার মতো মিষ্টি শরাবের মতো মধুর, তখন আর তারা না ক'রে থাকতে পারে না। রাশেদের তীব্র ইচ্ছে হয় ওই বইটি পড়ার। আঙুর বেদানা শরাব কোনোটিই তখনো রাশেদ দেখে নি, এগুলোর কথা শুনেছে, এগুলোর কথা শুনলেই কেমন যেনো লাগতে থাকে, আর আজ আঙুর বেদানা শরাব তার রক্তকে খেজুররসের মতো জ্বাল দিতে থাকে, রক্ত থেকে উঠতে থাকে তীব্র সুগন্ধ, এবং একটি বিষের স্রোতও তার রক্তের ভেতরে বইতে থাকে। রাশেদ বুঝতে পারছে সত্য বা মিথ্যে যা-ই হোক এবার লোকেরা একটা শাস্তি দেবে বারেক স্যারকে; তবে ওই শাস্তির থেকে তার ভেতরে অন্য এক আগুনের দাউদাউই সে বেশি টের পেতে থাকে। নতুন জ্ঞান তার

রক্তে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। মাতবররা বিচার ডাকতে পছন্দ করে, বিচার ক'রে সাধারণত জুতো মারে, সাধারণত ভুল লোককেই জুতো মারে; বিচারে ডেকে তারা যদি বারেক স্যারকে জুতো মারতে পারতো, খুব সুখ পেতো তারা; কিন্তু তারা জানে স্যার তাদের বিচারে আসবেনই না। তিনি তাদের মূর্খ মনে করেন গাধা মনে করেন; মাতবরদের জন্যে এটা খুব অপমানের, তারা সত্যিই মূর্খ আর গাধা ব'লেই হয়তো। কয়েক দিন পরই তারা স্যারকে শাস্তিটা দেয়। স্যার নৌকো বেয়ে বিকেলবেলা রাবুদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলেন, তাঁর নৌকোটি যখন দক্ষিণের ধানখেতের কাছাকাছি আসে তখন দু-দিক থেকে দু-মাতবরের দু-চাকর লগি মেরে এসে তাঁর নৌকোয় ঢু দেয়; বারেক স্যার তাদের ধমক দিলে তারা তাঁকে আক্রমণ করে, লগি দিয়ে বাড়ি মারতে থাকে, বারেক স্যার পানিতে প'ড়ে যান, তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে থাকে। চাকর দিয়ে বারেক স্যারকে পিটিয়েও হতাশ হয়ে পড়ে মাতবররা; তারা ভেবেছিলো মার খেয়ে বারেক মাস্টার নিশ্চয়ই চাকরদের বিচার চাইতে আসবে তাদের কাছে, তখন তারা আস্তে আস্তে তুলবে রাবুর মায়ের পেট হওয়ার কথাটা; কিন্তু বারেক স্যার কোনো অভিযোগ করেন নি। রাশেদ আর আজিজ একবার গিয়েছিলো স্যারের কাছে, তিনি বলেছিলেন মূর্খ আর গাধাদের নিয়ে তিনি ভাবেন না।

আজিজের দেয়া জ্ঞান রক্তে পরিণত হয়ে গেছে রাশেদের, সব সময়ই তা সে টের পাচ্ছে, রক্তকেও সে এতোটা টের পায় না, নিশ্বাসকেও পায় না। রাশেদ ইস্কুলে যাচ্ছে, বই পড়ছে, বিলু আপার মুখের দিকে আর ভালো ক'রে তাকাতে পারছে না, পুষু আপার ব্লাউজের প্রান্তের নিচের মাংসের ভাঁজ চোখে পড়তেই অন্ধের মতো চোখ বুজে ফেলেছে। মাংসে সে কাঁপন বোধ ক'রে চলছে যা আগে কখনো বোধ করে নি; একটা ঘোর, ঘুমের মতো, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মতো, স্বপ্নের মধ্যে জেগে থাকার মতো, তাকে ঘিরে ফেলছে। একা থাকতে ভালো লাগছে, কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, চোখের সামনে কী যেনো দেখতে পাচ্ছে সারাক্ষণ। কয়েক দিন পর বিকেলবেলা ইচ্ছে হলো নৌকো বেয়ে একটু বেরিয়ে আসতে; বড়ো নৌকোটি নিয়ে নান্নু, তাদের চাকর, চ'লে গেছে দোয়াইর পাততে, বিকেলে এ-সময় নান্নু দোয়াইর পাততে যায়, ঘাসফড়িং গেঁথে চিংড়ি ধরার জন্যে ধানখেতের আলের মাঝখানে দোয়াইর পেতে আসে। কোনো কোনো দিন নিয়ে যায় রাশেদকেও, আজ নিয়ে গেলে তার রক্ত ঠাণ্ডা হতো। তার নিজেরও একটি ছোট্ট কোশানৌকো রয়েছে, রাশেদ সেটি ক'রে ইস্কুলে যায়, কিন্তু বেড়ানোর জন্যে কোশাটি খুব ভালো নয়। রাশেদ তবু বেরিয়ে পড়ে, চারদিকে পানি ফুলে ফুলে উঠছে, তার বৈঠার আঘাতে ঢেউ উঠছে পানিতে, ঢেউ দেখতে পুষু আপার ব্লাউজের প্রান্তের মাংসের ভাঁজের মতো, পানিতে প্রায় ডুবে আছে পাড়াগুলো, দূরে পুকুরপাড়ে হিজলগাছটি মাথা পর্যন্ত ডুবে গেছে। রাশেদ দূর থেকে দেখতে পায় হিজলের ডালপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে তাদের

নৌকোটির গলুই, নান্নু হয়তো নৌকো লাগিয়ে মজা ক'রে বিড়ি টানছে। নান্নু লুকিয়ে লুকিয়ে সতীলক্ষ্মী বিড়ি খায়, বিড়ির গন্ধটা রাশেদের বেশ লাগে। রাশেদ কোশানৌকোটি বেয়ে হিজলগাছের কাছে যায়, নৌকোর গলুই ধরে, ডালপালার ভেতরে নান্নুকে দেখে কেঁপে ওঠে। নান্নু লুঙ্গি অনেকটা খুলে ফেলেছে, বাঁ হাত দিয়ে সে নৌকো ধ'রে আছে, তার চোখ বোজা, ডান হাত দিয়ে সে তার শিশ্ন নাড়ছে, জোরে জোরে নাড়ছে, জোরে জোরে নাড়ছে। রাশেদ স্তব্ধ হয়ে যায়, নান্নুকে ডাকতে ভুলে যায়, পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকে; নান্নু চোখ বুজে দ্রুত নাড়ছে, ভয়ঙ্কর সুখকর স্বপ্ন দেখছে, তার ভেতর থেকে মৌচাকের মধু আর জাতসাপের বিষ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নান্নুর ভেতর থেকে শাদা লালা ফিনকি দিয়ে বেরোয়, তার শরীর বেঁকে বেঁকে যায়। ঘুমঘুম চোখ খুলে নান্নু রাশেদকে দেখে, সুখে অবসাদে সে ভ'রে আছে। রাশেদ দূর থেকে দেখে শাদা বস্তুটি, তার ঘেন্না লাগে, আজিজ এরই কথা বলেছিলো। নান্নু বলে, দাদা, আমার বিয়ার বয়স অইয়া গ্যাছে, আমি বিয়া করুম, বিয়া না করলে বাচুম না, দেহেন না খাণ্ডা খাণ্ডা মণি বাইরয়। রাশেদের ঘেন্না লাগে; তার সব কিছু কাঁপতে থাকে, তার কোশাটি কাঁপতে থাকে, নিচে ভাদ্রের পানি কাঁপতে থাকে। ধীরে ধীরে কাঁপতে থাকে সারা গ্রামটি।

রাশেদ ফিরে এসেই পড়তে বসে, সে আর এসব ভাবতে চায় না, দেখতে চায় না, কেঁপে উঠতে চায় না। চিৎকার ক'রে পড়ে, চিৎকারে যেনো তার মাংসের কাঁপন কমে; সে ইতিহাসের ভেতর ঢোকে, ভূগোল বইয়ে ভ্রমণ করতে থাকে মহাদেশ থেকে মহাদেশে, জ্যামিতির বৃত্ত ও ত্রিভূজের মধ্যে খোঁজে শীতলতা। এমন সময় বৃষ্টি নামে, টিনের চালে কোটি কোটি পরীর নূপুর বেজে ওঠে; পশ্চিম পাশের খেজুরগাছটি চালের ওপর ডানা ঝাপটাতে থাকে। নিবিড় বৃষ্টি নেমেছে, বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না, মহাজগত ভ'রে একটানা কোমল মধুর অন্তরঙ্গ বৃষ্টির শব্দ বেজে চলছে। রাশেদকে বিলু আপা খাওয়ার জন্যে ডাকে, রাশেদ চুপচাপ কোনো কথা না ব'লে খায়, বাবা তাকে পড়ার কথা জিজ্ঞেস করেন, রাশেদ জানায় ভালোই হচ্ছে, খাওয়ার পর আবার পড়তে বসে। বাইরে নিবিড় কালো বৃষ্টি, রাশেদ মনে মনে দেখতে পায় বৃষ্টিতে পুকুরপাড়ের হিজলগাছটি ঘুমিয়ে পড়ছে, ধানের পাতা ভিজে ভিজে ভাড়ি হয়ে পানিতে লুটিয়ে পড়ছে, বৃষ্টির ফোঁটায় পানিতে শাদা শাদা ঝিলিক উঠছে। তার খুব ঘুম পায়, টেবিলে মাথা রেখে রাশেদ ঘুমিয়ে পড়ে একবার, কিছুক্ষণ পর মায়ের ডাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে গিয়ে শুয়ে পড়ে। তার শরীর এখন স্নিগ্ধ শীতল লাগছে, কাঁথা জড়িয়ে সে শুয়ে পড়ে। বাইরে ঘুমের মতো বৃষ্টির ঘুমের মতো শব্দ, রাশেদের মনে হয় সে মাটির মতো গ'লে যাচ্ছে, বৃষ্টির পানিতে গড়িয়ে বয়ে চলছে পুকুরের দিকে, তার ত্বক গলছে, মাংস গলছে, রক্ত গলছে, গ'লে গ'লে পুকুরের দিকে বয়ে চলছে। রাশেদ ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্ন দেখে, যেমন স্বপ্ন আগে দেখে নি, এক

স্বপ্নের মতো নারী যাকে সে কখনো দেখে নি যার রূপের মতো রূপ সে কখনো দেখে নি যার ঠোঁট ডালিম ফুলের মতো হিজল ফুলের মতো রঙিন সে রাশেদের আঙুল নিয়ে খেলা করছে রাশেদ তার হাত নিয়ে খেলা করছে নারী রাশেদের গ্রীবায় হাত রাখছে রাশেদ তার গালে হাত রাখছে তার শাড়ি উড়ছে তার বুক ধবধব করছে রাশেদ হাত বাড়াচ্ছে আর তখন শরীর কেঁপে কেঁপে উঠে স্বপ্ন ভেঙে যায় স্বপ্ননারী শূন্যে মিলিয়ে যায়। চাপা হতাশার মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় রাশেদের, তার শীত শীত লাগতে থাকে, ভিজে গেছে ব'লে তার বোধ হয়, সে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়, আঙুলে আঠা আঠা লাগে, ঘেন্নায় অবসাদে রাশেদ কুঁকড়ে ওঠে।

পাশের বাড়ির জালালদ্দি শেখ, যে রাশেদের বাবার থেকে দশ বছরের বড়ো হবে, রাশেদের বাবা যাকে চাচা বলে, গালাগাল ক'রে চলছে তার স্ত্রীকে; প্রতিদিন সকালে দুপরে সন্ধ্যায়ই সে গালাগাল করে, রাশেদ শুনতে পাচ্ছে পড়ার ঘর থেকে। রাশেদ ওই গালাগাল শুনে প্রতিবারই ভয় পায়, নিজের জন্যে নয়, জালালদ্দি আর তার স্ত্রীর জন্যে, তবে সে দেখেছে আর কেউ ভয় পায় না। ভয়টা তার রক্তে কালো কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে। জালালদ্দি গলা ফাটিয়ে গালি দিচ্ছে যদিও তার গলায় জোর কম, চোতমারানির ঝি, তরে তালাক দেই, তর মারে তালাক দেই, তর মাইয়ারে তালাক দেই, তুই আমার বাড়ি থন বাইর অইয়া যা। জালালদ্দির মুখ থেকে ভণ্ডকথা ময়লার মতো উছলে পড়তে থাকে, গ্রামের অনেকেই ভণ্ডকথা বলে, বউকে গালি দেয়ার সময় তারা মুখে ফেনা তুলে ফেলে, তবে তার মতো কেউ নয়। এসব গালাগাল রাশেদের মনে দলাপাকানো ঘেন্না সৃষ্টি করে, আর তালাক কথাটি তাকে ভীত করে, তবে আর কাউকে করে ব'লে মনে হয় না; তালাক বললেই তো তালাক হয়ে যায় ব'লে সে শুনেছে, ওই পুরুষলোক আর মেয়েলোক আর এক সাথে থাকতে পারে না, থাকলে কবিরা গুনা হয়, তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে হয়, কিন্তু জালালদ্দি আর তার বউর তালাক হচ্ছে না। তারা একসাথেই থাকছে। সে তার বউকেই শুধু তালাক দেয় না, দেয় শাশুড়ীকেও, ভয়ঙ্কর লাগে কথাটি, আরো কুৎসিত হচ্ছে সে তালাক দেয় তার নিজের মেয়েকেও। মেয়েকে কি তালাক দেয়া যায়, নিজের মেয়ে কি নিজের বউ হয়, নিজের মেয়ের সাথে কি সে ঘুমোয়? ঘিনঘিনে লাগে রাশেদের। জালালদ্দি শেখের মেয়েটি রাশেদদের বাড়িতে এসে রান্নাঘরে ব'সে বিড়বিড় করতে থাকে, আমার জাউর‍্যা বাপটার মোখে কোনো ট্যাক্সো নাই। জালালদ্দির বউ গালি শুনে কথা বলে না, তবে একটু পরে জালালদ্দি যখন তাকে মারতে শুরু করে, তখন তার গলা শোনা যায়। জালালদ্দি লিকলিকে মানুষ, দিনভর কাশে, হয়তো যক্ষ্মা হয়েছে, নারাণগঞ্জের কারখানায় কাজ করে, বাড়ি আসে দু-তিন মাস পর পর। কয়েক বছর আগে আরেকটা বউ এনেছিলো সে, বেশ সুন্দর ছিলো দেখতে, সবাই তাকে শহরনি বলতো, কসবিও বলতো। পাড়া বলতে রাশেদ বুঝতো তাদের গ্রামের পাড়াগুলোকেই, তবে শুনে শুনে রাশেদ বুঝে ফেলেছিলো আরেক ধরনের

পাড়া আছে, সেগুলো শহরের পাড়া, যেখানে খারাপ মেয়েমানুষেরা থাকে, শহরনিও খারাপ মেয়েমানুষ, জালালদ্দি ওই পাড়া থেকে তাকে নিয়ে এসেছে। রাশেদের খারাপ মনে হতো না তাকে, রাশেদকে সে আদর করতো, তার হাসিটাও সুন্দর ছিলো। কয়েক মাস পরেই সে চ'লে গিয়েছিলো, গ্রামের মানুষ তাকে তাড়িয়ে দেয় নি, জালালদ্দি তাকে এতো মারতো যে সে থাকতে পারে নি। জালালদ্দি তার বউকে মারতে শুরু করে, বউটি গাল সহ্য করলেও মার সহ্য করে না; সে চিৎকার ক'রে ওঠে, ঢ্যামনার পো শরিলে হাত দিবি না, আমারে তালাক দিয়া তুই তর মার লগে হো গিয়া। জালালদ্দি তাকে মারতে চেষ্টা করে, পারে না, তার বউর শক্তি জালালদ্দির থেকে বেশি; বউ ঠেলা দিয়ে জালালদ্দিকে গোবরের ওপরের ফেলে দেয়। জালালদ্দি চিৎকার করতে করতে খ'সে-পড়া লুঙ্গি ধ'রে উঠে দাঁড়ায়, বকতে বকতে রাশেদদের বাড়ির দিকে আসতে থাকে। রাশেদ জানে জালালদ্দি তার পড়ার ঘরের জানালার পাশে এসে দাঁড়াবে, ছেঁড়া লুঙ্গির প্রান্ত দু-হাতে ধ'রে অনেকক্ষণ ধ'রে বিলের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তার সাথে কথা বলবে। জালালদ্দি তার সাথে কথা বলে স্নেহের সাথে, রাশেদকে ডাকে দাদা ব'লে, রাশেদকে ছুঁয়ে দেখতে চায়; বলে, দাদা পড়ছ নি, পড়, পড়, বেশি কইর‍্যা পড়, বড় অইয়া তুমি জজ অইবা, আমারে তহন চাকর রাইক্ক। রাশেদের তখন খুব ভালো লাগে লোকটিকে, তার ভাঙা গাল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে তাকিয়ে মায়া হয়; রাশেদ জিজ্ঞেস করে, দাদা, আপনি এতো গালাগাল করেন কেনো? জালালদ্দি লজ্জা পায়, বলে, দাদা, আমি কি মানুষ? রুজি করতে পারি না, বউরে খাওয়াইতে পারি না, মাইয়ারে কাপড় দিতে পারি না, খালি গাইল দিতে পারি। আইজ কি খামু তারও ঠিক নাই।

ভাত খুব মারাত্মক জিনিশ। ছোটোবেলা থেকেই রাশেদ দেখে আসছে ঘরে ঘরে ভাতের অভাব, তাদের গ্রামে পেট ভ'রে খেতে পায় এমন ঘরের সংখ্যা খুব কম, দশবারোটির বেশি হবে না; তাদের বাড়িরই অন্য তিন ঘরের লোকেরা ঠিকমতো খেতে পায় না। পশ্চিম ঘরের বউ-আম্মা আর তার শাশুড়ী প্রায় না খেয়েই থাকে। বউ-আম্মার স্বামী, রাশেদের চাচতো কাকা, বিয়ের পর বউ-আম্মাকে আর দাদীকে রেখে, পাঁচ-ছ বছর আগে, সেই যে আসাম গেছে দরজি না কিসের কাজে, আর আসে নি, কবে আসবে কেউ জানে না, রাশেদ মাঝেমাঝে শুনতে পায় কামরূপ গেলে কেউ আর ফেরে না; বছরে দু-একবার টাকা পাঠায় লোকের সাথে, পঞ্চাশ ষাট টাকা, হাতে আসার সাথে সাথে খরচ হয়ে যায় বাকি শোধ করতে করতে, সব বাকি শোধও করতে পারে না। তারা খায় খুদের ভাত, সকালে খায় দুপুরে খায় রাতেও খায়, সকালে খেলে দুপুরে খায় না, দুপুরে খেলে রাতে খায় না। গ্রামের লোকেরা এ-সময় শাপলাই খায় বেশি, বউ-আম্মা শাপলাও পায় না, কে তাকে বিল থেকে শাপলা তুলে এনে দেবে? রাশেদ আর নান্নু যেদিন শাপলা তুলতে যায়, বউ-আম্মার জন্যেও শাপলা তুলে আনে, তার জন্যে মোটা

মোটা কয়েক আটি শাপলা তোলে, বউ-আম্মা সেগুলো ঘাটে ভিজিয়ে রাখে, যেদিন খুদও থাকে না সেদিন দুপুরে শাপলা রাঁধে। তার একটা জালি আছে, পুরোনো শাড়ি দিয়ে বানানো, সেটি দিয়ে সে গুঁড়োচিংড়ি আর তিতানি ধরে। সন্ধ্যায় সে ঘাটে জালি পাতে, জালিতে কুঁড়োর আধার দেয়, মাঝেমাঝে জালি তোলে, জালিতে যে-কটি গুঁড়োচিংড়ি আর তিতানি ওঠে, সেগুলো জমিয়ে রাখে মাটির ঘটে। গুঁড়োচিংড়ির বড়া খায় দিনের পর দিন, শাপলা খায়, চালের ভাত সাত দিনে একদিনও খায় না, খুদের ভাত খায়। জালালদ্দি শেখও তাই খায়, যদিও সে সন্ধ্যায় তামাক খেতে এসে বাবার সাথে গল্প করতে করতে বলে দুপুরে সে ইলিশ মাছ দিয়ে বোরো চালের ভাত খেয়েছে। মিষ্টি আলু পছন্দ করে রাশেদ, পোড়া মিষ্টি আলু খেতে খুব ভালো লাগে, বিশেষ ক'রে ভালো লাগে বেশি পোড়া অংশ চিবোতে; তবে মিষ্টি আলু ভাত নয়। মিষ্টি আলু ভাত না হ'লেও ভাতের বদলে গ্রামের অনেকেই আলু খেয়ে থাকে। আলুর নৌকো এলে মা রাশেদকে ডাকতে বলে, চার আনায় একধড়া আলু পাওয়া যায়, একধড়ার কম বেচে না আলুঅলা, রাশেদের মা দু-তিন ধড়া মিষ্টি আলু রাখে। জালালদ্দিও ঘাটে এসে দাঁড়ায়, আলুর মণ কতো জিজ্ঞেস করে, এক মণ আলু মাপতে বলে, আলুঅলা অবাক হয়; জালালদ্দি বলে সে মণের নিচে আলু কেনে না, তবে আলু মাপতে শুরু করলেই সে আলুঅলাকে বলে সে আজ আলু কিনবে না, ঘরে কয়েক মণ আলু প'ড়ে আছে। বউ-আম্মাও ঘাটে এসে দাঁড়ায়, আলুর দিকে এমনভাবে তাকায় যেনো সে সোনার দিকে তাকিয়ে আছে। রাশেদের মা বলে, বউ, তুমিও একধড়া আলু রাক। মার কথা শুনে রাশেদের সুখ লাগে।

দুপুর হ'লে রাশেদদের বাড়িতে দাগু তার ভাঙা, পেছন দিকে অর্ধেক খ'সে-পড়া, নৌকোটি বেয়ে আসে, সে নৌকো সেঁচতে সেঁচতে আসে। তার নৌকোটির পেছনের দিকটা নেই, আর যতোটুকু আছে তার সবটা ভ'রেই ফুটো, সে আঠাল মাটি দিয়ে অসংখ্য ফুটো বন্ধ করেছে, কিন্তু নৌকোটির দিকে দিকে পানি উঠতে থাকে। সে নৌকোটি রাশেদদের ঘাটে ভিড়োয়, খেজুরগাছের সাথে বাঁধে, তবে বাড়ি ফেরার সময় তাকে নৌকোটি উঠোতে হয় পানির নিচে থেকে। দাগু জোলা বা তাঁতী, তবে তাঁত নেই অনেক বছর; কামলা খাটে সে, রাশেদদের বাড়িতে বছর ভ'রেই খাটে, কিন্তু এ-সময় কেউ কামলাও খাটায় না। দাগুর বাচ্চাও অনেকগুলো, সেদ্ধ শাপলা খেয়েই তারা বেঁচে আছে। দাগু আসে ফেনের জন্যে। গ্রামে ফেনও দুষ্প্রাপ্য, গ্রামে যেমন ভাতের গন্ধ পাওয়া যায় না তেমনি পাওয়া যায় না ফেনের গন্ধও। দাগু ফেনের দিকে যেমনভাবে তাকায় রাশেদের নেড়া কুকুরটিও তেমনভাবে তাকায় না; কুকরটির ফেনের পাতিল থাকে খেজুরগাছের গোড়ায়, মা কুকুরটির পাতিলে ফেন ঢেলে দেয়, কুকুরটি দূরে শুয়ে শুয়ে দেখে, তার উঠতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু দাগুর পাতিলে ফেন ঢালার সময় চকচক ক'রে ওঠে দাগুর চোখমুখ। দাগু কুকুরের পাতিলটার দিকেও তাকায়, ওই ফেনটুকু

পেলে সে আরো খুশি হতো, কুকুরটি দাগুর পাতিলের দিকে একবারও তাকায় না। ফেন নিতে একা দাগুই আসে না, তার ভাই ছিটুও আসে, জালালদ্দির বউও আসে, কালার মাও আসে। যেদিন তারা সবাই আসে, তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকায় না, পারলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো একে অপরের ওপর, ঝাঁপিয়ে না প'ড়ে তারা ব'সে থাকে মুখ কালো ক'রে। রাশেদের ক্ষুধা পায় রান্না শেষ হওয়ার আগেই, রান্নাঘরে এসে সে উঁকি দেয়, ওই মুখগুলো দেখে তার আর ক্ষুধা থাকে না।

রাশেদকে ঘিরে আছে মানুষ গাছপালা পাখি পুকুর ধানখেত আকাশ মেঘ বৃষ্টি আর তার বইগুলো; সে অনুভব করছে মানুষ গাছপালা পুকুর পাখি ধানখেত আকাশ মেঘ বৃষ্টি যেমন সত্য তেমনি আরেক সত্য আছে বইগুলোর মধ্যে, ওই সত্যই তাকে আকর্ষণ করছে বেশি। মানুষ সুন্দর, তবু মানুষ তার মনে ঘেন্না জাগাচ্ছে, কষ্ট জন্ম দিচ্ছে; মানুষকে সব সময় সুন্দর মনে হচ্ছে না তার, মানুষ খুব খারাপ হ'তে পারে, কুকরের থেকেও খারাপ হ'তে পারে, মানুষের থেকে পালিয়ে যেতেই ইচ্ছে করছে তার মাঝেমাঝে; আরো বেশি সুন্দর গাছপালা পুকুর পাখি মেঘ বৃষ্টি ধানখেত, এসব কষ্ট দেয় না, মনে ঘেন্না জাগায় না, চোখের সামনে উপহার দেয় সুন্দরের পর সুন্দর, কিন্তু তারা কথা বলে না, স্বপ্ন দেখে না, ভাবে না, দূরকে কাছে আনে না। বইগুলো চুপ ক'রে থাকে, বইয়ের পাতা খুললে কোনো পাখি ডেকে ওঠে না কোনো ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না কোনো মানুষের মুখ দেখা যায় না, তবু বইগুলোর ভেতরে যেনো সব আছে, মানুষ আছে গাছপালা নদী মেঘ বৃষ্টি আছে, এবং আরো এমন কিছু আছে যার কথা রাশেদ জানতো না এখনো জানে না, যার কথা তাদের গ্রামের মানুষ জানে না, যার কথা জানে না ওই হিজলগাছ, জানে না পশ্চিমের ঝোপের ডাহুক। বই রাশেদের সামনে খুলে ধরে এক আশ্চর্য জগত, সে-জগতের ছন্দমিল তাকে কম্পিত করে, তার চিন্তা তাকে চিন্তিত করে, তার ভাবনা তাকে ভাবায়। রাশেদ তার বইগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার পড়ে, বাঙলা ইংরেজি অঙ্ক ভূগোল সবই তাকে আকর্ষণ করে, আলোড়িত করে; কিন্তু ক্লাশের বইগুলো পড়া হয়ে গেলে আর পড়ার কিছু থাকে না। ক্লাশের বইয়ের বাইরে যে বই আছে তা সে আগে জানতোই না, ইস্কুলের পাঠাগারে অনেক বই আছে কিন্তু সেগুলো কেউ পড়ে না, কাউকে পড়তে দেয়া হয় না। ক্লাশের পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো বই তাকে তার বাবা কখনো এনে দেন নি, তাদের গ্রামে কারো ঘরেই আর কোনো বই দেখে নি রাশেদ; তবে একদিন সে, সেভেনে পড়ার সময়, তাদের ঘরেরই একটি পুরোনো বাক্স খুলে অবাক হয়ে যায়; দেখতে পায় সিন্দুকটি ভ'রে আছে বই, অনেকগুলো পত্রিকা, পত্রিকা শব্দটি সে শেখে আরো পরে, রাশেদ সেগুলো পড়তে থাকে, মুগ্ধ হ'তে থাকে, শিউরে উঠতে থাকে। একটি বই পড়ার চাঞ্চল্য সে কখনো ভুলবে না। বইটিতে নায়ক তার জুতো ফেলে যায়, নায়িকা তা সংগ্রহ ক'রে রাখে গোপনে;

নায়িকার জ্বর হয়েছিলো ব'লে চুল কাটতে হয়েছিলো, সে-চুল সংগ্রহ ক'রে রাখে নায়ক; পড়তে পড়তে চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকে সে। এমন বই সে আগে পড়ে নি, তবে বইটি শেষ ক'রে উঠতে পারে নি রাশেদ। সে যখন চঞ্চল হয়ে উঠছিলো পড়তে পড়তে, বাবা এসে দাঁড়ান টেবিলের পাশে, রেগে ওঠেন তার হাতে ওই বই দেখে, রাশেদের হাত থেকে তিনি নিয়ে যান বইটি। রাশেদ আর বইটি পড়তে পারে নি। ওই সব বই পড়তে নেই ছেলেদের, পড়লে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায়, যেমন মেয়েদের সাথে কথা বলা খারাপ, মেয়েদের সাথে কথা বললে খারাপ হয়ে যায় ছেলেরা।

অমন খারাপ বই, যে-বই পড়তে তার খুব ইচ্ছে হয়, তেমন বই অনেক দিন আর পড়ে নি রাশেদ; অমন বই পাওয়াই যায় না, পেলেও ভয় লাগে, বাবা দেখে ফেললে বিপদ হবে। দক্ষিণের বাড়ির রোকেয়ার বিয়ের ক-দিন পর রাশেদ গিয়েছিলো তাদের বাড়িতে, রোকেয়ার বরই রাশেদকে তাদের শোয়ার ছোট্ট ঘরটিতে নিয়ে গিয়েছিলো; রোকেয়া ক-দিনের মধ্যেই মোটা মোটা সুন্দর হয়েছে, বিয়ের পানি পড়লে নাকি এমন হয়, রাশেদ রোকেয়ার গালে কামড়ের দাগ দেখে তার মুখের দিকে তাকাতে পারে নি; তাই ব'সেই সে বালিশের পাশে রাখা বইটি হাত তুলে নেয়। রোকেয়া চিৎকার ক'রে তার হাত থেকে কেড়ে নেয় বইটি, বিয়ের আগে ওই বই পড়লে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায় ব'লে সে বলে। রাশেদ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, এরপর সে বই সম্পর্কে সাবধান হয়, মনে হ'তে থাকে খারাপ বইই চারপাশে বেশি। সে তাদের পুরোনো বাক্সে পাওয়া পত্রিকাগুলো পড়ে বছরের পর বছর ধ'রে, একই লেখা পড়ে অনেক বার; সেগুলোতে শুধু পাকিস্থান পাকিস্থান কায়েদে আজম কায়েদে মিল্লাত মাদারে মিল্লাত মুসলমান মুসলমান, পড়তে পড়তে তার ঘেন্না ধ'রে যায়। ওপরের ক্লাশের ছেলেদের থেকে বাঙলা বই এনেও সে পড়ে, খুব ভালো লাগে। ইস্কুলে দুটি দৈনিক পত্রিকা আসে, ছাত্ররা সেগুলো পড়তে পায় না, রাশেদ হরিপদ স্যারকে ব'লে সেগুলো এনে পড়ে। সে নিজে দুটি পত্রিকার গ্রাহক হয়, সেগুলো পনেরো দিন পর পর বেরোয়, বছরে দু-টাকা লাগে, এতো কম লাগে ব'লেই সে গ্রাহক হ'তে পেরেছে। পত্রিকা পাওয়ার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে থাকে, সব সময়ই পত্রিকা আসতে দেরি হয়; পত্রিকা পেলেই সে প্রথম ঘ্রাণ নেয় কাগজের, পত্রিকার কাগজের ঘ্রাণ চমৎকার লাগতে থাকে তার। রাশেদ বড়ো হয়ে বুঝতে পারে ওই সময় এতো ব্যাকুল হয়ে সে যা পড়তো, তার বেশির ভাগই পড়ার উপযুক্ত ছিলো না; সে তখন অনেক নিকৃষ্ট লেখকের লেখা পড়েছে, তাঁদেরই সে মনে করেছে বড়ো লেখক, কিন্তু তাঁরা লেখকই নয়, যদিও তাঁদের লেখা বাঙলা বইতে আছে, তাঁদের লেখা পত্রিকায় ছাপা হয়। তবু তাঁরাই তার মন ভ'রে দিয়েছিলেন। রাশেদ বই পড়ে, এবং তার মনে একটা বোধ জন্ম নিতে থাকে যে যা কিছু লেখা হয় তা-ই সত্য নয়, যা কিছু ভালো ব'লে মনে করা হয়, তা-ই ভালো নয়, যা-কিছু

মানতে বলা হয়, তা-ই মানার যোগ্য নয়। সে অনেক কিছুই মানতে পারছে না। স্যাররা কথায় কথায় কায়েদে আজম বলেন, রাশেদ বলে মোহাম্মদ আলি জন্না। এক স্যার খুব রেগে যান একবার, বলেন, মোহাম্মদ আলি জিন্না বলবা না, বলবা কায়েদে আজম, আমাদের জাতির পিতা। চুপ ক'রে যায় রাশেদ। একবার হেডস্যার একটি পত্রিকা নিয়ে ক্লাশে ঢোকেন, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তৃতা লিখে নিতে বলেন, বক্তৃতাটি মুখস্থ করতে বলেন। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা থেকে ফিরে সলিমল্লা হলের ছাত্রদের সামনে একটি বক্তৃতা দেন, যাতে তিনি শূন্যের সাথে শূন্য আর এক যোগ করার পার্থক্যের কথা বলেন; হেডস্যার বলেন যে বক্তৃতাটি পাকিস্থানের সব ছাত্রদের মুখস্থ করতে হবে। রাশেদের খারাপ লাগে, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা মুখস্থ করতে হবে কেনো? একবার পড়েই সে বক্তৃতাটি ফেলে দেয় খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে। বক্তৃতাটি তাদের ক্লাশের সবাই মুখস্থ করে, এমনকি আজিজও গড়গড় ক'রে ওটি ব'লে যায়, হেডস্যার রাশেদকে মুখস্থ বলতে বললে রাশেদ বলে একবার সে ওটি পড়েছে, কিন্তু মুখস্থ করার মতো মনে হয় নি। রাশেদের কথা শুনে ক্লাশের সবাই ভয় পায়, এখনি হেডস্যার হয়তো বেত আনতে বলবেন, কিন্তু হেডস্যার চুপ ক'রে রাশেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, স্যারের মুখ খুব স্নিগ্ধ দেখাতে থাকে।

৮ ২৩৫টি ধর্ষণ, ৮৩টি আত্মহত্যা, ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

২৩৫টি ধর্ষণ, ১৫০টি খুন, ৯৭টি বাস দুর্ঘটনা, ৮৩টি আত্মহত্যা, ১২২টি স্ত্রীহত্যা, ৬৫টি নৌকোডুবি, ৫০৫০টি ডাকাতি, পুলিশ ১২ কোটি, মাস্তানরা ১০ কোটি, আমলারা ১৫ কোটি, ব্যাংক থেকে শিল্পপতিরা ১০৫ কোটি, সেনাপতিরা ২২ কোটি, মন্ত্রীরা ২৫ কোটি, রাজনীতিকরা ২৭ কোটি, উদ্দিন মোহাম্মদ ও তার পত্নী ও উপপত্নীরা ৩৫ কোটি, রাস্তার ভিখিরিটা ১ টাকাও না, রিকশাঅলাটা ১ টাকাও না, আমি ১ টাকাও না-আজকের বাঙলাদেশ-দাড়ি কামাতে কামাতে মনে মনে জাতীয় হিশেব করছিলো রাশেদ, এমন হিশেব করতে করতে দাড়ি কামালে সে দাড়ি কামানোর বিচ্ছিরি ব্যাপারটাকে ভুলে থাকতে পারে, তখন বুঝতে পারলো চারপাশে বা একেবারেই পাশে একটা ঘটনা ঘটেছে। গাড়ির পর গাড়ি আসছে, সামনের রাস্তা ভ'রে গেছে পাজেরো জিপ টয়োটা বেবি আর যা যা আছে সে-সবে, সবাই পাশের বাসায় উঠছে নেমেও আসছে, বেশ কয়েকটা পুলিশও দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। পুলিশগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করছে নিজেদের, কিন্তু মাঝেমাঝে সালাম দিতে গিয়ে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে, তখন কালোবস্তুটা মুখের সামনে নিয়ে চিৎকার করছে। রাশেদের মনে পড়লো পাশের বাসার কাজের মেয়েটি, মাসখানেক ধ'রে, মাঝরাতে আর হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠছে না, ওর রোগটা হয়তো সেরে গেছে, বা হয়তো এখন চিৎকারের

বদলে মাঝরাতে খিলখিল ক'রে হাসে। হাসি এক বাসা পেরিয়ে আরেক বাসায় আসার কথা নয়, হাসি হৃদয়ের অন্তরঙ্গ সম্পদ, জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে; চিৎকারই দূরে যায় হাসি যায় না। কয়েক দিনের মধ্যে মেয়েটিকে দেখেছে ব'লে তার মনে পড়ছে না, বা একদিন দেখেছে, মুখটি বেশ ভরাট আর শরীরটি আরো ভরাট হয়ে উঠেছে, ভরাট বালিকা দেখলে রাশেদের গ্রামকে মনে পড়ে, সুযোগ পেলে সিনেমায় নেমে এমএ পাশ ধুমশিগুলোকে সে দেখিয়ে দিতে পারতো, এ-সময়ের মহান শিল্পটাকে উল্টেপাল্টে দিতে পারতো; বেগম মজুমদারকেও দেখা যাচ্ছে না, তিনি হয়তো 'কাবার আলো' নিয়ে ব্যস্ত আছেন; মহৎ একখানা বই লিখছেন মহীয়সী মহিলা, এমন একখানা কেতাবের খুব দরকার ছিলো মুসলমানের, ইসলামি সাহিত্যের অমর উদাহরণ হয়ে থাকবে বইখানি। তবে তিনি ইসলামকে একটুখানি অমান্য করছেন, লেখাটির সাথে তিনি নিজের নাম ছাপছেন, এটা ইসলামসম্মত হচ্ছে না; কয়েক দিন আগে রাশেদ একখানা ইসলামি বই পড়েছে, পাতায় পাতায় মারহাবা করতে ইচ্ছে হয়েছে, তাতে হজরত মাওলানা সাব লিখেছেন নারীদের বই লেখা উচিত নয়, তাতে পর্দা নষ্ট হয়, আর লিখলেও তাতে জের নাম দেয়া পাপ, কেননা তাতে পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক হয়, যা জেনার নে। তবে বেগম মজুমদারের বইখানি পড়লে ওই হজরত মাওলানা সাব পাগল হয়ে যাবেন; বইখানি বেরোলে রাশেদ কিনে সোনার পানি দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবে, পৌত্রপৌত্রীরা পড়বে, তখন হয়তো অন্যান্য বই পড়া নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। স্নানাগার থেকে বেরিয়েই রাশেদ শুনলো পাশের বাসার কাজের মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে; একটুও চমকালো না সে, কাজের মেয়েদের মুখ বুক শরীর ভরাট ভরাট হয়ে উঠলে তো তারা আত্মহত্যা করবেই। এটা সভ্যদের কাজ, সভ্যরাই আত্মহত্যা করে; কাজের মেয়েগুলো যেমন সভ্য হয়ে উঠছে আজকাল, তাদের সাংস্কৃতিক মান যেমন উন্নত হচ্ছে, শহরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের শরীর যেমন ভরাট হয়ে উঠছে, তাতে আত্মহত্যার সভ্য কাজটি অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করা অবধারিত হয়ে উঠছে তাদের জন্যে। কোন পাড়াগাঁ থেকে একটা অসভ্য মেয়ে এসেছিলো, এসেই সভ্য হচ্ছিলো, মাঝরাতে শুধু একবার হঠাৎ অসভ্য চিৎকার ক'রে উঠছিলো, এখন সে সভ্যতার পরিণতি হয়ে উঠেছে। রাশেদ পাটখেতের গন্ধ পাচ্ছে, বড়ো একটা পাটখেত মনে হচ্ছে শহরটাকে, একটি কিশোরী যাচ্ছে পাটখেতের ভেতর দিয়ে, টয়োটা পাজেরো শীততাপনিয়ন্ত্রণ থেকে কাস্তে হাতে নেমে আসছে নৃশংস কৃষকেরা, লাশ প'ড়ে থাকছে খেতের ভেতরে, উরুতে জ'মে থাকছে চাক চাক রক্ত।

রাশেদকে পাশের বাসায় যেতে হবে, মমতাজ বারবার বলছে গিয়ে দেখে আসতে, যদিও তার যাওয়ার ইচ্ছে করছে না; তবে মজুমদার সাহেব ও বেগম মজুমদারকে সহানুভূতি জানানো দরকার, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর অন্তত এটুকু ভদ্র দায়িত্ববোধ থাকা উচিত, আর সে না গেলে কেউ কেউ তা খেয়াল

করতে পারে, গোপনে হ'লেও মনে করতে পারে মেয়েটির আত্মহত্যায় তার একটা সংগোপন ভূমিকা রয়েছে। তার বরং ইচ্ছে করছে, মমতাজকে আর পৃথিবীর সবাইকে না জানিয়ে, চোখ বন্ধ ক'রে মেয়েটির মুখ একবার দেখতে। কিন্তু তাকে যেতে হবে, অপরাধীর মতো রাশেদ পাশের বাসায় গিয়ে ঢুকলো; এটা তার এক বড়ো সমস্যা, কোন পরিস্থিতিতে কেমনভাবে যেতে হয় তা সে বুঝে উঠতে পারে না, ভাবলো অপরাধীর মতো যাওয়াই উচিত হবে; কিন্তু কাউকেই অপরাধী মনে হচ্ছে না, কেউ তো অপরাধ করে নি, যে অপরাধ করেছে সে অপরাধের ফল পেয়েছে, বারান্দায় লাশ হয়ে প'ড়ে আছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না, কাপড়ে ঢাকা প'ড়ে আছে সে; রাশেদের একবার দেখার ইচ্ছে হলো, কিন্তু বুঝতে পারলো দেখতে চাওয়া ঠিক হবে না, কেউ দেখতে চাইছে না। বেগম মজুমদার আজ আরো বিস্তৃতভাবে বোরখা পরেছেন, নাকের নিচে তাঁর গোঁফের রেখাটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তিনি ছোটো একটি বই হাতে গুনগুন ক'রে দোয়াকলমা পড়ছেন, তাকে ঘিরে আছে শোকের পাকপবিত্র আবহাওয়া; মজুমদার সাহেবকে উদ্বিগ্ন দেখালেও তাঁর হাসিটাকে পবিত্রই দেখাচ্ছে। তিনি আজ দাড়িটা মসৃণ ক'রে ছাঁটার সময় পান নি, পেলে আরো পবিত্র দেখাতো। পুলিশ আর পাড়ার যুবরাজরা মেয়েটির লাশ কোথায় যেনো নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো থানায় বা অন্য কোথাও; সে আত্মহত্যা করেছে, তাকে তো এসব জায়গায় যেতেই হবে। সে আর এ-বাসায় ফিরে আসবে না, তাকে আর বারান্দায় দেখা যাবে না, সে আর মাঝরাতে হঠাৎ একবার চিৎকার ক'রে উঠবে না। তার রোগটাকে গত রাতে সে সারিয়ে ফেলেছে।

মমতাজ বিশ্বাস করছে না, পাড়ার লোকেরাও তার মতোই গোপনে গোপনে বিশ্বাস করছে না আত্মহত্যাটিকে, যেমন তারা কিছুই বিশ্বাস করছে না আজকাল যদিও তারা পাগল হয়ে উঠছে বিশ্বাস করার জন্যে; মেয়েটির পেট ফেড়ে একটা ছোট্ট বাচ্চাও পাওয়া গেছে-এমন কথাও রটছে। কিন্তু বাচ্চাটা কি প্রমাণ করে যে মেয়েটি আত্মহত্যা করে নি? বাচ্চাটা বড়োজোর প্রমাণ করে ওটি একটি বাচ্চা, বা আরো কয়েক সপ্তাহ গেলে বাচ্চা হ'তে পারতো, এখনো ওটি এক টুকরো তুচ্ছ বস্তুই, যা মেয়েদের জরায়ুতে কখনো কখনো দেখা দেয়। ওই বস্তুটি অবশ্য প্রমাণ করছে যে মেয়েটির পেটে ওটির আবির্ভাবের পেছনে একটা পবিত্রভূতের ভূমিকা ছিলো; হয়তো তাও করছে না, এমনও হ'তে পারে আজকাল নিজেদের আঙুলের ঘর্ষণেই কাজের মেয়েদের জরায়ুতে এসব বস্তু দেখা দিচ্ছে। মেয়েটি ফাঁসি দিয়ে মরেছে, দড়িটা বেশ উৎকৃষ্ট, ছিঁড়ে পড়ে নি, ভোরে নামাজ পড়তে উঠে বেগম মজুমদার দেখেন মেয়েটি বারান্দায় ঝুলছে। পুলিশ শুরুতে অন্য কথা বলার চেষ্টা করেছিলো, পুলিশের মতো কথা বলার চেষ্টা পুলিশ করবেই, কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। প্রমাণ না হয়ে উপায় নেই, সকালে বাড়ির সামনের রাস্তায় গাড়ির যে-ভিড় হয়েছে তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে কাজের মেয়েটি নিশ্চিতভাবে আত্মহত্যা করেছে। মজুমদার সাহেবের ড্রয়িংরুম আর

বারান্দা ভ'রে আছে প্রমাণে; সেখানে হাঁটছে, ব'সে আছে, কথা বলছে উদ্দিন মোহাম্মদের দুটি মন্ত্রী, আর পাঁচ-সাতটি দলের গোটা বিশেক নেতা, যাদের কেউ মুক্তিযুদ্ধ করছে এখনো, কেউ আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কেউ গণতন্ত্র ও গণমানুষ ছাড়া কিছু বোঝে না, এবং পাঁচজন রয়েছে, যারা মুক্তিযুদ্ধটুদ্ধ স্বাধীনতাটাধীনতায় বিশ্বাস করে না, একটা পাকস্থান বানানোর জন্যে লড়াই ক'রে চলছে। পাড়ার যুবরাজরা রয়েছে ঘরবাড়ি ভ'রেই, মজুমদার সাহেবকে সহানুভূতি জানাচ্ছে তারা আন্তরিকভাবে; মজুমদার সাহেবকে থানায় যেতে হবে না, তবে ব্যাংকে যেতে হবে, যদিও তিনি নিশ্চয়ই যাবেন না, যুবরাজদেরই কেউ যাবে। বাড়িটি হয়ে উঠেছে এক বহুদলীয় সমাবেশস্থল; রাশেদ মনে করতো এরা মুখ দেখে না পরস্পরের, এখন মনে হচ্ছে পরস্পরের মুখ না দেখে এরা থাকতে পারে না, মেয়েটি আত্মহত্যা ক'রে ভোরবেলা এদের কাছাকাছি আসার ব্যবস্থা করেছে ব'লে মেয়েটির কাছে এরা যেনো কৃতজ্ঞ। মেয়েটি আত্মহত্যা না করলে আজ ভোরে মজুমদার সাহেবের বাসায় আসা হতো না রাশেদের, কয়েক বছর পাশাপাশি থেকেও আসা হয় নি; মেয়েটি ম'রে আজ ভোরবেলা রাশেদের হাতে জ্ঞানের অনেকগুলো নুড়ি তুলে দিয়েছে; বুঝিয়ে দিচ্ছে সে আর তার মতো সাধারণ মানুষের বিশ্বাসগুলো খুবই হাস্যকর, নেতারা কাজ করে নেতাদের মতো, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অনুসারে করে না, করলে তারা নেতা হ'তে পারতো না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু দিন পর দেখা হলো সেলিমার সাথে; রাশেদ তাকে প্রথম চিনতেই পারে নি, কাজের মেয়েটির কথা ভাবছিলো ব'লে বা মজুমদার সাহেবের বাসায় অতোগুলো নেতা দেখেছে ব'লে নয়, যখন চিনতে পারলো তখন একটা ধাক্কা খেলো। সেলিমাকে দেখা আনন্দের ব্যাপার ছিলো, সে নিজেও বুঝতে সেটা, ব্যবহারও করতো; বাহু একটু বেশি দেখাতো, ওর বাহু সুন্দর ছিলো, যদিও বুক দেখাতো না, ব্লাউজের নিচপ্রান্তের নিচের ঢেউগুলো তার সুন্দর দেখাতো। তার চেয়ে সুন্দর ছিলো তার প্রগতিশীলতা, সমাজতন্ত্র আর মুক্তিযুদ্ধের কথা তার লাল ঠোঁট থেকে যখন ঝরতো চারপাশ রঙিন হয়ে উঠতো। সে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতো, তারপর মার্কিনদেশে চ'লে যায়, অনেক বছর তার খবর রাখে নি রাশেদ। সেই সেলিমা দেশে ফিরেছে, ডক্টরেট করেছে, পদার্থবিজ্ঞান পড়াচ্ছে, হয়তো ক্লাশে গিয়ে আর পড়াচ্ছে না; সেলিমা এখন আপাদমস্তক কালো বোরখায় নিজেকে ঢেকেছে, গলায় কারুকাজকরা চাদর ঝুলিয়েছে, কথায় কথায় ইনশাল্লা আলহামদুলিল্লা বলছে, মওলানা সাহেব মনে হচ্ছে তাকে। তার মুখোমুখি বসতে কেমন কেমন লাগছে রাশেদের, বমি এসে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। ডক্টরেট ক'রে সে মার্কিনদেশে থাকে নি, টাকাপয়সা সেও চেনে, সেখান থেকে পড়াতে চ'লে গিয়েছিলো রিয়াদে, পাঁচবার হজ করেছে, খুব পরহেজগার স্ত্রীলোক হয়ে ফিরে এসেছে, কেউ দোজখের দ্বারে এখন দাঁড়ালে সেখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা একটি কমেছে দেখতে পাবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি পরহেজগার স্ত্রীলোক পেয়ে ধন্য

বোধ করছে, বিজ্ঞানের দরকার নেই, পরহেজগার স্ত্রীলোকই বেশি দরকার, যতো বেশি উৎপাদন হয় ততোই মঙ্গল। মার্কিনদেশে সেলিমার কোনো প্রেমকামিক ছিলো না, রাশেদের মনে প্রশ্ন জাগে, মার্কিন প্রেমকামিক? বাঙালি মেয়েরা বিদেশে গিয়ে বিদেশি প্রেমকামিকই পছন্দ করে, পুলকের পরিমাণ বেশি হয়, দেশি ছোকরাগুলো বেশিক্ষণ পারে না; আর দেশে ফেরার পর কোনো কেলেঙ্কারিও হয় না। রিয়াদে যাওয়ার আগে দেশে এসেছিলো সেলিমা বিবি হওয়ার জন্যে; গিয়ে পরহেজগার হয়ে ফিরেছে, বেহেশতে একটা স্ত্রীলোকের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বেড়েছে, তবে বেহেশতে স্ত্রীলোকের জায়গাটা কোথায় রাশেদ এখনো ঠিক ক'রে উঠতে পারে নি। কিন্তু প্রগতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, যার কথা সেলিমা উঁচু গলায় বলতো? তার সারা শরীর ঢেকে আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, আর ভেতরটাও নিশ্চয়ই ওই চেতনায় পরিপূর্ণ। রাশেদ জানতে চায় এমন কিম্ভুত বদল ঘটলো কী ক'রে? শুনে খুব ক্ষুব্ধ হয় আলহজ ডক্টর সেলিমা, কয়েকবার তওবা তওবা করে, তারপর বলে হজ করতে গিয়ে তার হৃদয়ে মহাপরিবর্তন ঘটেছে, বিজ্ঞান দিয়ে কিছু হবে না। সে এখন খাঁটি মুসলমান, রাশেদ যে মুসলমান হয়ে ওঠে নি এতে সে আঁতকে উঠে কয়েকটা দোয়া প'ড়ে ফেললো। আলহজ সেলিমাকে রাশেদ জিজ্ঞেস করে, এখন ক্লাশে কী পড়ান, রোজা নামাজ হজ জাকাত পতিসেবা? চিৎকার ক'রে উঠে যায় আলহজ সেলিমা, সে একটা কাফেরের সাথে কথা বলতে চায় না।

বাসায় ফিরে রাশেদ শোনে দুপুরে একটি ছেলে পাড়ার শান্তিশৃঙ্খলা কয়েক মিনিটের জন্যে বিপন্ন ক'রে তুলেছিলো। মজুমদার সাহেবের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে সে 'রাজাকারের বিচার চাই' ব'লে চিৎকার করে, রাস্তাটিতে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দিন যতোই যাচ্ছে যাকে তাকে রাজাকার বলা স্বভাবে পরিণত হচ্ছে কিছু ছেলের, পথে পথে রাজাকার দেখতে পাচ্ছে তারা, পিতার মুখেও তারা হয়তো রাজাকার দেখতে পায়, দেশের অভিভাবকদের মুখেও দিনরাত রাজাকার দেখে। রাজাকার শব্দটা উচ্চারণ করতে রাশেদ পছন্দ করে না, কোনো কোনো পশুর নাম নিতে যেমন তার ঘেন্না লাগে; তবে ওই ছেলেদের রাশেদ দোষ দিতে পারে না, সেও তো তা-ই দেখছে, যদিও একাত্তরে সে এতো রাজাকার দেখে নি। একাত্তরের রাজাকারগুলো অনেক ভালো ছিলো আজকেরগুলোর থেকে, সেগুলোর ছদ্মবেশ ছিলো না, দেখলেই চেনা যেতো; আজকেরগুলো ব্ল্যাকম্যাজিক চলচ্চিত্রের শয়তানের মতো, প্রথম যখন দেখা হয় মনে হয় একান্ত আপনজন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার ভয়ঙ্কর মুখটি দেখা দেয়;-রাশেদ এমন একটির সাথে মাঝেমধ্যে গল্প করতো দেখা হ'লে, কথা শুনে মনে হতো সে মহামুক্তিযোদ্ধা, কিছু দিন পরে রাশেদ বুঝতে পারে সে একটা রাজাকার, যদিও একাত্তরে সে রাজাকার ছিলো না। বিকেলে দরোজায় ঘন্টা বাজে, রাশেদ দরোজা খুলে কয়েকটি তরুণের মুখোমুখি হয়; দেখেই রাশেদের রক্তে ঠাণ্ডা আতঙ্ক বইতে থাকে-হয়তো ভোরে

সে কোনো অপরাধ ক'রে এসেছে মজুমদার সাহেবের বাসায়, এখন এই বিধাতামণ্ডলির কাছে তার কারণ দর্শাতে হবে; কিন্তু তারা মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধার কথা বললে রাশেদ বিস্মিত হয়। যার সাথেই দেখা হয় আজকাল সে-ই মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য গল্প বলে, তার সে যোগ্যতা নেই; ওই মহৎ উদ্যোগে, দশ কোটি মানুষের মতো, সে অংশ নিয়েছে শুধু বেঁচে থেকে; মুক্তিযুদ্ধের বইপত্রও বেশি পড়ে নি, পড়তে পারে নি, ওগুলো মুক্তিযুদ্ধের বই হয় নি ব'লেই তার মনে হয়। যে-কটি বই পড়েছে, তার প্রতিটি শেষ ক'রেই মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে গেলেই কেউ মুক্তিযুদ্ধকে উপলব্ধি করতে পারে না। ছেলেরা বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব'লে একটি কথা তারা খুব শুনছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না তা কী, আসলেই তেমন কিছু আছে কিনা, ছিলো কিনা? রাশেদ খুব বিব্রত হয়, সে কি বলবে এটা সে নিজেও বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না; নাকি বলবে যারা এর কথা বলে তারাও বোঝে না, অন্তত বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যেও অমন কোনো চেতনা নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো কারো কাছে ক্ষমতা, কারো কাছে কোটি টাকা, ব্যাংক উপচে পড়া, গাড়ি, ব্যাংককে প্রমোদ, সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা, আর হজ, ওমরা, মিলাদ। রাশেদ এসব কিছুই বলে না। তার বলতে ইচ্ছে হয় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা দুটিই তার কাছে একই সাথে স্বপ্নলোক ও বস্তুলোকের সামগ্রী; মুক্তিযুদ্ধ এক বাস্তব ঘটনা যা দেশ জুড়ে ঘটেছে, তবে তার চেয়ে বেশি ঘটেছে স্বপ্নলোকে, আর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে বাস্তবে, সে বাস্তব মানুষ, কিন্তু তার বাস্তব রূপের থেকে স্বপ্নলোকের রূপই দখল করেছে আমাদের মন। তাকে যখন বাস্তবে দেখি, তখন স্বপ্ন অনেকটা ভেঙে যায়, সে হয়ে ওঠে আমাদের মতোই সামান্য। শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা সে-ই যে কখনো বাস্তবলোকে ধরা দেয় না, চিরকাল থাকে স্বপ্নলোকে। কিন্তু রাশেদ এসব বলে না, সে শুধু জানতে চায় তার কাছে তাদের আসার আসল উদ্দেশ্য কী?

ছেলেরা তখন আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করে। বেশ ঝানু ছেলেই তারা, রাশেদকে আগে বাজিয়ে দেখে নিয়েই এগোতে চায়, কে জানে রাশেদও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তারা বলে যে মজুমদার সাহেব রাজাকার, একাত্তরে যশোরে কোথাও শান্তিকমিটির সভাপতি ছিলেন, এতেও তারা এতোদিন আপত্তি করে নি, আজো করছে না; তার কাজের মেয়েটি যে আত্মহত্যা করে নি এতে তাদের কোনো সন্দেহ নেই, তাকে খুন করা হয়েছে ব'লেও তারা মজুমদার সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু করছে না। কথা শুনে তাদের খুব চমৎকার ছেলে ব'লে মনে হয় রাশেদের, তার কাছে না এসে তাদের মায়ের বুকের পুষ্টিকর দুগ্ধ খাওয়া উচিত ছিলো এ-বিকেলবেলা, বা স্নানাগারে ঢুকে বিকেলটা তারা উপভোগ করতে পারতো। তারা জানায় তাদের এক বন্ধু দুপুরে 'রাজাকারের বিচার চাই' ব'লে চিৎকার ক'রে বিপদে পড়েছে, তাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। ছেলেটি দুপুরে কয়েকবার চিৎকার দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ক'রে বাসায় ফিরে যায়, কেউ কেউ তার

প্রশংসাও করে অন্তত একজন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে ব'লে; তবে বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পর, সে যখন মায়ের হাতে বাড়া ভাত খাচ্ছিলো-মায়ের হাতের বাড়া ভাত না খেলে আজো সোনার বাঙলার সোনার ছেলেদের পেট ভরে না, পাড়ার যুবরাজরা তাদের বাসায় ঢোকে, মায়ের সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশ হ'লেও ভাবনা কম ছিলো, কিন্তু তাকে নিয়েছে যুবরাজরা, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যুবরাজরা পাড়ার রাস্তা মোটর সাইকেলের শব্দে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলছে, আর তারা, ওই প্রতিবাদকারীর বিবেকসম্পন্ন বন্ধুরা, বিপন্ন বোধ করছে। রাশেদকে তারা একটি কাজের ভার দেয়, তাকে মজুমদার সাহেবের সাথে দেখা ক'রে মুক্ত ক'রে আনতে হবে তাদের বন্ধুটিকে, আর মজুমদার সাহেব যদি চান তবে তারা খত লিখে দিতে প্রস্তুত যে তারা আর তাকে রাজাকার বলবে না। প্রতিবাদকারী ছেলেটির জন্যে খুব মায়া হয় রাশেদের, ছেলেটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিজের বুকের মধ্যে ধারণ না ক'রে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, ও কখনো ক্ষমতায় যাবে না, শক্তিমান হবে না; ওর উচিত ছিলো ওর বন্ধুদের মতো চেতনা ধারণ ক'রে মার বুকের পুষ্টিকর দুগ্ধ খাওয়া। রাশেদ কি এ-বিবেকসম্পন্ন ছেলেগুলোকে বলবে যে তোমাদের কথা শুনে মুগ্ধ হলাম, তোমরা তোমাদের পিতাদেরই যোগ্য সন্তান, আর কিছু দিন পর তোমরাও রাজাকার হয়ে উঠবে, যদি তোমরা একাত্তরে থাকতে তাহলে রাজাকার হ'তে? রাশেদ তা বলতে পারছে না, ওদের বুকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বইছে, যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বইছে রাজনীতিবিদদের বুকে রাশেদের নিয়তি পরিহাসপরায়ণ, একাত্তরে সে রাশেদকে কোনো শান্তিকমিটির সভাপতির কাছে পাঠায় নি, কিন্তু এখন পাঠাচ্ছে যখন চারপাশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জ্বলছে আগুনের মতো।

রাশেদ মজুমদার সাহেবের দরোজায় ঘন্টা বাজালে এক পাড়াযুবরাজ দরোজা খুলে দেয়; এরাই এখন দেখাশোনা করছে মজুমদার সাহেবের, বাজারও সম্ভবত ক'রে দিচ্ছে, ব্যাংকেও হয়তো যাচ্ছে। মজুমদার সাহেবের বসার ঘর থেকে এখনো নেতারা বিদায় নেয় নি, দিন ভ'রেই তারা সঙ্গ দিচ্ছে তাকে; রাশেদ বসার ঘরে ঢুকতেই গোটা দুয়েকের সাথে দেখা হয়ে গেলো, যেগুলোর সাথে অনেক আগে তার পরিচয়ের মতো ছিলো, একটা এখন উদ্দিন মোহাম্মদের একটা মন্ত্রীর সাথে সাথে ফেরে, তারও একটা উপ বা প্রতি হওয়ার খুব সম্ভাবনা, এককালে মাও ছাড়া কোনো গান জানতো না সে, এখন মহামান্য ছাড়া আর কিছু জানে না; আরেকটা এখনো অনবরত মুক্তিযুদ্ধের রূপকথা বলে। দুটিই পাজেরো ক'রে এসেছে, কতো টাকা করেছে রাশেদ জানে না, চর্বির পরিমাণ দেখে কিছুটা অনুমান করতে পারে। যেটার প্রতি বা উপ হওয়ার সম্ভাবনা সেটা এরই মাঝে মন্ত্রীমন্ত্রী ভাব আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ দেখানোর অভিনয় করছে। রাশেদ মজুমদার সাহেবের পাশে ব'সে কথাটি তোলে। একটা রাজাকারকে সে কিছু অনুরোধ করতে যাচ্ছে ভাবতেই অস্বস্তি লাগে রাশেদের, কিন্তু সে-মুহূর্তে

সে শহর ভ'রে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পায়, বুটের আওয়াজ শুনতে পায়, শুনতে পায় পাশের বাড়ির দুটি ছেলেকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে মিলিটারি, দূরে শুনতে পায় একটি যুবতীর চিৎকার, হঠাৎ বোমার শব্দ শোনে এবং চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে; তার মনে হয় ছোটোভাইটিকে ধ'রে নিয়ে গেছে মিলিটারি, সাত দিন ধ'রে কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, মা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, ওই দুষ্ট মুখটি দেখার জন্যে তার বুক ব্যাকুল হয়ে আছে, সে ভাইটিকে খুঁজতে খুঁজতে শেষে দেখা করতে এসেছে শান্তিকমিটির সভাপতির সাথে। রাশেদ আর অস্বস্তি বোধ করে না; সে বলে দুপুরে যে-ছেলেটি বেয়াদবি করেছে, তার বেয়াদবির জন্যে রাশেদ খুব দুঃখিত, ছেলেটি আর কখনো বেয়াদবি করবে না। মজুমদার সাহেব গম্ভীর হয়ে ওঠেন। রাশেদ বলে, ছেলেটিকে ধ'রে নিয়ে গেছে কয়েকটি যুবক, যুবকগুলো নিশ্চয়ই খুব ভালো, পাড়ার ভালোমন্দ তারা তো দেখবেই; মজুমদার সাহেব পাড়ার অভিভাবক, তিনি যদি ব'লে ছেলেটিকে ফেরত এনে দেন, তাহলে সবাই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কথাগুলো বলার সময় রাশেদের মনে হয় সান্ধ্য আইনের মধ্যে ব'সে কথা বলছে সে, চারপাশে মিলিটারি জিপের আর গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, দূরে কোথাও আগুন জ্বলছে, পাশের বাড়িতে সবাই চিৎকার করছে। মজুমদার সাহেব ব্যাপারটি দেখার আশ্বাস দেন, আরো বলেন যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভেবে পাড়ার ছেলেরা যাতে নষ্ট না হয় রাশেদ যেনো একটু লক্ষ্য রাখে। রাশেদ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসে, দুটি যুবরাজ তাকে দরোজা খুলে দেয়। একাত্তর একাত্তর লাগছে রাশেদের, যদিও একাত্তরে সে এমন পরিস্থিতিতে পড়ে নি, কোনো শান্তিকমিটির সভাপতির সাথে দেখা করতে তাকে যেতে হয় নি; মিলিটারির ভেতর দিয়ে চ'লে গেছে, কয়েকটি রাজাকারের সাথে একবার ঝগড়াও করেছে, মনে হচ্ছে এখন সে আরো গভীর একাত্তরে পড়েছে, যখন কোনো স্বপ্ন নেই, যখন কোনো আলো নেই। একাত্তরে স্বপ্ন ছিলো, পোকামাকড়ও স্বপ্ন দেখতো তখন, এখন মানুষও স্বপ্ন দেখে না। সন্ধ্যার বেশ পরে বিবেকসম্পন্ন ছেলেগুলো আবার আসে, রাশেদকে খবর দেয় যুবরাজরা তাদের বন্ধুটিকে বাসার সামনে একটি পাজেরো থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে, সে দাঁড়াতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, তার সারা শরীর কালো হয়ে গেছে। রাজাকারকে রাজাকার বললে তুমি দাঁড়াতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না, শরীর দাগে ভ'রে যাবে, তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রূপ উপভোগ ক'রে ক'রে জর্জরিত হয়ে উঠছে রাশেদ, চারদিকে তার রূপ দেখছে, সে-ই শুধু ওই চেতনা থেকে দূরে ব'লে মনে হচ্ছে, আর সবাই উজ্জীবিত ওই চেতনায়। অনেকের কাছে তাকে বারবার বুঝতে হচ্ছে খালহজ সেলিমাকে তার ওসব কথা বলা ঠিক হয় নি, বুদ্ধিমানের মতো বাঁচতে হবে এখন, প্রগতিশীল শুভানুধ্যায়ীরা তাকে বুঝিয়েছে রোজা নামাজ হজ জাকাতের সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধ নেই, বিরোধ নেই জানালা লাগানো

বোরখার সাথেও, এসবের সাথে মিলন ঘটিয়েই থাকতে হবে। তারাও রাশেদের মতো ভুল বুঝতো এক সময়, এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারছে, নিয়মিত নামাজ পড়ছে, শুক্রবার দল বেঁধে প্রতিযোগিতা ক'রে পড়ছে, মনে শান্তি পাচ্ছে। দেশের দিকে তো তাকাতে হবে, গরিব আর অশিক্ষিত মানুষদের মন জয় করতে হ'লে, এবং তাদের ঠকাতে হ'লে ধর্ম ছাড়া আর কোনো পথ নেই; তারা অন্য কোনো চেতনাই বোঝে না। তারা আর কিছু চায় না; না খেয়ে তারা থাকছে হাজার হাজার বছর ধ'রে, দরকার হ'লে আরো হাজার হাজার বছর তারা না খেয়ে থাকবে, আরো হাজার বছর তারা চিকিৎসা চায় না, ঘর চায় না, তারা চায় শুধু ধর্ম। ধর্মই শুধু শান্তি দিতে পারে। তারা যে খুব শান্তি পাচ্ছে তাদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। রাশেদ দেখতে পাচ্ছে ছাত্ররাও খুব শান্তি পাচ্ছে, জিন্স প'রে বিসমিল্লা ব'লে তারা বক্তৃতা শুরু করছে, কিছু দিন পর সালোয়ারও পরবে, সালামুআলাইকুম ব'লে শেষ করছে, তাতে মুক্তিযুদ্ধের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। ডক্টর জালালের মেয়েটিও কোনো ক্ষতি করে নি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার, ওই চেতনার ক্ষতি কেউ করতে পারে না। ডক্টর জালাল শহীদ হয়েছিলেন, চোদ্দো তারিখে আলবদররা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো, তাঁর লাশটিও পাওয়া যায় নি; তবে তিনি একটা অমর চেতনা রেখে গেছেন। তাঁর লাশ না পাওয়া গেলেও তাঁর ছবি ছাপা হয় ডিসেম্বরে, ওই ছবি ছাপার মধ্যেই ধরা পড়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে আমরা দূরে স'রে যাই নি, তাঁর মেয়েটি যা-ই করুক, আমরা যা-ই করি। ডক্টর জালাল শহীদ হওয়ার আগে থেকেই রাশেদ দেখে আসছে তাঁর মেয়েটিকে, রিনাকে, পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকেই, কোলেও নিয়েছে; দেখতে দেখেতে সে বড়ো হয়ে উঠেছে, সুন্দরও, বেশ মেধাবী, ডাক্তারি পড়ছে। ডক্টর জালালকে যখন বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় আলবদররা, রিনা তাঁর কোলেই ছিলো, মেয়েটিকে তিনি কোলে রাখতেই ভালোবাসতেন। বছর খানেক আগে রাশেদ তাকে দেখে অবাক হয়, আহতও বোধ করে; কালো বোরখা পরেছে রিনা, তার বোরখায় জালের জানালা লাগানো, রাশেদ বুঝতেই পারতো না যদি না মমতাজ বলতো ওই বোরখার ভেতরে রিনা রয়েছে। রিনা নিজেই শুধু ধর্মকর্ম করছে না, মাকেও ধর্মকর্ম শেখাচ্ছে; মা শিখতে রাজি হচ্ছে না ব'লে মাকে সে ছেড়ে যাবে ব'লে হুমকি দিচ্ছে। সে পাঁচ সাত বেলা নামাজ পড়ছে, রোজা রাখছে মাঝেমাঝেই; ডাক্তারি বইয়ের থেকে বেশি পড়ছে কোরানহাদিস, কিনতে হচ্ছে না, পাওয়া যাচ্ছে নানা দিক থেকে। এ-বছর সে পাশ ক'রে বেরিয়েছে, কয়েক দিন আগে সে বিয়ে করেছে একটি আলবদরের ছেলেকে, বিয়ে ক'রে বাসায় ফেরে নি, আলবদরটির বাসায় গিয়ে উঠেছে। ছেলেটা এখনো পাশ করে নি, ছেলেটাকে রাশেদ দেখেছে একদিন। বেশ দাড়ি রেখেছে সে, যদিও ওর আলবদর বাপটা এখনো দাড়ি রাখে নি, কিন্তু ছোকরাটা দাড়ির দৈর্ঘে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে[illegible] বেগম জালাল মেয়ের মুখ দেখেন নি, মেয়েও মায়ের মুখ দেখতে চায় না, মাকে তার মুসলমানই মনে হয় না। এটা তো

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ, এমন বিকাশই ঘটছে চারদিকে, এমন বিকাশ দেখেই শান্তিতে থাকতে হবে রাশেদকে। রাশেদকেও একটু রোজানামাজে মন দিতে হবে, পকেটে একটা টুপি রাখতে হবে।

মমতাজের একটি মামাতো না খালাতো না চাচাতো ভাই যেনো দেশে ফিরেছে, এক যুগ প'ড়ে ছিলো মানচেস্টার না ব্র্যাডফোর্ড না কার্ডিফ না কোথায়, দেখা করতে এসেছে রাশেদের সাথে, দেখেই রাশেদ মুগ্ধ হলো, অদ্ভুত জীবের মতো লাগছে তাকে। মাথায় লম্বা চুলও রেখেছে, আবার শরীর ভ'রে স্যুটকোটের বাহারও দেখার মতো, নতুন কিনেই গায়ে চাপিয়ে প্লেনে উঠেছে মনে হচ্ছে, ঝকঝক করার চেষ্টা করছে, কিন্তু মনে হচ্ছে বাঙলাদেশেরই কোনো মফস্বল, ভুরুঙ্গামারি ছাগলনাইয়া ঝালকাঠি, থেকে এসেছে; বাঙলাটা আগের যে-আঞ্চলিক ছিলো এখন তার থেকেও আঞ্চলিক হয়েছে, মাঝেমাঝে ইংরেজি বলছে, তাও ওখানকার কোনো অঞ্চলের। আনন্দের কথা বাঙালি পৃথিবীর যেখানেই যাক বাঙালিই থাকে, নিউইঅর্ক শিকাগো লন্ডনকে বাঙলাদেশের মফস্বল শহরে পরিণত করে; পৃথিবীর বাইরেই থেকে যায়। জনাব দ্যাশে ফিরতেনই না, ফিরেছেন দয়া ক'রে, বিবাহ করার জন্যে; তিনি একটি সতীসাধ্বী গৃহকর্মনিপুণা পরহেজগার বিবি সংগ্রহের জন্যে দ্যাশে ফিরেছেন। কোনো বিদেশিনী বা বাঙালি বা ভারতি মেয়েকে তিনি কেনো বিয়ে করলেন না, রাশেদ জানতে চায় তার কাছে; সে অনেকটা নাউজুবিল্লা নাউজুবিল্লা ক'রে ওঠে। দেশে থাকার সময় সে বিশেষ খাঁটি মুসলমান ছিলো না, এখন বিলেতে মুসলমান ভাইদের সাথে খাঁটি মুসলমান হয়ে উঠেছে, দাড়ি এখনো রাখে নি হয়তো ফিরে গিয়ে রাখবেন, নামাজটা ঠিক মতো আদায় করেন, রোজা রাখেন। সে বলে যে বাঙালি মাইয়াগুলিন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ওই দ্যাশে, যার তার সাথে ঘুমোয়, বিদেশিদের সাথেই বেশি ঘুমোয়, ওই রকম মাইয়ালোক তিনি বিয়ে করতে পারেন না। তিনি একটি অক্ষত মেয়েলোক চান, যার ভেতরে তিনিই প্রথম ঢুকবেন, হয়তো ঢোকার আগে খুঁজে দেখে নেবেন পাতলা পর্দাটা ঠিকঠাক আছে কিনা। কিন্তু তিনি যে এক যুগ ধ'রে ওখানে প'ড়ে আছেন, তিনি এতোদিন চালিয়েছেন কীভাবে, দোয়া প'ড়ে ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়েই কি চালিয়ে দিয়েছেন? গার্লফ্রেন্ড টার্লফ্রেন্ড কি একেবারেই জোগাড় করতে পারেন নি, এমনকি কোনো আইরিশ পতিতা, বা দু-একটা বাঙালি মেয়ে? তা তিনি জোগাড় করেছেন, তিনি একেবারে নপুংসক নন; একটা গ্রিক মাইয়ালোকের সাথে তিনি কয়েক মাস ছিলেন, একটা ইউরেশীয় মেয়ের সাথেও তিনি ছিলেন বছরখানেক, দু-তিনটা বাঙালি মুসলমান মেয়ের সাথেও তিনি ঘুমিয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে, স্বীকার করতে চাইছেন না, তবে তার হাসি থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তিনি মাইয়ালোকের সাথে ঘুমোতে পারেন, কিন্তু নিকা করতে পারেন না; যে-মাইয়ালোক পরপুরুষের সাথে ঘুমোয় অমন নষ্ট মেয়েলোককে তিনি শাদি করতে পারেন না। তবে ওই

মেয়েলোকগুলোকে কি তিনি বদল করেছেন, না ওই নষ্ট মেয়েলোকগুলোই তাকে ছেড়ে গেছে? মেয়েলোকগুলোই তাকে ছেড়ে গেছে, ওইগুলো খানকিই, একজনকে নিয়ে থাকতে পারে না; আর তাদের সাথে তিনি পেড়ে ওঠেন নি। বাঙালি মেয়েগুলোও ওখানে গিয়ে রাক্ষুসী হয়ে গেছে, কিছুতেই ক্ষুধা মেটে না; একটায় তারা তৃপ্তি পায় না, একটার পর একটা চায়, ঠোঁট চায় মুখ চায় আঙুল চায়; তিনি তা পারেন না। তাই তিনি দ্যাশে ফিরেছেন একটা খাঁটি বাঙালি মুসলমান পরহেজগার বিবি সংগ্রহ করতে।

একটি বই কিনবে ব'লে চৌরাস্তাটায় গিয়েছিলো রাশেদ, বইটা পাওয়া গেলো না; তাতে খুব খারাপ লাগলো না তার, সে জানে বহু শ্রেষ্ঠ বই সে কোনোদিন প'ড়ে উঠতে পারবে না, হাতের কাছে পেয়েও বহু অমর বই সে পড়ে নি, এটা না পড়লেও তার জীবন অসম্পূর্ণ থাকবে না; তবে দোকানের তাক ভ'রে সাজানো রাশিরাশি রঙিন মলস্তূপ, উপচে উছলে পিছলে পড়ছে, চারপাঁচটি বালকবালিকা এসেই একটার পর একটা মলস্তূপের নাম বলতে লাগলো, আরো মলস্তূপ যার নাম তারা জানে না বেরিয়েছে কিনা, কবে বেরোবে, কেনো বেরোচ্ছে না বারবার জানতে চাইলো। মলত্যাগকেরা কেনো আরো বেশি ক'রে মলত্যাগ করছে না, তারা আরো বেশি মলত্যাগ না করলে এই বালকবালিকারা কী ভোজন ক'রে বাঁচবে? রাশেদ দোকান থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরছিলো, কয়েকটি বোমা ফাটার শব্দ পেলো, ছাত্রাবাসগুলোতে ছাত্ররা গণতন্ত্রের প্রস্তুতি নিচ্ছে; শব্দ শুনলে একাত্তর থেকেই সে আঁতকে ওঠে, আজো আঁতকে উঠলো, কিন্তু অন্যদের মতো সেও আর ভয় পায় না। হাঁটতে হাঁটতে সে একটি মসজিদের পাশের ফুটপাতে এসে উঠলো; মসজিদটিকে ঘিরে নানা রকমের দোকান, কয়েকটা বইয়ের দোকানও আছে, মুসলমানদের এটা রাশেদের খুব ভালো লাগে যে তারা আধ্যাত্মিকতাকে পার্থিবতা দিয়ে ঘিরে রাখে; এক অনুরাগী যুবক বেশ আগে তাকে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় সাবধানে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো। সাবধানে যাওয়া কেনো সাবধানে কোনো কিছু করাই এখনো সে শিখে ওঠে নি, উঠবে ব'লেও মনে হচ্ছে না, তবে ছেলেবেলায় যেমন একটা গাবগাছের আর একটা তেঁতুলগাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ সাবধান হয়ে পড়তো কে একজন তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলো ব'লে, এখানে এলেও সে সাবধান হয়ে পড়ে, সেই ছেলেটিকে মনে পড়ে, আজো তেমন হলো। কয়েকটি যুবক তার দিকে এগিয়ে আসে, পোশাকে আর মুখাবয়বে দেখতে বেশ ধার্মিক, সামনের ছেলে দুটির গাল বেশ ভাঙা, কোনো অতিরিক্ত অনৈসলামিক কাজের ফলে হয়তো এ-ধস নেমেছে, তবে হাল্কা দাড়িতে ঢেকে আছে ব'লে বেশ মানিয়েছে। একাত্তরে হয়তো তাদের জন্ম হয় নি, হ'লেও চারপাঁচের বেশি বয়স হবে না, তবে এখন মনে হচ্ছে বারো তেরো শো বছর বয়স হবে, তারও বেশি হ'তে পারে। একটি ছেলে তাকে একটা সম্পূর্ণ সালাম দেয়, যা সে অনেক দিন শোনে নি, এখন

সংক্ষিপ্ত সালামই রীতি, রাশেদ মাথা নেড়ে সালাম নেয়। সামনের ছেলেটি বলে, শুনছিলাম আপনে মুসলমান না, এখন ত দ্যাখতে পাইতাছি মুসলমানই, তবে মুখ খুইল্যা হাত তুইল্যা সালাম লইতে শিখবেন। রাশেদ বিব্রত হয়ে দাঁড়ায়, ছেলেগুলোকে একবার দেখে নেয়, এবং বলে যে আজকাল ভুল সংবাদই বেশি প্রচার পাচ্ছে, তাতে কান দেয়া ঠিক নয়। আরেকটি ছেলে বলে, ভুল খবর আমরা রাখি না, খাঁটি খবরই রাখি, সাবধান হইয়া যান, চইদ্দই ডিশেম্বর আবার আসব, লিস্টিতে নাম আছে। রাশেদ জানতে চায় তাকে কী করতে হবে? একটি ছেলে বলে, রোজানামাজ কইরেন, আর মুক্তিযুদ্ধ প্রগতিফ্রগতি ছাইরা দেন। আরেকবার যখন সময় আসব পলাইবার পথ পাইবেন না। রাশেদ তাদের বলে পালানোর কথা সে কখনো ভাববে না, আরেকবার সময়ও আসবে না। রাশেদ তাদের জিজ্ঞেস করে আধুনিক সময়ের মানুষ হয়ে তারা কেনো মধ্যযুগে চ'লে যাচ্ছে? ছেলেটি বলে, আমাদের সঙ্গে আপনেরেও মধ্যযুগে যাইতে হবে বাঁচতে চাইলে। রাশেদ বলে, তার সম্ভাবনা নেই, মধ্যযুগে যেতে হবে না ব'লেই সে বিশ্বাস করে, সে সামনের দিকেই যাবে। এমন সময় দুটি ছেলে রিকশা থেকে নেমে রাশেদের পাশে দাঁড়ায়, রাশেদ তাদের চেনে না, তবে তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় ৩০৩ রাইফেল দিয়ে তারা একটি দেশকে স্বাধীন করতে পারে, আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারে ৯৩ হাজার মধ্যযুগকে। তাদের দেখে মধ্যযুগের প্রতিনিধিরা মসজিদের চারপাশের দোকানগুলোতে ঢুকে পড়ে, রাশেদ ছেলে দুটিকে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে।

৯ বিলু আপার জন্যে তেলইর পানি

বিলু আপা, আর পুষু আপা পারুল আপা, দিন দিন ক্লান্ত হয়ে উঠছে, আগের মতোই খিলখিল ফিসফিস করে তারা, তবে রাশেদের মনে হয় তাদের খিলখিল হাসিতে ক্লান্তি ধরেছে, ফিসফিস কথায় বিষণ্নতা লেগেছে, শাড়ির পাড়ে বিষণ্ন ক্লান্তি ভারি হয়ে ঝুলে আছে। তারা খিলখিল করার থেকে এখন ফিসফিসই করে বেশি, তাদের সব কথাই গোপন হয়ে উঠছে, একদিন হয়তো ফিসফিসটুকুও করবে না তারা, একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। গ্রামে কোনো মেয়ের বিয়ে হ'লেই তারা আরেকটুকু ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কোনো মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে শুনলে খুব বিব্রত হয়ে পড়ে তারা, মুখ তুলে তাকায় না, মাটির দিকে চেয়ে থাকে, একটা দীর্ঘশ্বাস কোমলভাবে চেপে ফেলে। বিলু আপা যে কতো দীর্ঘশ্বাস চেপেছে তার হিশেব নেই কোনো, অথচ রাশেদ আজো একটাও দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি, চাপার কথাই ওঠে না; রাশেদ জানেই না কোথা থেকে কতো গভীর থেকে উঠে আসে দীর্ঘশ্বাসগুলো, আর কতোটা ঠাণ্ডা আর ভারি ক'রে তোলে বুক। এগুলো যে খুব ঠাণ্ডা, বরফের থেকেও, তা বুঝতে পারে রাশেদ বিলু আপার মুখের দিকে চেয়ে।

বাড়িতে যেই আসে সে-ই দু-এক কথার পরই তোলে বিলু আপার বিয়ের কথা, বিলু আপার এখনো যে বিয়ে হয় নি তাতে খুব অবাক হয়; শুনে মা এলোমেলো কথা বলে, বিলু আপাকে আর ধারেকাছেই পাওয়া যায় না। রাশেদেরও খুব খারাপ লাগে এসব কথা শুনলে, সে একবার এক বুড়িকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলো; -বুড়ি এসেই ঘরের দরোজায় পিঁড়িতে ব'সে মাকে বলে যে মেয়েটাকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে না কেনো, বিয়ে হ'লে তিন পোলার মা হ'তে পারতো, সে নিজে এ-বয়সে তিনটা পোলা বিইয়েছিলো। সে জানতে চায় মেয়েটাকে ঘরের থাম ক'রে রাখার ইচ্ছে আছে কিনা। রাশেদের মার সম্পর্কে শাশুড়ি হয় বুড়িটা, তাই মা কিছু বলতে পারছিলো না, শুধু একটা জামাই দেখার কথা বলছিলো, বলতে গিয়ে মার কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠছিলো ; কিন্তু রাশেদ সহ্য করতে পারে নি, সে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলো বুড়িকে; বলেছিলো, এসব বলার জন্যে আপনি আমাদের বাড়ি আসবেন না। বিলু আপা তাতে সুখী হয়েছিলো মনে হয়, রাশেদকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিলো আমগাছের পাশে, বলেছিলো রাশেদ খুব ভালো, তবে ওই বুড়িটুড়ির মতো মানুষের সাথে ঝগড়া করার দরকার নেই। মেয়েদের এসব কথা চিরকালই শুনতে হয়, মেয়েদের অপরাধের কোনো শেষ নেই। বিলু আপার যে বিয়ে হচ্ছে না এটা তো ভালোই লাগে রাশেদের; আর আজিজের কাছে ওইসব শোনার পর থেকে রাশেদের ইচ্ছে হয় বিলু আপার যেনো কোনো দিন বিয়ে না হয়। বিলু আপা একটা অচেনা লোকের সাথে শোবে এটা ভাবতে তার শরীর ঘিনঘিন ক'রে ওঠে, প্রথম যখন আজিজের কাছে শুনেছিলো তখন খুব বেশি ঘেন্না লেগেছিলো; এখন ঘেন্নাটা ক'মে এসেছে, বিয়ে হয়ে গেলে সে কষ্ট পাবে, কিন্তু কষ্টটা সহ্য করতে পারবে, তবে বিয়ে যে হচ্ছে না এটা বেশ লাগছে তার। বিলু আপার ক্লান্তি আর বিষণ্নতা রাশেদকে খুব কষ্ট দেয়, ভাত খেতে ব'সে তার মনে হয় বিলু আপার মাজা পেতলের থালাটি ভ'রে ক্লান্তির ছাপ লেগে আছে, সে বিলু আপার আঙুল দিয়ে মেখে দেয়া বিষণ্ন ক্লান্তির ওপর ভাত মাছ দুধ রেখে খাচ্ছে। সে বিলু আপার ক্লান্তি খাচ্ছে বিষণ্নতা পান করছে।

বিলু আপা কি দেখতে খারাপ? রাশেদের তো তা মনে হয় না, বিলু আপাকে রাশেদের মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর, অমন সুন্দর সে বেশি দেখে নি, কুমড়োডগার মতো সুন্দর বিলু আপা। তার গায়ের রঙের কথা ওঠে, রঙটা ফরশা নয় ব'লে অনেকেই সুন্দরী মনে করে না তাকে; গাল ভাঙা নাক বাঁকা ঠোঁট উল্টোনো মেয়েদেরও সবাই মনে করে সুন্দরী গায়ের রঙ ফরশা হ'লে, কিন্তু বিলু আপা এতো সুন্দর তবু তাকে সুন্দরী মনে করে না লোকেরা রঙটা ফরশা নয় ব'লে। ফরশাই কি সুন্দর? পাশের বাড়ির বউটি দেখতে বাঁশপাতার মতো, গালে একটা দাগ, কিন্তু রঙটা ফরশা, তাই সবাই তাকে সুন্দরী ব'লে, আর সেও গর্ব করে; রাশেদ তার দিকে তাকাতেই পারে না, মনে হয় একটি শাদাপেত্নী দেখছি। অনেক মাস কোনো প্রস্তাব আসে নি বিলু আপার জন্যে, বছরখানেক আগে একটি

এসেছিলো, রাশেদই বাতিল ক'রে দিয়েছিলো সেটা। একটি প্রস্তাব এসেছিলো অনেক দূরের গ্রাম থেকে, রাশেদকে তারা নিয়ে গিয়েছিলো বাড়িঘর দেখাতে, রাশেদ বাড়িঘর আর লোকটিকে দেখে এসে বিয়েতে মত দেয় নি। তার কিছুই পছন্দ হয় নি, লোকটিকে পছন্দ হয় নি একেবারেই। রাশেদ মাঝেমাঝে ভাবে লোকটি কি খুব খারাপ ছিলো? কখনো তার মনে হয় খুব খারাপ ছিলো না, আবার মনে হয় খুব খারাপ ছিলো, ওই লোকটি বিলু আপার পাশে ঘুমোবে এটা ভাবতে তার ঘেন্না লেগেছিলো। লোকটি রাশেদকে খুব আদর করেছিলো, বাজারে নিয়ে মিষ্টি খাইয়েছিলো, নতুন শার্ট বানিয়ে দেবে ব'লে দর্জির দোকানে নিয়ে গিয়েছিলো, দর্জিটা খুব সুন্দর একটা কাপড় বের করেছিলো, কিন্তু রাশেদ রাজি হয় নি মাপ দিতে; তাদের বাড়িতে দু-তিন দিন থাকার জন্যে রাশেদকে বারবার অনুরোধ করেছিলো, রাশেদ থাকে নি। রাশেদ রাজি হ'লে বিলু আপার বিয়ে হয়ে যেতো এতোদিনে, তাহলে তার ক্লান্তি থাকতো না বিষণ্ণতা থাকতো না। রাশেদের মনে হচ্ছে একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছে সে, আবার মনে হচ্ছে না ওই লোকটির সাথে বিয়ে হ'তে পারে না বিলু আপার। বিলু আপা কি মনে মনে রাশেদকে দোষ দেয়? না, বিলু আপা রাশেদকে দোষ দিতে পারে না, বিলু আপা তো তাকে বলেছে সে পছন্দ না করলে বিলু আপাও পছন্দ করবে না, রাশেদ পছন্দ করলেই তার পছন্দ হবে। বিলু আপা নিজের পছন্দ মতো কিছুই করে না, মার আর বাবার পছন্দ মতো করে, এমনকি রাশেদের পছন্দ মতো করে। তার কি পছন্দ নেই? বিলু আপা বলে মেয়েদের আবার পছন্দ কি? বিলু আপা চার বছরের বড়ো রাশেদের থেকে, কিন্তু রাশেদের মনে হচ্ছে বিলু আপা রাশেদের থেকে ছোটো হয়ে যাচ্ছে দিন দিন; আগে বিলু আপার কথা মতো চলতো রাশেদ, এখনো বিলু আপা চলতে চায় রাশেদের কথা মতো; সব কিছুতেই বলে, তুই বল। রাশেদ যা বলে তাই হয়, তাই করে বিলু আপা, রাশেদকে কিছু করতে আর বলে না।

পুব পাড়ার মরির বিয়ে হ'তে যাচ্ছে, সংবাদটি রাশেদ জানতো না, জানার কথা নয়; খুব গরিব ওরা, ওদের বাড়িতে রাশেদ কখনো যায় নি, মেয়েটির নামও শোনে নি, এই প্রথম শুনলো। রান্নাঘরের উত্তর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো রাশেদ, শুনতে পেলো বড়ো আম্মা মাকে বলছে পুব পাড়ার মরির বিয়ে হবে তিন চার দিনের মধ্যে; তবে মাকে একটি সংবাদ দেয়ার জন্যেই সে কথাটি বলছে না, বলার পেছনে লুকিয়ে আছে একটি উদ্দেশ্য, যা তার গলার স্বরে ধরা পড়ছে। সে বুড়ো মানুষ, তার কেউ নেই; সে থাকে রাশেদদের সাথেই, তারা তাকে বড়ো আম্মা বলে, সারা গ্রাম ভ'রে সে ঘোরে, যা পায় তাই নিয়ে আসে, ভীষণ আদর করে রাশেদ আর তার ভাইবোনদের। বিলু আপার বিয়ের জন্যে তারও চিন্তার শেষ নেই। সে বলছে মরির বিয়ে হবে, মরির তেলইর-গায়েহলুদের-পানি চুরি ক'রে এনে সে-পানি দিয়ে গোশল করাতে হবে বিলু আপাকে, তাহলে বিয়ের ফুল ফুটতে দেরি হবে না। শুনে রাশেদ খুব আহত বোধ করে। কোনো মেয়ের তেলইর পানি

দিয়ে যে-মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না তাকে গোশল করালে নাকি তাড়াতাড়ি বিয়ে হয় তার, এমন কথা রাশেদ শুনেছে, কিন্তু সে কখনো ভাবতে পারে নি বিলু আপাকেও অমন পানি দিয়ে গোশল করতে হবে। বিলু আপা কি রাজি হবে মরির তেলইর পানি দিয়ে গোশল করতে? রাশেদ যদি মেয়ে হতো, সে কি রাজি হতো অন্যের তেলইর চুরি করা পানি দিয়ে গোশল করতে? কথাটি শুনে কাঁপছে রাশেদ, আর কেমন লাগছে বিলু আপার, সে তো রান্নাঘরেই আছে ব'লে মনে হচ্ছে। বিলু আপাও কি তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার জন্যে গোশল করতে চায় মরির তেলইর পানি দিয়ে? মরি যদি খাঁ-বাড়ির মেয়ে হতো, তাহলে না হয় কথা ছিলো; মরির বাবা কামলা খাটে, তার মেয়ের তেলইর পানি দিয়ে গোশল করতে হবে বিলু আপাকে? মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে রাশেদের। মা জানতে চাইছে কীভাবে পাওয়া যাবে পানি, কে এনে দেবে, আর চুরি ক'রে পানি আনতে গিয়ে ধরা পড়লে খুব লজ্জার কথা। বড়ো আম্মা মাকে বলছে পানি সে-ই চুরি ক'রে এনে দেবে, চুরি ক'রেই এই পানি আনতে হয়, চেয়ে আনলে কাজ হয় না। ধরা পড়লে অবশ্য খুব অপমান। তেলইর দিন উঠোনে বালতি ক'রে পানি আর তার পাশে তেল হলুদ দুর্বা কী সব দুপুর ভ'রে রেখে দেয়া হয়; সেখান থেকে পানি চুরি ক'রে আনতে হয়, এনে সে-পানি দিয়ে সন্ধ্যার পরে বড়ো ঘরের পশ্চিম কোণে দাঁড় করিয়ে গোশল করাতে হয় আইবুড়ো মেয়েকে। মাকে বড়ো আম্মা কথা দিচ্ছে সে তেলইর দিন ঠিকই পানি নিয়ে আসবে, কেউ তাকে দেখতে পাবে না। রাশেদের ভয় লাগতে থাকে বড়ো আম্মা পানি চুরি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেছে, সবাই জিজ্ঞেস করছে কার জন্যে সে পানি চুরি করছে, সে বিলু আপার নাম বলছে, সবাই বিলু আপাকে আইবুড়ি ব'লে গাল দিচ্ছে।

রাশেদ ভেবেছিলো বিলু আপা রাজি হবে না মরির তেলইর পানি দিয়ে গোশল করতে, তার ঘেন্না লাগবে, অপমান লাগবে। রাশেদ খুব উদ্বেগের মধ্যে থেকেছে দুটি দিন, বড়ো আম্মা যদি ধরা পড়ে, বিলু আপা যদি রাজি না হয়, তখন কেমন হবে; আর যদি বড়ো আম্মা ঠিকই পানি নিয়ে আসে, বিলু আপাও রাজি হয় ওই পানিতে গোশল করতে, তাহলেও তার রক্তে কাঁটা বিঁধতে থাকবে। তখন সন্ধ্যা গভীর হয়েছে, রাশেদ পড়ার টেবিল থেকে শুনতে পাচ্ছে বড়ো আম্মা আর মা ডাকছে বিলু আপাকে। সন্ধ্যার পরেই রাশেদ ঘরের পশ্চিম কোণায় দেখেছে এক বালতি পানি, তার পর থেকেই তার মন অস্থির হয়ে আছে, সে পড়তে পারছে না, খুব অপমান লাগছে। বিলু আপা বড়ো আম্মা আর মায়ের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, ঘরের কেবিনে চুপ ক'রে ব'সে আছে; বড়ো আম্মা কেবিনে ঢুকছে বিলু আপাকে বের ক'রে আনার জন্যে, রাশেদ পড়তে পারছে না, তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে নিঝুম হয়ে যাচ্ছে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে আসছে বিলু আপা রাশেদ দেখতে পাচ্ছে তার পড়ার টেবিল থেকে, তার ইচ্ছে হচ্ছে উঠে গিয়ে বিলু আপাকে জড়িয়ে ধ'রে ফেলতে, যাতে সে গোশল করতে যেতে না পারে।

বড়ো আম্মা তাকে ধ'রে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, মায়ের হাতে একটি পেতলের ঘটি, ওই ঘটিটিতেই হয়তো রয়েছে মরির তেলইর পানি, যে-পানি বড়ো আম্মা ছিটিয়ে দেবে বুলু আপার মাথায় মুখে শরীরে, তারপর গোশল করিয়ে দেবে বালতির পানি দিয়ে। বিলু আপা যদি হাত দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘটির পানিটুকু? রাশেদ তাতে খুব খুশি হবে, কিন্তু বিলু আপা তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে না, সে তো শেষে সবই মেনে নেয়। বিলু আপা গোশল ক'রে ঘর ঢুকে যখন চুল আঁচড়াচ্ছে তখন রাশেদ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তার মুখটিকে বিষণ্ন দেখালেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে বিলু আপা বিশ্বাস করছে এতে তার বিয়ে হবে। রাশেদের মুখ দেখেই বিলু আপা বুঝতে পেরেছে রাশেদ কিছু জানতে চায়; বিলু আপা বললো, মেয়েদের কতো কিছুই করতে হয়, আরো কতোবার যে পরের পানিতে নাইতে হবে। বিলু আপার কথাই ঠিক হলো, গ্রামে পর পর কয়েকটি মেয়ের বিয়ে হলো, বড়ো আম্মা প্রত্যেকটি মেয়ের তেলইর পানি চুরি ক'রে আনলো, আর গোশল করাতে লাগলো বিলু আপাকে। এখন আর বিলু আপাকে ডেকে কেবিন থেকে বের করতে হয় না, সন্ধ্যার বেশ পর মা বিলু আপাকে পানিভর্তি ঘটটি দেয়, আর বিলু আপা নিজেই গিয়ে গোশল করে ঘরের পশ্চিম কোণায় দাঁড়িয়ে। গোশলের পর বিলু আপা চুল আঁচড়ায়, কিন্তু রাশেদ আর তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না; কিন্তু বিলু আপা তার পড়ার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, তোর এতে খুব খারাপ লাগে, নারে? রাশেদ মাথা নিচু ক'রে থাকে, তার ভেতর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়, রাশেদ চেপে ফেলে। বিলু আপা রাশেদকে একটি অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছে এর মাঝে, সেটি দীর্ঘশ্বাস, আর দিয়েছে তা চেপে ফেলার বিস্ময়কর শক্তি।

রাশেদ গিয়েছিলো মামাবাড়ি বেড়াতে, সেখানে সবুজ উদ্ভিদের সবুজ জ্যোৎস্নার মধ্যে সে দেখতে পায় এমন এক দৃশ্য, যা অলৌকিক মনে হয় তার, এবং এই প্রথম সে দেখে অলৌকিককে; তার চোখ মন শরীর ভ'রে যায়, যা দেখার স্বপ্ন সে দেখে আসছে রক্তের ভেতরে, কিন্তু দেখতে পায় নি, সে তার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায়। কোনো দেবতাকে দেখলেও সে এমন শিহরিত হতো না। মামাবাড়ি তার ভালো লাগে ওই গ্রামের গাছপালার সবুজ আলো-অন্ধকারের জন্যে; ওই গ্রাম গাছপালার, মানুষের নয়, মানুষ থাকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে গাছপালার আদরে, রাশেদ ওই গ্রামে ঢুকলেই গাছপালা তাকে আদর করতে শুরু করে। দীর্ঘ মোমবাতির মতো শুপুরিগাছগুলোর শীর্ষে জ্বলছে সবুজ শিখা, ঘরগুলো ঢাকা প'ড়ে আছে নারকেল আর খেজুরগাছের আঁচলের নিচে, আমগাছ বাড়িয়ে দিয়েছে বড়ো বড়ো ডাল, শিমুলগাছ ওপরে উঠে গেছে সব গাছ ছাড়িয়ে, কালোসবুজ পাতা ছড়িয়ে স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে গাবগাছ, বাঁশবনে শনশন শব্দ হচ্ছে, বেতগাছ এলিয়ে আছে, গোঁড়ালেবুগাছের ঝোপ থেকে ভেসে আসছে সবুজ গন্ধ, আর রয়েছে গভীর জঙ্গল, যেখানে লুকিয়ে থাকলে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুপুর পেরিয়ে

গেছে, চারপাশে কোমল নিশ্চুপ বিকেল, রাশেদ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একলা হাঁটছিলো; একটা নতুন পথ তৈরি করতে করতে সে হাঁটছে, তার ভালো লাগছে ডাল ডিঙ্গিয়ে আর ডালের নিচ দিয়ে মাথা গলিয়ে চলতে। সে কোথায় যাবে জানে না, হয়তো যাবে না কোথাও, বা যাবে এষাদের বাড়ি। মামাবাড়ি এলেই এষাকে তার মনে পড়ে, মামাবাড়ি এলেই ছোটোবেলা থেকেই সে খেলে এষা আর ফাতুর সাথে। এষা আর ফাতু খুব বড়ো হয়ে গেছে, হঠাৎ বড়ো হয়ে গেছে তার থেকে; ওরা শাড়ি পরে এখন, অথচ রাশেদ হাফপ্যান্ট ছাড়ে নি, বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। সামনে বেতগাছ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা, ঢুকে ব'সে থাকলে কেউ দেখতে পায় না, মাসখানের আগেও রাশেদ সেখানে ব'সে অনেক কিছু ভেবেছে, জায়গাটায় বসলেই ভাবনা আসে। আজো সে কিছুক্ষণ বসবে সেখানে, দেখবে ভাবনা আসে কিনা, নিশ্চয়ই আসবে, নীরব জায়গায় আজকাল একলা বসলেই তার ভাবনা আসে। ওই নিবিড় নিশ্চুপ জায়গাটিতে কারা যেনো ব'সে আছে; রাশেদ উঁকি দেয় বেতপাতার সরু ফাঁক দিয়ে, দেখে এষা আর ফাতু মুখোমুখি ব'সে আছে। শাড়ি পরেছে তারা, তাদের ওপরের দিকটা সম্পূর্ণ উদোম, এষার শরীর ধবধব করছে, এষা কোমলভাবে নাড়ছে ফাতুর দুধ, ফাতু চোখ বুজে আছে, ফাতুও কোমলভাবে ছুঁইছে এষার দুধ, এষা চোখ বুজছে। হাত সরিয়ে এষা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকছে ফাতুর বুকের দিকে, কী যেনো বলছে, ফাতু মিষ্টি ক'রে হাসছে; ফাতু এষার দুধে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে জড়িয়ে ধরলো এষাকে। রাশেদের মনে হলো এই প্রথম সে দেখলো সৌন্দর্য, গোলাপের থেকে আগুনের থেকে চাঁদের থেকে শিশিরের থেকে সুন্দর এ-সৌন্দর্য। ওই সৌন্দর্যকে ঘিরে সময় থেমে আছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে এ-দৃশ্য দেখতে বা তার সব ইচ্ছে তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো;-তার ভেতরে জ্ব'লে উঠলো মোমের শিখা, গলতে শুরু করলো, ফুটতে লাগলো শিউলি, ঝ'রে ঝ'রে পড়তে লাগলো মাটিতে। তার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে, তার প্রতিটি রক্তকণা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে; রাশেদ ব'সে পড়লো, চিবোতে লাগলো একটা ঘাস ছিঁড়ে; সে এষাদের বাড়ি যাবে না, মামাবাড়িও যাবে না, তার খুব দূরে যেতে ইচ্ছে করছে, নদীর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে, মেঘের ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে নিজের রক্তকণিকার থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে যেতে।

ওই সুন্দরের আগুনে যদি তার চোখ পুড়ে যেতো, রক্ত ছাই হয়ে যেতো, সুখ পেতো রাশেদ; কিছুই না পুড়ে তার ভেতরে লাখ লাখ চোখ নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছে ওই সৌন্দর্যের দিকে। চোখ কেনো আরো বেশি ক'রে দেখতে পারে না, চোখ দিয়ে কেনো ছুঁয়ে দেখা যায় না, কেনো স্বাদ নেয়া যায় না চোখ দিয়ে? যদি তার চোখ ছুঁয়ে দেখতে পারতো ওই সৌন্দর্যকে, জিভের মতো স্বাদ নিতে পারতো ওই সৌন্দর্যের, তাহলে হয়তো সে এমন কিছু অনুভব করতো, যাকে বলা হয় সুখ। রাশেদ মামাবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, হাঁটতে থাকে নিজেদের

গ্রামের দিকে, সে দেখতে পায় দুলছে ধবধবে যুগল চাঁদ, বন জুড়ে দুলছে যুগল ফুল। আমি আর আগের মতো নেই, রাশেদ মনে মনে নিজেকে শোনায়, আগের মতো কখনো হবো না, আমি এখন অনেক কিছু জানি, আমি অনেক কিছু দেখেছি, আমি আরো অনেক কিছু জানবো, আরো অনেক কিছু আমি দেখবো। আজিজকে সে বলবে তার এ-অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা? না, সে বলবে না কাউকে; সে নিজের ভেতরে বইবে অলৌকিক সৌন্দর্য, অভাবিত অভিজ্ঞতা; কারো কাছে সে তার সুন্দরকে প্রকাশ করবে না। অনেক দিন ধ'রেই রাশেদ টের পাচ্ছে এমন সুন্দর আছে, যা রক্তমাংসের সাথে বাঁধা; কচুরিফুলের বা মেঘের বা পদ্মার পশ্চিম পাড়ে সূর্যাস্তের সৌন্দর্যের সাথে রক্তমাংসের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু যে-সুন্দর সে আজ দেখেছে, তার জন্ম তার রক্তে তার মাংসে, তা তার রক্তমাংসের সাথে জড়ানো। সে নিজেকে বহন করতে পারছে না, তার রক্তমাংসে সুন্দর যে-চাপ সৃষ্টি করেছে, তাতে সে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো বিলু আপার, রাশেদের পছন্দ হয় নি, কিন্তু সে কারো কাছে তার অপছন্দ প্রকাশ করে নি; তাহলে হয়তো বিয়ে হবে না, তখন মা কষ্ট পেতে থাকবে বাবা কষ্ট পেতে থাকবেন বিলু আপাও কষ্ট পেতে থাকবে, আর কষ্ট পেতে থাকবে সে নিজে, নিজেকে তার মনে হবে অপরাধী। লোকটিকে দেখতে একেবারেই ভালো লাগে নি রাশেদের, বা এমনও হ'তে পারে বিলু আপাকে বিয়ে করতে চায় এমন কোনো লোককেই তার পছন্দ হয় না; আর বিলু আপা তো দেখেই নি লোকটিকে; মেয়েদের দেখতে হয় না, সব পুরুষই মেয়েদের জন্যে সুন্দর, দশজনের মধ্যে একজন, রাজপুত্র। বিলু আপা একদিন রাশেদকে জিজ্ঞেস করেছিলো, লোকটি দেখতে কেমন রে; রাশেদ তার কোনো উত্তর দেয় নি, বিলু আপা বুঝেছিলো রাশেদ কেনো উত্তর দিচ্ছে না, তখন সে বলেছিলো, আমার ভাগ্যে কি আর রাজপুত্র আছে? তবে বিলু আপাকে সুখীই মনে হচ্ছিলো, বিয়ে হচ্ছে এটাই সুখ, ক-দিন খুব ফিসফিস করেছিলো পুষু আপা আর পারুল আপা বিলু আপার সাথে, রাশেদ তাতে কান দেয় নি, তার মনে হয়েছিলো মেয়েরা একই বিষয়ে দিনের পর দিন ফিসফিস করতে পারে। বিলু আপাকে আর আমগাছের পাশে দাঁড়িয়ে দিগন্তের ওই পারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না, এতেই সুখ পাচ্ছিলো রাশেদ। লোকটি বিলু আপার থেকে অনেক বড়ো হবে, তেরো-চোদ্দ বছরের বেশি হবে, হাসতেই জানে না, আইএ ফেল, রাশেদের পছন্দ হয় নি, কিন্তু সে কোনো কথা বলে নি। লোকটিকে দুলাভাই বলতে হবে, খুব লজ্জা লাগবে রাশেদের, প্রথম প্রথম হয়তো সে লোকটিকে দুলাভাই বলতেই পারবে না। বিলু আপার বিয়ে হয়ে গেলো, রাশেদ সাথে গেলো বিলু আপার শ্বশুরবাড়িতে; পাল্কি থেকে বিলু আপাকে নামানোর সময় রাশেদ শুনতে পেলো মেয়েরা বিলু আপাকে কালো বলছে, শুনে রাশেদের মুখ শুকিয়ে গেলো, মনে হচ্ছিলো সে কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না। বিলু আপার শাশুড়ি বউ নামাতেই

এলো না, কয়েকটি মেয়েলোক বিলু আপাকে নামিয়ে নিয়ে গেলো উত্তরের ঘরটিতে। বিলু আপা কি তখন কাঁদছিলো, কিন্তু রাশেদের কান্না পাচ্ছিলো। অনেক পরে রাশেদ গেলো বিলু আপার কাছে, বিলু আপা বড়ো ঘোমটা দিয়ে ব'সে আছে, যে-ই আসছে সে-ই বলছে, ভাইটা দেহি সোন্দর, বইনটা এমন কালা অইল ক্যামনে, শুনে খুব রাগ হচ্ছিলো রাশেদের; একবার সে ব'লে ফেললো, আপা কালো নয়, আপনারা কালো বলেন কেনো? বিলু আপার স্বামী বললো, কালরে কাল বলব না ত কী বলব? কান্না পাচ্ছিলো রাশেদের, খুব অপমান লাগছিলো তার; বিলু আপা কাঁদছিলো, রাশেদ বিলু আপাকে এমনভাবে কোনো দিন কাঁদতে দেখে নি। এতো খারাপ দিন রাশেদ আর কাটায় নি, সে ভেবেছিলো খুব আনন্দ হবে, কোনো কিছুই তাকে আনন্দ দিতে পারছিলো না, যদিও সবাই তাকে খুবই আদর করার চেষ্টা করছিলো। তার ইচ্ছে করছিলো বিলু আপার পাশে ব'সে থাকতে, কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে অস্বস্তি লাগছিলো, সে সারাক্ষণ বাড়ি ভ'রে হাঁটছিলো, কখনো ব'সে ব'সে কষ্ট চাপার চেষ্টা করছিলো।

কালরাত, কালরাত কথাটি রাশেদ শুনতে পাচ্ছে বারবার। কোনো বাড়িতে বিয়ে হ'লেই কথাটি শোনা যায়, শুনে ভয় লাগে, আজ তার আরো ভয় লাগছে। বর-বউ যে-রাতে প্রথম একসাথে থাকে সেটাকে বলে কালরাত। সেটা খুব ভয়ের রাত, জিন এসে ভর করতে পারে বর-বউর ওপর, এমনকি সাপ এসেও কামড় দিতে পারে ব'লে শুনেছে রাশেদ। দুলাভাইর দুলাভাই হয় এমন একটা লোক ঘিনঘিনে রসিকতা করার চেষ্টা করছে রাশেদের সাথে, বলছে, আমার শালাডা ত বিয়াইর বইনরে লইয়া থাকব রাইতে, বিয়াই থাকবা কার লগে, আমার লগেই থাইক্ক। রাশেদ এখন জানে কালরাতে কী হয়। বিলু আপা উত্তরের ঘরে থাকবে, কালরাত হবে ওই ঘরে, শুনছে রাশেদ; তার দুলাভাইটিকে একটু খুশি খুশি দেখাচ্ছে, কিন্তু রাশেদের কষ্ট হচ্ছে ভয় লাগছে। বিলু আপা আর বিলু আপা থাকবে না আজ রাতের পর, মনে হচ্ছে রাশেদের, বিলু আপা নোংরা হয়ে যাবে, সাথে সাথে যেনো নোংরা হয়ে যাবে রাশেদও। বেশ রাত হয়ে গেছে, ঘুমোতে পারছে না রাশেদ, তখন রাশেদ বিলু আপার কান্না শুনতে পায় উত্তরের ঘর থেকে। বিলু আপা চিৎকার ক'রে ওঠে নি, তাহলে রাশেদ লাফিয়ে উঠতো, কিন্তু রাশেদ শোনে খুব কষ্টের একটা কান্না ভেসে আসছে পাশের ঘর থেকে। রাশেদ অন্ধকারে কান পাতে, শুনতে পায় বিলু আপা না, না, না করছে, আর কাঁদছে, আর দুলাভাইটি খুব জোরে ধমক দিয়ে উঠছে। রাশেদ শুধু শুনতে পাচ্ছে বিলু আপার কান্না, তার ঘুম আসছে না, সে ঘুমোতে পারবে না। কারা যেনো অন্য ঘর থেকে বেরোলো, রাশেদ দু-তিনজন মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেলো; তারা উত্তরের ঘরের দরোজায় গিয়ে দুলাভাইর নাম ধ'রে ডাকলো। এক মহিলা বলছে, শুনতে পাচ্ছে রাশেদ, এমন বুড়া মাইয়া আবার কালরাইতে কান্দে নি, আমাগ ত বিয়া অইছিল বার বচ্ছর বয়সে, আমরা ত কান্দি নাই, কালরাইতেই ত যা করনের করছিল, রাইত

ভইর‍্যাই করছিল, লউয়ে বিছনা ভাইস্যা গেছিল। আরেক মহিলা বলছে, অ নাতি, আমরা ভাবতাছিলাম এর মইদ্যে যা করনের কয়বার কইর‍্যা হালাইছ, অহন দেকছি তুমি মরদ অও নাই, আগে আমাগ কইলেই ত আমরা রান ফাঁক কইর‍্যা ধরতাম, লউয়ে চাদ্দইর ভিজাইতে না পারলে আবার মরদ কিয়ের। আরেক মহিলা বলছে, রাজি না অইলে পাও বাইন্দা লইতে অয়, মাইয়া মানুষ গরুর লাহান, পাও বাইন্দা জবই করন লাগে। তারা সবাই উত্তরের ঘরে ঢুকছে ব'লে মনে হচ্ছে রাশেদের। রাশেদের ভয় হচ্ছে তারা সবাই মিলে এখন বিলু আপাকে হয়তো বাঁধবে। রাশেদ বিলু আপার কান্না শুনতে পাচ্ছে, না, না শুনতে পাচ্ছে। মহিলারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এক মহিলা বলছে, চিৎ কইর‍্যা আতপাও বাইন্দা দিয়া আইলাম, অহনও যদি জোয়াইনকা না পারে তাইলে অর খুডাডা ভাইঙ্গা হালামু। আরেক মহিলা বলছে, যা মাইয়া তাইতে ত টু করনেরও কতা না, রজ্জইবারই মরনের কতা, এই মাইয়ারে কাবু করতে অইলে অর খাড়নের জোর থাকব না। তখন রাশেদ একটা তীব্র চিৎকার শুনতে পায়, রাশেদ দু-হাতে কান বন্ধ ক'রে বালিশে মাথা চেপে ধরে।

রাশেদ ঘুম থেকে উঠে দেখে বিলু আপার ভেজা শাড়িটা উত্তরের ঘরের পাশে একটি রশিতে ঝুলছে, তার পাশে ঝুলছে একটা ভেজা লুঙ্গি; বিলু আপার শাড়িতে একটা বড়ো কালচে দাগ দেখে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ঘরে ঢুকে দেখে বিলু আপা বিছানার ওপর স্তূপের মতো প'ড়ে আছে, রাশেদ ডাকতেই বিলু আপা মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকায়, রাশেদ তার মড়ার মতো মুখ দেখে চমকে ওঠে। তার গালে লাল দাগ, রাশেদ মুখ ঘুরিয়ে নিলো অন্য দিকে; বিয়ের পর মেয়েদের মুখে এমন দাগ সে আরো দেখেছে। রাশেদকে বসতে বলে বিলু আপা, নিজেও একবার বসার চেষ্টা করে, কিন্তু বসতে না পেরে আবার স্তূপের মতো শুয়ে পড়ে। বিলু আপার তো কোনো অসুখ ছিলো না বিলু আপা তো এতো দুর্বল ছিলো না, বসার চেষ্টা ক'রে বিলু আপা তো কখনো শুয়ে পড়ে নি। রাশেদের মনে হয় বিলু আপা সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারবে না। দুলাভাইটিকে খুব প্রফুল্ল মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে বিজয়ী, সে কিছু একটা জয় করেছে এমন একটি ভাব সে রাশেদের কাছেও প্রকাশ করছে। সে বিলু, বিলু নাম ধ'রে বিলু আপাকে ডাকছে মাঝেমাঝে, রাশেদের তা ভালো লাগছে না; তার মনে হচ্ছে বিলু আপার নাম ধ'রে ডাকার অধিকার তাকে কে দিয়েছে? সারা দিন বিলু আপা উঠেও বসলো না, প'ড়ে রইলো স্তূপের মতোই; পরের রাতে রাশেদ আবার শুনতে পেলো বিলু আপার না, না, না, আর কান্না। ভোরে বিলু আপা দাঁড়াতেই পারলো না, সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়েছে বিলু আপাকে। পাল্কি এসে গেছে রাশেদদের বাড়ি থেকে বিলু আপা আর তার জামাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে; পাল্কিতে উঠোনোর সময় বিলু আপা দাঁড়াতেই পারলো না। বিছানা থেকে নেমে একবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলো, দাঁড়াতে পারলো না, মেঝেতে প'ড়ে

যাচ্ছিলো, তাকে পাল্কিতে উঠোনো হলো ধরাধরি ক'রে। বাড়ি পৌঁছোনোর পর রাশেদ দেখে সবাই খুব খুশি, সেও খুশি হওয়ার চেষ্টা করলো, বিলু আপাকে নামানোর পর তাকে পিঁড়িতে বসাতে গেলে বিলু আপা গড়িয়ে প'ড়ে গেলো। ধরাধরি ক'রে বিলু আপাকে শুইয়ে দেয়া হলো বড়ো ঘরের কেবিনে, স্তূপের মতো প'ড়ে রইলো বিলু আপা; তার সইরা, পুষু আর পারুল আপা, ব'সে রইলো পাশে। উত্তরের ঘরে বিছানা পাতা হয়েছিলো বিলু আপা আর জামাইর জন্যে, সেখানে গেলো না বিলু আপা; জামাইকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, জামাইটিকে ম্লান দেখাতে লাগলো।

রাশেদকে ডাকছে বিলু আপার জামাই, ওই লোকটিকে দুলাভাই ভাবতে এখনো রাশেদের কেমন যেনো লাগছে, তার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না রাশেদের, মনে হচ্ছে সে তাকে ছুঁলে সেও নোংরা হয়ে যাবে বিলু আপার মতো। বিলু আপাকে দেখতে ইচ্ছে করছে রাশেদের, তবে দ্বিধা হচ্ছে কেবিনে ঢুকতে, সেখানে মেয়েলোকেরা ফিসফিস ক'রে কথা বলছে। পাশের বাড়ির বুড়িটি বলছে, মরদ জামাই অইলে অ্যামুনিই অয়, মাজা ভাইঙ্গা দেয়, জোয়াইনকাগ কি সবুর সইয্য অয়। রাশেদের ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে, কিন্তু পারে না সে; খেজুরগাছের গোড়ায় বসে কখনো, আমগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো গিয়ে বসে পড়ার টেবিলে। বইগুলোকে অচেনা মনে হয়। সন্ধ্যার পর বিলু আপাকে উত্তরের ঘরে নেয়ার কথা ওঠে; কেউ কেউ বলে জামাই একলা আছে, মেয়েকে ওই ঘরে পাঠানো দরকার, কিন্তু বিলু আপা যেতে রাজি হচ্ছে না। কেউ শুনছে না তার কথা, রাজি না হওয়ার অধিকার তার নেই, বসতে না পারলেও তাকে যেতে হবে, জামাই একলা রাত কাটাতে পারে না। জালালদ্দির বউ ভণ্ডকথা বলতে পারে গান গাওয়ার মতো, কিছু আটকায় না তার মুখে; সে লোকটিকে বলছে, নাতনি ত জামাইর লগে হুইতে চায় না, আমার নাতনিডারে ত খুইদ্যা হালাইছ, আইজ রাইতে আমারে লইয়াই হোও সোনারচান। লোকটিও কম যায় না, বলছে, নাতনিরে লইয়া আসেন, দুইজনরে লইয়াই শুই, দুইজনের মাজাই ভাইঙ্গা দেই। তারা দুজনেই ভণ্ডকথায় মেতে ওঠে, রাশেদ আমগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে শুনছে তাদের কথা, তার ঘেন্না লাগছে, কিন্তু দূরে চ'লে যেতে পারছে না। লোকটিকে খুব অস্থির মনে হচ্ছে, একা একা থেকে থেকে সে অস্থির হয়ে উঠেছে; সে জালালদ্দির বউকে বলছে, নাতনিরে লইয়া আহেন, আর কতোক্ষণ একলা থাকব। জালালদ্দির বউ ছুটে গেলো বড়ো ঘরের দিকে, সে নিশ্চয়ই মাকে খবর দিতে গেলো যে জামাই উতলা হয়ে উঠেছে মেয়ের জন্যে, এখনি পাঠাতে হবে তাকে। রাশেদ বড়ো ঘরে গিয়ে দেখলো বিলু আপা রাজি হচ্ছে না, কিন্তু তাকে যেতে হবে; মা তাকে যেতে বলছে, অন্য মেয়েলোকেরাও বলছে যেতে, জামাই একলা থাকলে মেয়েলোকের গুনা হয়। তারা জোর ক'রে বিলু আপাকে কেবিন থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলো, বিলু আপা হাঁটতে পারছে না, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার, সে প'ড়ে

গেলো; তিনটি মেয়েলোক চেষ্টা ক'রেও বিলু আপাকে তুলতে পারছে না। জালালদ্দির বউ লোকটিকে ডেকে বললো, অ সোনারচান, নিজের জিনিশ নিজেই কান্দে কইর‍্যা লইয়া যাও। লোকটি সম্ভবত এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলো, সে বেরিয়ে এসে পাঁজা কোলে ক'রে তুলে নিয়ে গেলো বিলু আপাকে, বিলু আপা তার কোলে প'ড়ে রইলো একটা মৃত মেষের মতো।

কয়েক দিন বেড়িয়ে লোকটি বিলু আপাকে রেখে চ'লে গেলো, তাদের বাড়ি গেলো না, চাকুরি করতে শহরে চ'লে গেলো। এ-ক-দিন রাশেদ বিলু আপার দিকে তাকাতে পারে নি, এবার তাকিয়ে দেখলো বিলু আপা হাঁটতে না পারলেও মিষ্টি ক'রে হাসছে, তাকে সুখী মনে হচ্ছে, তাতে রাশেদ আহত বোধ করলো অনেকটা, আবার ভালোও লাগলো। বিলু আপার শরীর থেকে অন্য রকম গন্ধ উঠছে, আগে বিলু আপার শরীরে গন্ধরাজের গন্ধ ছিলো, এখন সেখানে সেন্টের গন্ধ উঠছে, ওই গন্ধে চঞ্চল হয়ে উঠছে রাশেদের রক্ত। লোকটি দু-তিনটি বই দিয়ে গেছে বিলু আপাকে, একটি হচ্ছে সে-বইটি যেটি পড়তে গিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো রাশেদ, যাতে মেয়েটির চুল কেটে নিয়ে গিয়েছিলো পুরুষটি আর মেয়েটি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলো পুরুষটির জুতো, যে-বই রাশেদ শেষ করতে পারে নি বাবা কেড়ে নিয়েছিলেন ব'লে; রাশেদ বইটি দেখে আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বইটি কি সে এখন পড়তে পারে? বিলু আপার কাছে চাইলে কি বিলু আপা তাকে দেবে বইটি? নাকি সে এখনো ওই বই পড়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি? তবে তার পড়তে খুব ইচ্ছে করছে। রাশেদ বিলু আপাকে না ব'লেই বইটি নিয়ে এলো, চুপ ক'রে পড়তে বসলো টেবিলে, মনে মনে ভয় লাগতে লাগলো; তবে এবার আর ভালো লাগছে না, তার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করলো লেখক সম্পর্কে, কাহিনী সম্পর্কে; মনে হলো লেখক চান তাঁর পাঠকপাঠিকাদের খাঁটি মুসলমান ক'রে তুলতে, রাশেদের মনে প্রশ্ন জাগছে সে নিজে কি এমন পুরুষ হবে? না, সে এমন পুরুষ হবে না। লোকটি এক আস্ত মৌলভি, এমন লোক তার পছন্দ নয়; বউটিও কম নয়, সে এক মহিলামৌলানা। হতাশ হলো রাশেদ বইটি শেষ ক'রে, এমন বাজে বই সে আর পড়বে না। মুসলমান লেখকেরা কেনো ভালো বই লিখতে পারে না, এমন একটি প্রশ্নও দেখা দিলো রাশেদের মনে। পরদিন রাশেদ আরেকটি বই নিয়ে এলো বিলু আপার বইগুলো থেকে, বইটা খুলেই একরাশ সুরা আর দোয়ার মধ্যে প'ড়ে গেলো; কথায় কথায় যে এতো দোয়া পড়তে হয়, তা জানা ছিলো না তার। এতো দোয়া পড়তে হ'লে সবাইকে মৌলভিসাব হ'তে হবে। প্রায় সব কিছুই তার মনে হলো হাস্যকর আর অপাঠ্য, পড়ার কিছু নেই বইটিতে; রাশেদ পাতা উল্টোতে লাগলো, এক জায়গায় এসে রাশেদ চমকে উঠলো, দেখলো লেখা রয়েছে, 'যদি আমি কাহাকেও সেজদা করিতে হুকুম করিতাম তবে নিশ্চয়ই স্ত্রীদিগকে হুকুম করিতাম যে, তোমরা তোমাদের স্বামীগণকে সেজদা কর।' প'ড়ে ভয় পেয়ে গেলো রাশেদ, সে কখনো এভাবে দেখে নি, সে মা ও

বাবাকে সমানই দেখে এসেছে যদিও বাবাকে বেশি ভয় করেছে। কিন্তু বইটি বলছে পুরুষরা বউদের কাছে অনেকটা আল্লার মতো। বিলু আপার কাছে ওই লোকটি অনেকটা আল্লার মতো? রাশেদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে, ভয় হচ্ছে পাতা উল্টোতে, কিন্তু পাতা উল্টোতেই তার চোখে পড়লো লেখা রয়েছে, 'পুরুষগণ (আপন আপন) স্ত্রীগণের উপর কর্তা, কেননা আল্লাহ্‌তাআলা একের উপর অন্যকে সম্মান দিয়াছেন।' এর পর লেখা আছে, 'এই আয়াতে বুঝা যায় যে, পুরুষগণ সকল সময়েই আপন আপন স্ত্রীগণের সর্বাঙ্গের উপর কর্তা। অতএব তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন। স্ত্রীরও কর্তব্য এই যে, সর্বদা তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তাহার হুকুম তালীম করিয়া চলিতে থাকে। তাহা হইলে মৃত্যুর পরেই সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে।' মেয়েরা পুরুষদের দাসী? রাশেদ একবার ভাবলো, দেখলো তাই তো, তাদের গ্রামের সব মেয়েলোকই তো দাসীর মতো, তার চেয়েও খারাপ স্বামীদের কাছে। বিলু আপাও এখন ওই লোকটির দাসী, ওই লোকটি বিলু আপার ওপর যা ইচ্ছে.তা করতে পারবে।

রাশেদ কি অমন এক পুরুষ হয়ে উঠবে? কর্তা হয়ে উঠবে? তার মাথায় এমন ভাবনা আসছে। না, সে বিয়েই করবে না; বিয়ের কথা মনে মনে ভাবলেও তার লজ্জা লাগে, কিন্তু সে যদি বিয়ে করে, তাহলে সে তার স্ত্রীর কর্তা হবে? না, তার তো স্ত্রীই থাকবে না; সে বিয়েই করবে না। রাশেদ বইটির পাতা উল্টোতে উল্টোতে এক জায়গায় একটি শব্দ পায়, ওই শব্দটি আগে সে শোনে নি,- ছোহবত-শুনতেই তার অদ্ভুত লাগে, কিছুই বুঝতে পারে না। একটু পড়তেই শব্দটির বাঙলা অনুবাদ পায় সে, সাথে সাথে তার হাত কাঁপতে শুরু করে, রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। কেউ যদি এসে পড়ে? বাবা এসে যদি দেখেন? এ-সম্পর্কে আগে সে কিছু পড়ে নি, রাশেদের ইচ্ছে হচ্ছে এক পলকে সবগুলো পাতা প'ড়ে ফেলতে, যতোই পড়ছে তার অদ্ভুত লাগছে, তার রক্তের ভেতরে খসখসে অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। বইটিতে লিখেছে দুলহা-দুলহান আগে অজু করিবে, তারপর একটা দোয়া পড়িবে, তারপর ছোহবত করিবে। রাশেদের অদ্ভুত লাগতে থাকে, তার শরীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু অজু আর দোয়ার কথা প'ড়ে মন খটখট করতে থাকে; এ-কাজও করতে হয় অজু ক'রে দোয়া প'ড়ে? গ্রামের লোকেরা তো অজুই করতে জানে না, তারা এই 'জান্নেবনাশ্‌শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ' জানে? রাশেদ এক জায়গায় পড়ে, 'যাহারা হাসিখুশীতে ও রাজী রগবতে আপন আপন বিবিদের সঙ্গে একবার ছোহবত করিবে, আল্লাহ্‌তাআলা তাহাদের আমলনামায় দশ দশ নেকা করিয়া লিখিয়া দিবেন।' আল্লা এর সংবাদও রাখে, এতেও নেকা হয়? পাতা উল্টিয়েই রাশেদের চোখে পড়ে 'ছোহবতের সময় বিবির শরমগাহের উপর দৃষ্টি করিলে এবং তাহাতে গর্ভধারণ করিলে সেই সন্তান টেরা চক্ষুওয়ালা হইবে', 'বিবির শরমগাহের দিকে দেখিয়া দেখিয়া ছোহবত করিলে এবং তাহাতে সন্তান জন্মিলে সেই সন্তান বেতমিজ ও বেআদব হইবে।' রাশেদ

আর পড়তে পারে না, তার পৃথিবী ঘিনঘিনে হয়ে ওঠে; না, সে কখনো ছোহবত করবে না, ওই দোয়া সে পড়তে পারবে না। রাশেদ উঠে গিয়ে বইটি ছুঁড়ে রাখে বিলু আপার বইগুলোর পাশে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে; পুকুরে সাঁতার কাটছে হাঁস, টলমল করছে পানি, রাশেদের পায়ের নিচে সবুজ ঘাস, উড়ে গেলো একঝাঁক উৎফুল্ল কাক, ধলিবক এসে বসছে দূরের তেঁতুলগাছে-সুখী হয়ে উঠছে রাশেদ, তার পৃথিবী আবার হয়ে উঠছে সুন্দর।

কয়েক দিন ধ'রে হেডস্যার ও রাশেদের মধ্যে চলছে মধুর বিষণ্ন অভিমানের পালা, বুক ভারি হয়ে আছে তার, সুখও লাগছে, মনে হচ্ছে একটা ভিন্ন জীবন যাপন করছে সে; যেনো সে সমান হয়ে গেছে হেডস্যারের, বন্ধু হয়ে গেছে তাঁর, মনে হচ্ছে তার সমান হয়ে উঠেছে হেডস্যার, বন্ধু হয়ে উঠেছে তারা, বন্ধুদের মধ্যে অভিমান চলছে, কথা হচ্ছে মনে মনে, মুখে কোনো কথা হচ্ছে না। হেডস্যারের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে, তাই রাশেদ ইস্কুলে এসে সেই যে পেছনের বেঞ্চে বসছে আর উঠছে না, আর হেডস্যার তাদের ক্লাশের পাশ দিয়ে বারবার যাচ্ছেন আসছেন, ঘুরে ফিরে ইস্কুল দেখছেন, একটু বেশি ক'রেই দেখছেন ইস্কুল, কিন্তু তাদের ক্লাশের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। রাশেদ সব সময় বসে প্রথম বেঞ্চে, অভিমানপর্ব শুরুর পর থেকে বসছে শেষ বেঞ্চে, মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকছে, স্যার ক্লাশে ঢুকে কোনো দিকে না তাকিয়ে ইংরেজি ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন, রাশেদের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। ক্লাশের সবাই প্রতিমুহূর্তে তাকাচ্ছে তাদের দিকে, দেখছে হেডস্যার রাশেদের দিকে তাকান কিনা, আর রাশেদ তাকায় কিনা হেডস্যারের দিকে, এবং না তাকিয়ে তারা কীভাবে থাকে। হেডস্যার দেখতে বিশাল, কথা বলেন খুব উঁচু কণ্ঠে; তাঁর গলা ইস্কুলের পশ্চিম থেকে পুব পর্যন্ত সমান শোনা যায়। সবাই জানে তিনি বেশি ভালো পড়াতে পারেন না, তবে ইস্কুল চালাতে পারেন সবচেয়ে ভালো; রসিকতা করতেও তিনি পছন্দ করেন ছাত্রদের সাথে, ধমকও দেন ভয়ঙ্কর। রাশেদ হেডস্যারকে ভালোবাসে, রাশেদের মনে হয় হেডস্যার অসহায়, তাঁর বিশাল শরীরে একধরনের অসহায় ভাব আছে ব'লে মনে হয় রাশেদের, এজন্যেই রাশেদের ভালো লাগে স্যারকে। হেডস্যার যে ভালোবাসে রাশেদকে, তা সবাই জানে। একদিন স্যার ক্লাশে একটি ইংরেজি কবিতার কয়েকটি পংক্তি বলেন, কবিতাটি তাদের বইতে নেই, রাশেদ কবিতাটি পড়েছে একটি পুরোনো বইতে; স্যারের মুখে পংক্তিগুলো শুনে ঝলমল ক'রে ওঠে রাশেদ, আনন্দে সে কবিতাটির পরের দু-তিনটি পংক্তি আবৃত্তি ক'রে ফেলে। রাশেদ ভেবেছিলো স্যার খুশি হবেন; কিন্তু স্যার রেগে যান, রাশেদের মনে ভীষণ কষ্ট দিয়ে বলেন, আজ থেকে আপনিই এই ক্লাশে পড়ান, আমি যাই। স্যারের কথা শুনে খুব দুঃখ পায় রাশেদ; সে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, কোনো কথা বলে না, নাম ডাকার সময়ও সাড়া দেয় না। স্যার মুখ তুলে রাশেদের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নেন। সেই থেকে শুরু

হেডস্যার ও রাশেদের অভিমানের পালা। এ-অভিমান কি শেষ হবে না? রাশেদ পেছনের বেঞ্চে ব'সে ব'সে হাঁপিয়ে উঠছে, পাগল হয়ে উঠছে সামনের বেঞ্চে বসার জন্যে, কথা বলতে না পেরে দম বন্ধ হয়ে আসছে তার; কিন্তু সে সামনের বেঞ্চে বসবে না, কোনো কথা বলবে না স্যারের ক্লাশে। আমি কি কোনো অপরাধ করেছিলাম, রাশেদ নিজের সাথে কথা বলে মাঝেমাঝে, আমি তো আনন্দে ব'লে ফেলেছিলাম ওই লাইনগুলো, তার জন্যে আমার তো ওই অপমান পাওয়ার কথা ছিলো না; আমি আগে কথা বলবো না স্যারের সাথে, স্যার বললেই কথা বলবো আমি। সেদিন রাশেদ শেষ বেঞ্চে ব'সে আছে, হেডস্যার পড়াচ্ছেন ইংরেজি ব্যাকরণ, মন দিয়ে শুনছে রাশেদ; স্যার একটি উদাহরণে পড়লেন 'আর্চিটেক্ট', শুনে চমকে উঠলো রাশেদ। স্যার বাক্যটি শেষ ক'রেই বললেন, রাশেদ, তুমি কি কোনো দিন কথা বলবে না? স্যার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছেন, বইটি তাঁর হাতে, স্যারের কথা শুনে সবাই তাকালো রাশেদের দিকে। রাশেদ তো অনেক দিন ধ'রেই কথা বলতে চায়, এখন সময় এসেছে, কিন্তু সে কি এখন মারাত্মক কথাটি বলবে, যা তার মনে আসছে? তাতে কি স্যার সুখী হবেন? নাকি আরো রেগে যাবেন? রাশেদ দাঁড়ালো, সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে; মৃদু স্বরে বললো, স্যার, ওই শব্দটি হচ্ছে 'আর্কিটেক্ট'। চমকে উঠলেন স্যার, চমকে উঠলো সবাই; স্যার বইটি খুলে আরেকবার পড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি উচ্চারণ করলেন না শব্দটি। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, তাদের ক্লাশটিতে নীরবতা ভারি হয়ে উঠলো পাথরের মতো। স্যার একটু বিচলিতভাবে বেরিয়ে গেলেন ক্লাশ থেকে, মাথা নিচু ক'রে শেষ বেঞ্চে ব'সে রইলো রাশেদ, আর সবাই নিশ্চুপ হয়ে ব'সে রইলো। এমন নীরবতা তাদের জীবনে আর আসে নি। কিছুক্ষণ পর তাঁর ঘর থেকে ফিরে এলেন হেডস্যার, সরাসরি হেঁটে এলেন রাশেদের কাছে, ক্লাশের সবাই নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ফেলেছে, স্যার জড়িয়ে ধরলেন রাশেদকে। হু হু ক'রে কেঁদে ফেললো রাশেদ। রাশেদকে জড়িয়ে ধ'রে প্রথম বেঞ্চে এনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি সব সময় প্রথম বেঞ্চে বসবে, ওটিই তোমার স্থান। মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলো রাশেদ, তার মনে গুনগুন করতে লাগলো, সব সময়, সব সময়।

১০ নরকভ্রমণ

অধ্যাপিকা উপস্ত্রীটির সাথে দিন ভালো যাচ্ছে না রফিকের, এক সময় যে ছিলো রাশেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার সাথে আজকাল দেখা হয় না, বা দেখা হয় যখন রফিক হঠাৎ খারাপ থাকতে শুরু করে;—সহযোগী অধ্যাপিকা সহযোগিতা করছে না, ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, টেলিফোন ক'রে পাওয়া যাচ্ছে না, আসবে ব'লে কথা দিয়ে আসছে না, বড়ো একবাক্স রাজার গায়ে ছাতা ধরছে, সে একটা প্রভাষক বালককে খাচ্ছে টের পাচ্ছে রফিক, বালকটি অনেক বছর বেকার থাকার পর এখন খুব

কর্মময় জীবন যাপন করছে, আর অস্থির হয়ে উঠেছে রফিক; এবং বিশে ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায়, রাশেদ যখন বেরোতে যাচ্ছে, হঠাৎ এসে উঠেছে একটি মহৎ ভাবনা বুকের ভেতর পুষতে পুষতে। রফিক শহিদ মিনারে যেতে চায়, অনেক বছর তার ওই শুচিকর জায়গাটিতে যাওয়া হয় নি, অঢেল ময়লা জ'মে গেছে বুকের নর্দমায় নর্দমায়, ময়লা কিছুটা সে সাফ করতে চায় শহিদ মিনারে গিয়ে। রাশেদই কি আর শহিদ মিনারে যায়, সে-ই কি আর সাহস করে ওখানে যেতে? রফিক একটি মাঝারি মাপের আমলা হয়েছে, আর ভালো কাজ করেছে একটি যে বিয়ে করে নি, যদিও তার বিয়ে করার কথা ছিলো সবার আগে, আর বিয়ে করবে ব'লেও মনে হচ্ছে না; তার চারপাশে যতো দিন আছে রূপসী দয়াবতী বিষণ্ণ প্রসন্ন বিধবারা আর অতৃপ্ত আপারা, ততো দিন রফিক বিয়ে ক'রে উঠতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে না। আপা ব'লেই এ-সহযোগিণীর সাথে তার সম্পর্ক শুরু হয়েছিলো যখন সে একটি মহাবিদ্যালয়ে পড়াতো, আজো আপাই বলে; রাশেদ রফিকের সাথে আপামণির বাসায়ও গিয়েছিলো একবার, দেখেছিলো রফিক অশেষ শ্রদ্ধা করে আপামণিকে, আপার ঝিমধরা স্বামীটিও তার বিনয়ে গ'লে যাচ্ছিলো, আর রফিক রাশেদ ও আপার স্বামীটিকে ড্রয়িংরুমে চা ও সামরিক আইনে ব্যস্ত রেখে ভেতরে টেলিফোন করতে গিয়ে মৃদু চুমো খেয়ে আসছিলো আপাকে, রফিকের ঠোঁট দেখে রাশেদের তাই মনে হচ্ছিলো। বিয়ে করে নি ব'লে রফিক একটি স্বাধীনতা উপভোগ করে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারে, থাকেও, এখন আছে সাংসদাবাসে, তার এক আত্মীয় উদ্দিন মোহাম্মদের সাংসদ হয়ে একটি বড়ো কক্ষ পেয়েছে, যদিও সেখানে সাধারণত থাকে না। রফিক দরকারে ওই কক্ষটি ব্যবহার করে; উদ্দিন মোহাম্মদের দলে তার সমাজতন্ত্রী আত্মীয়টি যোগ দিয়েছিলো ব'লেই রফিক স্বর্গের স্বাদ পাচ্ছে। আপামণির একটা রোগ রয়েছে, যার নাম সতীত্বরোগ; প্রতিবারই সে একটি কথা বলে রফিককে, আমাকে কিন্তু তুমি অসতী ভেবো না, আমি অন্যদের মতো নই; রফিক আপামণিকে জানায় যে তার মতো সতী রফিক কখনো দেখে নি, তখন আপার মুখটিকে অক্ষত সুন্দর লাজুক নববধূর মুখের মতো দেখায়। রফিকের এক প্রিয় সুখ ওঠার পর আপার স্বামীটিকে ফোন করা; মজা করার জন্যেই এটা শুরু করেছিলো রফিক, পরে এটা তার প্রধান সুখ হয়ে দাঁড়ায়; প্রথম যেদিন ওঠার পর সে নম্বর ঘোরাতে শুরু করেছিলো লাফিয়ে উঠে আপা তাকে মেঝের ওপর ফেলে দিয়েছিলো, কিন্তু অশ্বীটিকে বশ মানিয়ে নিয়েছিলো রফিক, চড়তে যে জানে সে প'ড়ে গেলেও আবার উঠতে জানে; তার পর থেকে আপা এটি উপভোগ করতে থাকে, টেলিফোন সেটটি দূর থাকলে সে প্রস্তুতি হিশেবে সেটটি এনে রাখে বিছানার পাশে, পুলকের পূর্বমুহূর্তে সে চিৎকার ক'রে, টেলিফোন টেলিফোন, রফিক নিশ্চল হয়ে আপার স্বামীকে ফোন করে, ব্যবসা কেমন চলছে তার সংবাদ নেয়, সামরিক আইন গণতন্ত্র সমাজ রাষ্ট্র নীতি সততা রাষ্ট্রধর্ম হিন্দি সিনেমা এনজিও পান নারী পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে আলোচনা করে, আপার সংবাদও নেয়; চোখ বন্ধ ক'রে আপা তখন অধিত্যকাপর্ব

যাপন করতে থাকে, আর রফিক খোদা হাফেজ বলার সাথে সাথে প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয় আপা। পুলক কাকে বলে আপা তা জানতো না তিনটি মেয়ে একটি ছেলে জন্ম দেয়ার পরও, রফিকই তাকে তা শেখায়, এবং এক সময় সে তিনটি চারটি পাঁচটি দশটি পনেরোটি বিশটি পুলকে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। সেই আপা এখন একটি প্রভাষককে খাচ্ছে, রফিকের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, রফিকের মনে হচ্ছে মনের খোঁড়লে খালে নর্দমায় বড়ো বেশি ময়লা জ'মে গেছে; তার মনে পড়েছে শহিদ মিনারকে।

শহিদ মিনারে গিয়ে সাফ হ'তে চায় রফিক, ভেতরটাকে ধুয়েমুছে ধবধবে ক'রে তুলতে চায়, আরেকবার দেখতে চায় ভেতরটা পরিষ্কার হ'লে সুখ লাগে কিনা; রাশেদের নিজেরও সাফ হওয়া দরকার, বিস্তর ময়লা জ'মে গেছে তারও ভেতরে;—কোথায় ময়লা জমে নি নষ্টভ্রষ্ট দেশে?—রাশেদের ভয় হ'তে থাকে যদি গিয়ে দেখতে পায়, রাশেদ ভাবনাটাকে ভিন্ন পথে চালানোর জন্যে ভিন্ন ভালো মহৎ কিছু ভাবার চেষ্টা করে, সে কি ভিন্ন ভালো মহৎ কিছু ভাবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে?—আবার ভয়ানক ভাবনাটি এসে তার ওপর ভর করে, যদি গিয়ে দেখতে পায় মিনারের মনেও ময়লা লেগেছে? কেনো লাগবে না? মিনার তো মানুষেরই হৃদয়, সেই মানুষের ভেতরে ময়লা জমলে হৃদয় কেনো ময়লা হবে না, কেনো শুভ্র থাকবে? শহর আবর্জনায় ঢেকে গেলে মিনার কী ক'রে এড়াবে আবর্জনা? মিনার, তোমার কোনো শক্তি আছে? তুমি শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে পারো, যদি আমাদের থাকে সে-প্রতিভা, সেই সব বিশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির কথা; আমরা যখন পশু হয়ে উঠি, হয়ে উঠি দশকে দশকে, তখন আমাদের কিছু স্মরণে থাকে না। আমরা কি পশু হয়ে উঠছি না, নিজেকে জিজ্ঞেস করে রাশেদ, পশুর কি স্মৃতি বিশ্বাস প্রতিশ্রুতি থাকে? অনেক বছর পর অনেকক্ষণ ধ'রে রফিকের সঙ্গ ভালো লাগছে রাশেদের, সুস্থ লাগছে, রফিকের ভেতর থেকে হঠাৎ-বেরিয়ে-পড়া কাতরতা কোমল ক'রে তুলছে রাশেদকে। রাশেদ কোমল হ'তে চায়, শিউলির মতো পাতার ওপরই ঝ'রে ভিজতে চায় শিশিরে, ছেলেবেলায় যেমন ঝরতো। রাত এগারোটার মতো হবে হয়তো তখন, মিনারের পশ্চিমের চৌরাস্তাটিতে গিয়ে পৌঁছোয় তারা, পুরোনো অভ্যাসে জুতো খুলে হাতে নেয়, হাতে নিয়েই বুঝতে পারে তারা মানাচ্ছে না সেখানে, গ্রাম্য মনে হচ্ছে তাদের; অন্য কারো হাতে জুতো নেই, সবাই ভদ্রলোকের মতো জুতো প'রে আছে। অতীত থেকে দুটি মানুষ গিয়ে পৌঁচেছে নতুন কালের উৎসবে, তারা বুঝতে পারছে না উৎসবের রীতিনীতি, নিজেদের আগন্তুক মনে হচ্ছে। আমার মনেই শুধু ময়লা জমে নি, রফিক বললো, দেখছি সবার মন থেকেই ময়লা উপচে পড়ছে, এতো ময়লা মিনার সহ্য করবে কীভাবে? উত্তরের দেয়ালটিতে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা বাণীগুলো প'ড়ে হো হো ক'রে উঠলো রফিক, বললো, এ-বাণীগুলোতেও দেখছি প্রচুর ময়লা, এই সব পুরোনো বাণী আজো অর্থ প্রকাশ করে? দুটি বানান ভুলও

ধরলো। বললো, বাঙালির বুক থেকে নতুন কোনো বাক্য বেরোয় নি, যা এখানে জ্বলজ্বল করতে পারতো? নতুন বাক্য কোথা থেকে বেরোবে, বেরোলেও সে-সব স্বীকার করবো কেনো, পুরোনো বাক্যই সত্য আমাদের কাছে, ওই পুরোনোকে পেরিয়ে আরো পুরোনোতে ফিরে যেতে হবে। রফিক আবার বললো, একটি মেয়েও যে দেখছি না? শহিদ দিবস এখন পুরুষদের দিবস? মেয়ে দেখা যাবে কেনো, দেশটা এখন অনেক বেশি পাকিস্থান হয়ে গেছে, যখন এটা পাকিস্থান ছিলো তখনো মেয়েরা আসতো, এখন আসে না, আসতে পারে না, দেশটা খাঁটি মুসলমানের দেশ হয়ে যাচ্ছে; একদিন হয়তো পাকিস্থানকে পেরিয়ে ইরান-আফগানিস্থান হয়ে উঠবে। তখন ফুল দেয়া যাবে না, মিলাদ পড়াতে হবে, বা এটিকে ভেঙে ফেলে একটা মসজিদ বা মাজার তোলা হবে। সেই আলপনা কই, সুর কই, বিষণ্নতা কই, বেদনা কই, সুখ কই? এমন সময় কোলাহল শোনা গেলো, দৌড়োতে শুরু করেলো লোকজন, কয়েকটি বোমা ফাটলো; রাশেদ আর রফিক ধাক্কা খেয়ে মাটিতে প'ড়ে যাচ্ছিলো, কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে দৌড়োতে লাগলো। তারা খুব হাঁপিয়ে উঠেছে, আর দৌড়োতে পারছে না, মনে হচ্ছে বহু দূর চ'লে গেলে তারা শান্তি পাবে, হয়তো পাবে না, তবু বহু দূর চ'লে যেতে হবে। তখন রফিক প্রস্তাবটি দিলো, তার সাথে সাংসদাবাসে যাওয়ার; বললো, স্বর্গে থাকা হলো না, ময়লাও সাফ হলো না, চলো এবার নরকে যাই।

তারা যখন গিয়ে পৌঁছোলো তখন দেরি হয়ে গেছে, তবে উৎসব শুরু হয় নি, দুটি মন্ত্রী জুয়ো ছেড়ে উঠতে চাইছে না ব'লে শুরু হ'তে পারছে না। জুয়ো খেলা চলছে দুটি টেবিলে, একটি ক'রে মন্ত্রী আছে প্রত্যেক টেবিলেই, সঙ্গে খেলছে কয়েকটি সাংসদ আর আমলা, তাদের ঘিরে আছে আরো কয়েকটি আমলা আর সাংসদ। মন্ত্রী দুটিকে আর আমলাগুলোর প্রায় সব কটিকেই চেনে রাশেদ, সাংসদগুলোকে চেনে না। একটা মন্ত্রী অনেক আগে তাকে ভাই ভাই করতো দেখা হ'লে, শ্রেণীসংগ্রাম বিপ্লব আবৃত্তি করতো, আজ তার দিকে তাকালো না, তাকাবার সুযোগ পেলো না, আমলাগুলো তাকে যেভাবে স্যার স্যার করছে তাতে সে রাশেদকে হয়তো আজ ভাই বলতে চায় না, বেঁচে গেলো রাশেদ, ভাই ভাই শুনতে আর ভালো লাগে না; আরেকটি রফিকের সহপাঠী ছিলো ইস্কুলে, প্রবেশিকায় ফেল করেছিলো একবার বা দুবার, নাম করেছিলো দু-তিনজনকে মাটির ওপরভাগ থেকে সরিয়ে দিয়ে, মাটির সাথে মানুষের সমন্বয় ঘটিয়ে, এখন মন্ত্রী হিশেবে নাম করছে, আরো নাম করবে। আমলা কটা নতুন যুগ্মসচিব হয়েছে, ঝিলিক বেরোচ্ছে চোখমুখ থেকে; একটির বউ কিছু দিন আগে একটি সচিবের ঘরে গিয়ে উঠেছে ব'লে তাকে একটু বিষণ্ন দেখাচ্ছে; তারা নিঃসন্দেহে খুবই যোগ্য, মন্ত্রী দুটিকে স্যার স্যার ক'রে পাগল ক'রে তুলছে; রাশেদ জুয়ো খেলা না বুঝলেও বুঝতে পারছে বদমাশ মন্ত্রী দুটি পেরে উঠছে না প্রতিভাবান আমলাগুলোর সাথে, ওরা প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলো বিএ (অনার্স)-এ;—রাশেদ

জানে বাঙলাদেশের আমলাগুলোর মতো প্রতিভাবান আমলা পৃথিবীতে নেই,– আমলাগুলো তা পুষিয়ে দিচ্ছে স্যার স্যার ব'লে, হয়তো অন্যভাবেও পুষিয়ে দেবে। রাশেদ আধঘণ্টা আগে বোমার মধ্যে পড়েছিলো, এখন মনে হচ্ছে বোমায় যদি একটা হাত ছিঁড়ে দুটি পা উড়ে গিয়ে সে প'ড়ে থাকতো চৌরাস্তায়, তাহলে অনেক সুস্থ থাকতো। ময়লা সাফ করতে বেরিয়ে ময়লা জ'মে উঠছে বেশি ক'রে তার ভেতরে, সে এতো ময়লা নিয়ে কী ক'রে উঠে দাঁড়াবে? জুয়ো শেষ হ'লে আরেকটি কক্ষে যেতে হলো, সেখানে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে; বিদেশি গান বাজছে কান ছিঁড়েফেড়ে, টেবিলে ঝকঝক করছে সারি সারি বোতল, অল্প অল্প নাচছে দশবারোটি উঠতি অভিনেত্রী/মডেল, একটা বিজ্ঞাপনসংস্থা আজ রাতের জন্যে উপহার দিয়েছে এই সজীব শিল্পকলাগুলো, একুশের মহৎ উৎসবে সামান্য উপহার দিতে পেরে সংস্থাটি নিজেকে ধন্য মনে করছে নিশ্চয়ই। হয়তো অনেক কাজ পেয়েছে সংস্থাটি, ভবিষ্যতে আরো অনেক কাজ পাবে, আরো অনেক শিল্পকলা উপহার দেবে।

রাশেদ কি বেরিয়ে পড়বে নরক থেকে? বেরিয়ে গেলে কি স্বর্গের ধুলোকণার ওপর পড়বে তার পঙ্কিল পদযুগল? চারপাশে কি স্বর্গ ছড়িয়ে আছে? নাকি অতল আবর্জনায় প'ড়ে সে তলিয়ে যাবে, তার চিৎকারও কারো কানে গিয়ে পৌঁছোবে না? পান শুরু হয়ে গেছে, নাচছেও কেউ কেউ, উঠতিরা মন্ত্রী দুটিকে ঘিরেই নাচতে চেষ্টা করছে; নাচ রাশেদের সব সময়ই ভালো লাগে, এখনো লাগছে, দুটি আমলা এরই মাঝে দুটি উঠতিকে বাহুর ভেতরে ভ'রে ফেলেছে, সাধনা করছে আন্ডারওঅ্যারের ভেতর ভ'রে ফেলতে, তখন তারা হয়তো এ-কক্ষে থাকবে না। দুটি ঢলঢলে কলকলে টলটলে উঠতি সম্ভবত মন্ত্রী দুটির জন্যেই বরাদ্দ, আমলাগুলো সে-দুটিকে বাহুতে টানতে চেষ্টা করছে না, বারবার মন্ত্রী দুটির কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, আমলারা মহর্ষিদের থেকেও নিষ্কাম হ'তে পারে কখনো কখনো, কিন্তু মন্ত্রী দুটি মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে নাচতে অভ্যস্ত নয়। তারা দাঁড়িয়ে থাকছে, পান করছে, উঠতি দুটি তাদের সামনে অল্প অল্প নাচছে, তারা মাঝেমাঝে উঠতি দুটির বাহু পরখ করছে, গাল পরখ করছে, একটু পরে হয়তো তাদের উপচানো চাঁদ দুটিকেও পরখ করবে। একটু দূরেই পানির ওপর যে-দালানটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি কাত হয়ে পড়ছে ব'লে মনে হচ্ছে রাশেদের, তার শেকড় ছেঁড়ার শব্দ পাচ্ছে রাশেদ,-পানির ওপর যা ভাসে তার কি শেকড় থাকে,-রাত শেষ হওয়ার আগে সারাটি দেশের মাথার ওপর ওটি ভেঙে পড়বে; তবে ওটি হয়তো ভেঙে পড়বে না, ওটি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রাশেদ আজ রাতে পান করবে না, কেনো পান করবে না; সেও কি পান করাকে খারাপ মনে করে, সে কি মনে করে পান করলে নষ্ট হবে একুশের পবিত্রতা? রাশেদ কয়েকটি বোমার শব্দ শুনতে পেলো মনে মনে, বোমা এবং পান, পান এবং বোমা, কোনটিকে সে বেছে নেবে? আজ সন্ধ্যায় রফিক যদি ময়লা সাফ করার উদ্দেশ্যে তার ওখানে গিয়ে না উঠতো, তাহলে সে

এ-সংকটে পড়তো না, কোনো বাছাবাছি তাকে পীড়িত করতো না, সে একটা সৎ মানুষ থেকে যেতো। এখনো সে গ্লাশ হাতে তুলে নেয় নি, নেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সে-মন্ত্রীটি, যে আগে তাকে ভাই ভাই করতো, এসে তার পাশে বসলো। সে কাঁপতে শুরু করেছে, গলা জড়িয়ে আসছে তার, তবে অনেক কথা বলতে চায় ব'লে মনে হচ্ছে। প্রথমেই বললো যে রাশেদকে ওখানে দেখবে ব'লে সে ভাবে নি। রাশেদ বিব্রত বোধ ক'রে বললো যে এমন ভালো ভালো জায়গায় সেও কখনো কখনো আসে, ব'লে হাসলো। মন্ত্রীটি আর কথা বলছে না, কাঁপছে, সে এখন তার বরাদ্দ উঠতিটির দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাচ্ছে, আর বলছে যে ওই ছেমরিগুলো খুব গরম দ্রব্য, সে অবশ্য দ্রব্য শব্দটি ব্যবহার করে নি, রাশেদের লাগলে রাশেদ যেনো তাকে বলে। রাশেদের লাগবে না। মন্ত্রীট দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, আর রাশেদের হাত ধ'রে বলছে, ভাই, রাজনীতিবিদগুলারে যেই জাত বিশ্বাস করে, সেইটা একটা হারামজাদা।

রফিক ওই পাশে বেশ ব্যস্ত, কিন্তু আপাকে সে ভুলতে পারছে না মনে হচ্ছে, রাশেদ বেরিয়ে পড়লো রফিককে কিছু না ব'লেই; তাকে অনেক দূর যেতে হবে, যদিও কতো দূর যেতে হবে, সে জানে না। পানির ওপর ভয়ঙ্করভাবে দাঁড়ানো দালানটির দিকে তাকিয়ে নির্বোধ মনে হলো নিজেকে, নির্বোধের মতোই কিছুক্ষণ আগে তার মনে হয়েছিলো দালানটি কাঁপছে, শেকড় ছেঁড়ার ভুল শব্দও সে শুনতে পেয়েছিলো; এ-সবই যারপরনাই বাজে কথা, দালানটি চমৎকার আছে, চমৎকার থাকবেও, দালানটির ছাদে উঠে যদি আজ রাতে উদ্দিন মোহাম্মদ তার সব উপপত্নী আর চাকরবাকর নিয়ে পান করতে করতে নাচতে থাকে, তাহলেও ওটি কাঁপবে না। একবার সে ঢুকেছিলো দালানটির ভেতরে, আর ঢুকবে না; ভেতরে ঢুকেই তার মনে হয়েছিলো বিক্রমপুরের এক চাষী সে ভুল ক'রে ঢুকে পড়েছে রাজাদের প্রাসাদে, সে পথ চিনতে পারছে না, বারবার পথ হারিয়ে ফেলছে; চারদিকে দেখতে পাচ্ছিলো রাজাদের, রাজারা খুব ব্যস্ত ছিলো নিজেদের নিয়ে; তারা বলছিলো নিজেদের প্রাসাদের কথা, রানীদের অলঙ্কারের কথা, মুকুটের কথা, তাকে দেখতেই পাচ্ছিলো না রাজারা; যদি সব গ্রামের সব চাষী এখানে ঢুকে পড়তো, তাহলেও রাজারা তাদের দেখতে পেতো না। সে আর ওই খোঁয়াড়ে ঢুকবে না, ওটি ভাঙবে না, ভাঙলেও তার কিছু যায় আসে না; তাকে এখন অনেক দূরে যেতে হবে। তবে সে বেশি দূরে এগোয় নি, এখনো মাঠও পেরোতে পারে নি; চারপাশ খুব অন্ধকার ব'লে মনে হচ্ছে, সে হয়তো অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, খুব বেশি দূরে যেতে পারবে না। একপাল বাঙালি শুয়ে আছে রাস্তার ওপর, দু-তিনটি পুলিশ লাঠি দিয়ে তাদের নিম্নভাগের ছেঁড়া কাপড় উঠিয়ে তাদের নিম্নাঙ্গের রূপরেখা পরীক্ষা করছে; লোকগুলো খুব ঘুমোতে পারে, সুখী বাঙালি, পুলিশের লাঠির খোঁচায়ও তাদের ঘুম ভাঙছে না, তারা এমনভাবে ঘুমোচ্ছে যাতে লাঠি দিয়ে কাপড় উঠিয়ে তাদের নিম্নাঙ্গের রূপরেখা পরীক্ষা করতে পুলিশের

অসুবিধা না হয়। এ-মাঝরাতে পুলিশ কি বেরিয়েছে এ-বাঙালিদের নিম্নাঙ্গের সম্পদ পাহারা দিতে, যা খোয়া গেলে দেশের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে? পুলিশদের ভেতরে প্রেমের দেবতা শক্তভাবে জেগে উঠেছে মধ্যরাতে, কাপড় সরিয়ে তারা প্রেমের মন্দির খুঁজছে। একটি মন্দির পাওয়া গেলো এই মাত্র, তার রূপরেখা পছন্দ হয়েছে আইনশৃঙ্খলার, ওই রূপরেখাকে এখন জেগে উঠতে হবে, কিন্তু সে জেগে উঠতে চাইছে না, যেতে চাইছে না আইনশৃঙ্খলার সাথে; তবে তাকে যেতে হবে, তার রূপরেখা পছন্দ হয়েছে আইনশৃঙ্খলার। আরো কয়েকটি রূপরেখা তাদের দরকার নিশ্চয়ই, এখানে না পাওয়া গেলে অন্য কোথাও পাওয়া যাবে। কিন্তু রাশেদকে অনেক দূরে যেতে হবে, যদিও সে জানে না কতো দূর যেতে হবে। রাশেদের ইচ্ছে করছে এদের পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা কি তা অনুমোদন করবে? তারা যদি লাঠি দিয়ে তার নিম্নাঙ্গের রূপরেখা পরীক্ষা করতে এসে দেখে তার জিন্স ওপরের দিকে উঠছে না, তার রূপরেখা দেখা যাচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই একটা সোরগোল পড়বে। তার চেয়ে হাঁটাই ভালো, খুব ভালো খুব দূরে চ'লে যাওয়া।

এ-মাঝরাতে এক সামান্য বাঙালি/বাঙলাদেশি/বাঙলাস্থানি/মুসলমান আমি হাঁটছি হাঁটতে পারছি না পা কোন দিকে পড়বে আমার পা বুঝে উঠতে পারছে না আমার কোনো গন্তব্য নেই কোনো বাঙালি/বাঙলাদেশি/বাঙলাস্থানি/মুসলমানের কোনো গন্তব্য নেই দশকে দশকে উল্টেপাল্টে যাচ্ছে গন্তব্য বাবা আপনিও এমন কোনো মাঝরাতে হেঁটেছেন হাঁটতে পারেন নি বুঝতে পারেন নি কোন দিকে যাচ্ছেন আপনাকে নিয়ে একটা বড়ো গোলমাল রয়ে গেছে গোলমালটি রয়ে গেছে আমার রক্তে বাঙালি/বাঙলাদেশি/বাঙলাস্থানি/মুসলমানের রক্তে আপনাকে ডাকতে পারি নি নিজের ভাষায় ডেকেছি ডাকছি তাদের ভাষায় যারা পরাজিত করেছিলো আপনার আমার পূর্বপুরুষকে জনক আপনাকে ডাকছি তুর্কি ভাষায় আমার কি জন্মের ঠিক আছে জনক আমার কন্যা যার মগজে দুঃস্বপ্ন ঢুকে গেছে বুট ঢুকে গেছে ট্রাক ঢুকে গেছে আমার পুত্র যে এখনো জন্মে নি যে মগজে দুঃস্বপ্ন নিয়ে ট্রাক নিয়ে বুট নিয়ে জন্ম নেবে মাঝরাতে দুপুরবেলায় হাঁটবে বুঝতে পারবে না কোথায় যাচ্ছে আপনার পিতার দেশ ছিলো না আপনার পিতা উদ্বাস্তু ছিলেন তিনি একটা দেশ চেয়েছিলেন কিনা জানি না আপনি দেশ চেয়েছিলেন একটা দেশ আপনার দরকার হয়েছিলো পাকিস্থান নাম দিয়েছিলেন দেশটার আপনি যে-পাকিস্থান চেয়েছিলেন আপনার নেতারা সে-পাকিস্থান চায় নি আপনি বছরের পর বছর দেখেছেন আপনার পাকিস্থান আর নেতাদের পাকিস্থানের মধ্যে মিল ছিলো না নেতারা একটা দেশ চায় নেতা হওয়ার জন্যে কায়েদে আজম জাতির পিতা হওয়ার জন্যে আপনার আমার মতো মানুষ দেশ চায় বেঁচে থাকার জন্যে ধানের পাটের কুমড়োর স্বাদের জন্যে নারীকে ভালোবাসার জন্যে এই দুই চাওয়ার মধ্যে মিল নেই আমি একটি দেশ চেয়েছিলাম আমার একটি দেশ দরকার হয়েছিলো

তার নাম দিয়েছিলাম বাঙলাদেশ আমার নেতাদের বাঙলাদেশ আর আমার বাঙলাদেশ এক নয় আপনি বিশ্বাস করেছিলেন আপনার নেতাদের আমি বিশ্বাস করেছি আমার নেতাদের আপনার নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আপনার সাথে আমার নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সাথে আমার পুত্রকন্যার নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমার পুত্রকন্যার সাথে দেশটা মানুষের নয় যারা দখল করে তাদের এই এখন মাঝরাতে দেশটাকে আমি আমার ব'লে ভাবতে পারছি না দেশটা পাঁচতারাদের চারতারাদের বুটদের তাদের দাসদের চাকরদের দেশটা আমার নয় যারা রাস্তায় শুয়ে আছে তাদের নয় ভোরে উঠে যারা খেতের দিকে যাবে নদীর দিকে যাবে দেশটা তাদের নয় দেশটাকে একদিন দখল করবে রাজনীতিবিদরা তখনো দেশটা আমার হবে না হবে রাজনীতিবিদদের পাঁচতারা চারতারারা দখল করে বন্দুক দিয়ে জনগণ তাদের বন্দুক কিনে দিয়েছে বন্দুক দিয়ে তারা কী করতে পারে দেশ দখল করা ছাড়া রাজনীতিবিদদের বন্দুক নেই তাদের বন্দুক জনগণ দেশ দখল করার জন্যে তারা জনগণের ভেতর বারুদ ঢোকায় যেমন এখন তার প্রস্তুতি চলছে আমিও বারুদ হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছি একদিন রাজনীতিবিদরা দেশটা দখল করবে তবে তখনো দেশটা আমার হবে না জনগণের হবে না চাষীর হবে না রিকশঅলার হবে না

অনেক দূরে যেতে হবে রাশেদকে, তার তা-ই মনে হচ্ছে, যদিও সে জানে না কতো দূর। অনেক দিন এ-রাস্তায় আসে নি রাশেদ, অচেনা লাগছে সব কিছু, রাত ব'লে আরো অচেনা লাগছে, তার ভয় লাগছে না যদিও ভয়ই লাগার কথা বেশি। একটা ট্রাক এসে তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে, পিষে যেতে পারে, একটা ছুরিকা এসে বলতে পারে আমার সাথে চলো, বা সে যাতে আর চলতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু তার ভয় লাগছে না। পথে লোকজন দেখা যাচ্ছে দু-একজন, তারাও কি গন্তব্য খুঁজে পাচ্ছে না, তারাও কি অনেক দূরে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছে? তারা হয়তো শহিদ মিনারে যাবে, মিনারকে ভুলতে পারে নি তারা, তাদের বুকেও অনেক ময়লা জমেছে, পরিষ্কার করতে যাচ্ছে ময়লা? শহিদ মিনার, হৃদয় ধোয়ার ঝরনাধারা, যেখানে বুকের নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে আরো অনেক বেশি ময়লা জমিয়ে এসেছে রাশেদ, ঝরনার জলের ছোঁয়া সে পায় নি। বিমানবন্দরমুখি সড়কটায় উঠে এলো রাশেদ, দূরে একটা সেতু দেখা যাচ্ছে, অনেক আগে একটা কুষ্ঠরোগীকে ওই সেতুর ওপর দেখেছিলো সে, তার মুখ মনে পড়লো; রাস্তার পুব পাশে সে-বাড়িটা চোখে পড়লো, যে-বাড়িটা হোটেল ছিলো, যার ভেতরে একটা ছোট্ট পানশালা ছিলো, ওয়েসিস যার নাম ছিলো, যেখানে সে প্রথমবার পান করতে এসেছিলো বন্ধুদের সাথে, একটা বিয়ার চারজনে ভাগ ক'রে খেয়ে মনে করেছিলো তারা মাতাল হয়ে গেছে। ওয়েসিস নামটা সে ভোলে নি দেখে অবাক হলো, বাড়িটা দেখামাত্রই নামটি মনে পড়লো, না দেখলে মনে পড়তো না; মাহমুদার মুখটিও মনে পড়লো। আশ্চর্য, আজ রাতে তার সব

স্মৃতি জেগে উঠছে, জাতিস্মর হয়ে উঠছে সে। মাহমুদাকে নিয়ে রাশেদ এপ্রিলের এক রোববার একটি নরম নির্জন স্থান খুঁজেছিলো, কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলো না, বারবার ইস্কুটার নিয়ে স্থান বদলাচ্ছিলো, যেখানেই যাচ্ছিলো সেখানটাকেই মনে হচ্ছিলো বড়ো জনাকীর্ণ, শেষে তারা এ-হোটেলটিতে এসে চা খেয়েছিলো; এক ঘণ্টা মুখোমুখি ব'সে থেকেও রাশেদ মাহমুদাকে কিছু বলতে পারে নি। রাশেদ চৌরাস্তায় দাঁড়াতেই শুনলো একদল শিশু খলখল ক'রে হাসছে, এমনভাবে হাসছে যে তাদের হাসি কোনো দিন থামবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তারা হাসতে থাকবে। সে কোনো শিশু দেখতে পেলো না, কিন্তু তার মনে হলো শিশুরা তাকে ঘিরে ফেলেছে, তাকে ঘিরে খলখল ক'রে হাসছে; হয়তো এখনি তারা তাকে আক্রমণ করবে। একটু পরেই রাশেদ শিশুদের তীব্র চিৎকার শুনতে পেলো। এ-শিশুদের রাশেদ কখনো দেখে নি, কিন্তু তারা তার বুকের ভেতরে ঢুকে গেছে, এ-মধ্যরাতে তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে খলখল হাসছে আর তীব্র আর্তনাদ করছে মৃত শিশুরা। শিশুরা, তোমরা ইস্কুলে যাচ্ছিলে ভোরবেলা, তোমাদের ফ্রকে তোমাদের শার্টে এসে পড়েছিলো ভোরের আলো, ভোরের আলোর মতো তোমরা ইস্কুলে যাচ্ছিলে, তোমাদের সবাই ভুলে গেছে, পিতামাতারাও হয়তো ভুলে গেছে, আমি ভুলি নি, একটা ট্রাক এসে লাফিয়ে পড়েছিলো তোমাদের ওপর তোমাদের আলোকমালাকে অন্ধকার ক'রে দেয়ার জন্যে, তোমরা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলে, তোমাদের আমি আজো বুকে বয়ে বেড়াই।

মমতাজ এখন মৃদুকে পাশে নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে, সে কি ওই স্বপ্নটা আবার দেখছে, আবার কি মমতাজ ওই স্বপ্নটা দেখতে চায়? মমতাজের এক অদ্ভুত অভ্যাস মহাযুদ্ধের মতো প্রসঙ্গগুলো সে তোলে যখন রাশেদ আর কোনো প্রসঙ্গ মনে রাখতে পারে না, সে-রাতেও তুলেছিলো, গ'লে ভেঙে ভেসে যেতে যেতে মমতাজ বলছিলো কয়েক রাত আগে সে একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার কথা সে কাউকে বলবে না, কিন্তু একটু পরই মমতাজ বলে সে স্বপ্ন দেখেছে রাশেদের এক বন্ধুর সাথে ঘুমোচ্ছে সে, কিন্তু সে বন্ধুটির নাম বলবে না, তাতে রাশেদ বন্ধুটিকে হয়তো আর দেখতে পারবে নাম, হয়তো সে বাসায় এলে দরোজা খুলবে না। কিন্তু মমতাজ একটু পরে, রাশেদ জানতে চাইলে, বন্ধুটির নামও বলে; গ'লে যেতে যেতে রাশেদ জানতে চেয়েছিলো স্বপ্নে কী দেখেছে মমতাজ, ভেঙে পড়তে পড়তে মমতাজ বলে সবই দেখেছে সে, কিছুই বাকি ছিলো না। তার কেমন লেগেছে রাশেদ জানতে চেয়েছিলো, মমতাজ শুধু বলেছিলো, ভালো। রাশেদ মমতাজের কাছে জানতে চেয়েছিলো বাস্তবেও ওই বন্ধুটির সাথে সে ঘুমোতে চায় কিনা; মমতাজ দ্বিধায় পড়ে, অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে নি, শেষে বলে আমি ঠিক জানি না চাই কি চাই না। আসলে মমতাজ কি চায়? রাশেদ বুকে একটা কাঁটা খোঁজ করে, কিন্তু কোনো কাঁটা খচ ক'রে ওঠে না; রাশেদও কি অমন অনেক স্বপ্ন

দেখে নি? রাশেদ নিজে কি স্বপ্নে ও দিবাস্বপ্নে অজস্র নারীর সাথে সময় যাপন করে নি? তালিকাটি কি খুব দীর্ঘ হবে না, ওই তালিকার সব নাম কি সে কখনো প্রকাশ করতে পারবে? কয়েক মাস ধ'রে একটি পরহেজগার মহিলা কি তাকে স্বপ্নে কল্পনায় সুখ দিচ্ছে না? পরহেজগার মহিলাটির সাথে তার দেখা হয়েছিলো বেইলি রোডে এক বিবাহ-অনুষ্ঠানে, তার বোরখার ভেতরে তাল তাল সোনা লোকোনো আছে ব'লে মনে হচ্ছিলো রাশেদের, এবং আশ্চর্য, তারপর থেকে সে কি রাশেদের স্বপ্নে দেখা দিচ্ছে না? মমতাজ আর কী কী স্বপ্ন দেখে? রাশেদ জানতে চেয়েছিলো মমতাজ আর কারো সাথে ঘুমোতে চায় কিনা, অন্য কারো সাথে ঘুমোতে তার কেমন লাগবে; অন্ধকারে রাশেদ মমতাজের মুখ দেখতে পায় নি, মমতাজ বলেছিলো, তুমি তো তা পছন্দ করবে না। অর্থাৎ মমতাজ চায়, আর মমতাজের বিশ্বাস রাশেদ তা পছন্দ করবে না। সত্যিই কি রাশেদ তা পছন্দ করবে না? ওই পরহেজগার মহিলাটি কি স্বপ্নে ঘুমোয় না কারো সাথে, বাস্তবে কি তার সাধ হয় না অন্য কারো সাথে ঘুমোতে?

অনেক দূরে যেতে হবে রাশেদকে। মুজিব ফিরছে, দেখতে পাচ্ছে রাশেদ, অনেক দিন পর তার মুখের ওপর রোদ পড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে; ট্রাকে মালা, আর যারা একদিন তাকে ডোবাবে, তাদের চাপে দম ফেলতে পারছে না মুজিব, সে খুব উপভোগ করছে, উল্লসিত পতঙ্গের মতো বাঙালির ভিড় চারপাশে, পতঙ্গপুঞ্জের মধ্যে শুধু সে-ই মানুষের মতো দেবতার মতো আচরণ করছে, রাশেদ দেখছিলো এক অপরিচিত প্রবেশ করছে দেশে, মুজিবের চোখে দেশটাকে অচেনা লাগছে, দেশটার অচেনা লাগছে মুজিবকে। সে বুঝতে পারছে না সে কোথায় ফিরে এসেছে। ষোলোই ডিসেম্বর থেকে দশই জানুয়ারির ওই দিনটা অনেক দূরের, অনেক আবেগ বদলে গেছে এর মাঝে, বাঙালি ভাগ হয়ে গেছে হাজি আর রাজাকারে। ভারত-ফেরত হাজিদের ভঙ্গি দেখার মতো, রাশেদ এখানে সেখানে দেখা পাচ্ছিলো হাজিদের, উপভোগ করছিলো তাদের মহত্ত্ব। যে ভারতে যায় নি, সে-ই রাজাকার, এমন ভাব করছে হাজিরা, যে ভারতে গেছে হাজি হয়ে ফিরেছে সে, তার অনেক পুণ্য জমেছে, পুণ্যের অনেক ফল তাকে পেতে হবে, পেতে শুরুও করেছে। কয়েক দিন আগে রাশেদের দেখা হয়েছিলো এক মহাহাজির সাথে, যে দেশে থাকলে আলবদরদের নেতা হ'তে পারতো, হতোই, যে এখন একটা বড়ো পদ খুঁজছে, সেও রাশেদকে বলেছিলো, তোমরা তো রাজাকার, দেশে ছিলে নিশ্চয়ই রাজাকারি করেছো। রাশেদ কষ্ট পায় নি, বেঁচে থাকার জন্যে তো অপমান সহ্য করতেই হবে। রাশেদ তখন দিকে দিকে দেখতে পাচ্ছিলো তার জ্বলজ্বলে পরিচিতদের, তারা ভারত থেকে ফিরেছে, রাশেদকে চিনতে পারছে না; একেকজন গাড়ি থেকে নামছে গাড়িতে উঠছে, ভারতে যাওয়ার আগে ছিলো সামান্য ফিরে এসেছে অসামান্য হয়ে। স্বাধীন দেশটা হয়ে উঠেছে সাড়ে সাতকোটি রাজাকারের দেশ, সবাই পাপী, শুধু পুণ্যবান তারা যারা ফিরে এসেছে ভারত

থেকে পুণ্য অর্জন ক'রে। শেখ মুজিব ফিরছে, সে ফেরার পর আর কোনো সমস্যা থাকবে না, সে যাদু জানে, তার যাদুতে সব সোনা হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই সোনা হচ্ছে না, বরং মুজিবের মুখে দাগ লাগছে, সে আরো অচেনা হয়ে উঠছে। আমি, আমি, আমি, মুজিবকে মনে পড়লেই মনে পড়ে আমি, আমি, আমি। মুজিবকে জাতির পিতা হ'তে হবে, তাকে জাতির পিতা ক'রে তুলতে হবে; কায়েদে আজমের পর বাঙালিকে পেতে হবে জাতির পিতা। একটি চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, দূরে স'রে যাচ্ছে, নিজে বুঝতে পারছে না, দূরে স'রে গিয়ে সুখ পাচ্ছে। বীরেরা খুন হওয়ার আগে ধারাবাহিকভাবে আত্মহত্যা করতে থাকে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না, মুজিবও আত্মহত্যা ক'রে চলছে, আত্মহত্যা ক'রে চলছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। রাশেদকে অনেক দূরে যেতে হবে। মুজিব কি মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারতো সে আছে, কিন্তু ক্ষমতায় নেই? সে ও ক্ষমতা একই অর্থবোধক হয়ে উঠেছিলো তার কাছে, সে-ই বাঙলাদেশ এমন মনে হয়েছিলো তার। সে কি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করছিলো না? সে-রাজবংশের ক্রিয়াকলাপের ফল কি পেতে শুরু করে নি বাঙালি? রেডিওতে জিয়ার ঘোষণাটি রাশেদ শুনেছিলো ঢাকা থেকে পালানোর সময়, হাতের ছোটো রেডিওটি শিউরে উঠেছিলো ওই ঘোষণায়, সে তার ঘোষণাকে ব্যর্থ হ'তে দেয় নি, ঘোষণার পুরস্কার কড়ায় গণ্ডায় হিশেব ক'রে নিয়েছে। আরেক অপরিচিত সে, অত্যন্ত অপরিচিত, ওই ঘোষণার মুহূর্তে ছিলো অচেনা, খুন হওয়ার সময়ও রয়ে গেলো অচেনা। মেজর, মেজর, মেজর, মেজরের ওপরে সে কখনো উঠতে পারে নি, যদিও সব কিছু হয়েছে সে। সে কি আর মুক্তিযোদ্ধা ছিলো? সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন আরেক অচেনা ভর করেছে। এই মাঝরাতে রাশেদকে অনেক দূরে যেতে হবে, সে জানে না কতো দূর যেতে হবে।

রাশেদের মনে হচ্ছে সে ক্রমশ দোজখে ঢুকছে, তাকে কেউ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, নরকের শেষে সে কোনো স্বর্গে গিয়ে পৌঁছোবে না, যে-দিকেই পা বাড়াচ্ছে সে-দিকেই পাকে পাকে প্রসারিত হচ্ছে দোজখ; মহাজগত নয়, রাশেদের মনে হচ্ছে, দোজখই অনন্ত ও সম্প্রসারণশীল; আর দোজখের পাকে পাকে কোটি কোটি নগ্ন পুরুষ, যারা আর পুরুষ নয়, যারা এক সময় পুরুষ ছিলো; তাদের লুঙ্গি খুলে পড়েছে, তাদের সম্মুখভাগে উদ্যত বা ঝুলন্ত প্রত্যঙ্গ নেই, ওই প্রত্যঙ্গগুলো কেটে নেয়া হয়েছে, কেটে নেয়ার পর শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে দেয়া হয়েছে লবণ দিয়ে। প্রত্যঙ্গহীন পুরুষেরা তাকে ঘিরে ধরছে, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠছে তাকে দেখে। আর কোনো দিকে দেখার মতো কিছু নেই, দেখার মতো হচ্ছে ওই একদা-পুরুষদের লবণপূর্ণ গহ্বর, রাশেদের চোখ গিয়ে বারবার পড়ছে ওই পুরুষদের প্রত্যঙ্গহীন গহ্বরে। তারা একদিন ওই প্রত্যঙ্গকেই দেবতা ব'লে মানতো, ওই প্রত্যঙ্গই ছিলো তাদের পতাকা, আজ তাদের ওই প্রত্যঙ্গ নেই। নেই ব'লে তারা লজ্জা পাচ্ছে না, গৌরব বোধ করছে; তারা চিৎকার ক'রে বলছে,

আমাদেরও একদিন ওই প্রত্যঙ্গ ছিলো, ওই প্রত্যঙ্গের জ্বালা আমরা সহ্য করতে পারি নি; আমরা জ্বালা থেকে এখন মুক্তি পেয়েছি। রাশেদ জানতে চায় তারা কী ক'রে হারিয়েছে ওই প্রত্যঙ্গ। লিঙ্গঅণ্ডহীন পুরুষেরা চিৎকার ক'রে বলতে থাকে, যুগে যুগে আমরা লিঙ্গঅণ্ডহীন হয়েছি, আমাদের পিতামহদেরও লিঙ্গঅণ্ড ছিলো না, পিতাদেরও লিঙ্গঅণ্ড ছিলো না, তাদের পিতামহদেরও লিঙ্গঅণ্ড ছিলো না, পিতাদেরও লিঙ্গঅণ্ড ছিলো না, আমাদের পুত্রদেরও লিঙ্গঅণ্ড থাকবে না, পৌত্রদেরও লিঙ্গঅণ্ড থাকবে না, তাদের পুত্রদেরও লিঙ্গঅণ্ড থাকবে না, পৌত্রদেরও লিঙ্গঅণ্ড থাকবে না। যুগে যুগে বিদেশি প্রভুরা এসেছে, আমাদের শিশ্ন কেটে নিয়েছে; আমাদের ভেতর থেকেও কখনো কখনো কেউ কেউ প্রভু হয়েছে, তারাও কেটে নিয়েছে আমাদের শিশ্ন; শিশ্নের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ভবন, অন্ন, শকট, শিরোপা। রাশেদ দোজখের প্রথম পাকের মাঝভাগে দেখতে পায় এক নারী শুকনো শাপলা পাতায় একটি লাশ ঢেকে কাঁদছে, লাশ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, লাশের মুখে শুকিয়ে আছে সবুজ ঘাস· নদীর রেখা বাঁশবন জোনাকি। ওই নারী বিচার চায়, আর ওই লিঙ্গহীন পুরুষেরাও বিচার চায়; তারা ওই নারীর সাথে সুর মিলিয়ে বিলাপ করছে থেকে থেকে। রাশেদ দোজখের প্রথম পাক পেরিয়ে দ্বিতীয় পাকে প্রবেশ করে, তার মাঝভাগে দেখতে পায় আরেক নারীকে, সেও একটি লাশ সামনে নিয়ে কাঁদছে, লাশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত, রাশেদ লাশের মুখে একটি বন্দুকের ছবি আঁকা দেখতে পায়; ওই নারীও বিচার চায়। তার সাথে সুর মিলিয়ে বিচার চাইছে, বিলাপ করছে দ্বিতীয় পাকের একদা-পুরুষেরা। রাশেদ দোজখের তৃতীয় পাকে প্রবেশ ক'রে দেখতে পায় ঝলমল করছে একটি শয়তান, সে দেবতা হয়ে উঠেছে কোটি কোটি লিঙ্গঅণ্ডহীন একদা-পুরুষের, তারা স্তব করছে ঝলমলে শয়তানের, বলছে, তুমি উজ্জ্বল তুমি আলোকিত তুমি চিরন্তন তুমি আমাদের প্রভু, তোমাকে আমরা সব দিয়েছি, শিশ্ন দিয়েছি, অণ্ড দিয়েছি, নারী দিয়েছি, তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়ো। চতুর্থ পাকে নামার পর রাশেদ আর কোনো লিঙ্গঅণ্ডহীন পুরুষও দেখতে পায় না, দেখতে পায় পালে পালে অদ্ভুত কিম্ভূত পশু, যাদের প্রত্যেকের তিনটি ক'রে মুণ্ড, একটি মুণ্ড শুয়োরের, আরেকটি মুণ্ড নেকড়ের, আরেকটি মুণ্ড এমন এক কুৎসিত পশুর, যার নাম রাশেদ জানে না। তিনমুণ্ড বিকট পশুদের মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, তবু রক্তের জন্যে পাগল হয়ে ছুটছে তিনমুণ্ডরা, বিকট চিৎকার করছে, তাতে দোজখ কেঁপে উঠছে বারবার। তিনমুণ্ডদের মাথায় রক্তের রেখায় আঁকা রয়েছে চানতারা; রাশেদের কাছে বাল্যকাল থেকে চানতারা পবিত্র, সে শুয়োরদের কপালে চানতারা দেখে শিউরে ওঠে। তিনমুণ্ডরা তার দিকে ছুটে আসতে থাকে, রাশেদ চিৎকার ক'রে ওঠে, কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না।

রাশেদ দোজখে ঢোকার আগে একবার ভেবেছিলো আবার যাবে সে ওই বিখ্যাত ঝরনাধারার কাছে, সেখান থেকে অন্তত এক ফোঁটা জল মেগে এনে চিত্তটাকে

দিনরাত ধুয়েমুছে চলবে, তা আর হলো না; মনে হ'তে লাগলো তার জন্যে পবিত্র জল কোথাও নেই। সে বাসার দিকে পা বাড়ালো, এবং যখন বাসা থেকে একটু দূরের মসজিদটির কাছে পৌঁছোলো তখন সূর্য অনেকটা আকাশে উঠে গেছে। মসজিদের প্রাঙ্গণে বহু লোকের ভিড় দেখে রাশেদ দাঁড়ালো। কেউ কি আজ ভোরে মারা গেছে? যে-লোকটি মারা গেছে সে কি খুব পাপী ছিলো, তাই কি এই ভিড়? পাপীদের নিয়ে আজকাল দারুণ কাণ্ড হচ্ছে জানাজায় জানাজায়, ইমামসাবরা পাপীর পাপের প্রকৃতি ও পরিমাণ কম্পিউটারের মতো এক নির্দেশে বের ক'রে ফেলছেন, পাপমোচনের জন্যে দু-তিন লাখ টাকা জরিমানা করছেন; নইলে পাপী পায়ে দলা তেলাপোকার মতো শোচনীয়ভাবে প'ড়ে থাকছে। তেমন কিছু হয়তো ঘটেছে। রাশেদ, কয়েক দিন আগে, একটা জানাজায় গিয়ে এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছিলো। ইমামসাব দারুণ ফিটফাট, মাথায় কী একটা ঝোলানো, পা পর্যন্ত ধবধবে পাঞ্জাবি, নাকি অন্য কোনো নাম আছে ওই বস্ত্রটার, তিনি পাপীর পাপের হিশেব ক'রে চলছেন, মনে হচ্ছে বেহেস্ত-দোজখের সাথে তার সরাসরি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে, দোজখের কম্পিউটারে তিনি পাপ মেপে তাকে টাকায় রূপান্তরিত করছেন, কয়েক লাখের নিচে কথা বলছেন না। তাঁর কথা শুনে মৃত পাপীটির বড়ো পুত্রটি অসহায়ভাবে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে, সে লাখ টাকা কখনো দেখে নি, পাপী পিতার লাশ নিয়ে সে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু ভাবছে আজ থেকে সে নামাজটা ধ'রে ফেলবে নিজের ছেলেটাকে বাঁচাতে। রাশেদ ইমামসাবের বাহাদুরি দেখে একটু বিরক্তই হয়েই ব'লে ফেলেছিলো, পাপের হিশেব আল্লার ওপর ছেড়ে দিন, আপনার কাজ জানাজা পড়ানো, জানাজা পড়ান। কয়েকজন বুড়ো সাথে সাথে সমর্থন করেছিলো রাশেদকে, আর তখন ইমামসাব তাঁর কম্পিউটার বন্ধ ক'রে নামাজ পড়াতে শুরু করেছিলেন। তেমন কিছু কি আজ ঘটেছে? রাশেদ এ-ইমামকে দু-একবার দেখেছে, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে, এমন ভাব করেন যে তিনি মক্কামদিনাজেদ্দারিয়াদফেরত তো বটেই, সম্ভবত দারুন্নাইম জান্নাতুল মাওয়া জান্নাতুল ফেরদৌসফেরতও। রাশেদের সন্দেহ হয় তাঁর ঠিকানা জাহিম হাবিয়া জাহান্নামও হ'তে পারে একদিন; তাঁর সম্পর্কে শোনা গেছে ভোরের আজান দেয়ার কাজটি তিনি ক্যাসেট বাজিয়েই ক'রে থাকেন, যদিও তার প্রমাণ মেলে নি। ধর্মের এ-আধুনিকীকরণে রাশেদের অবশ্য আপত্তি নেই। কিন্তু এমন উত্তেজনা কেনো চারপাশে? পুলিশও দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি ইমামসাব শহিদদিবসে শহিদদের গালি দিয়ে কোনো ফতোয়া প্রচার ক'রে গোলমাল বাঁধিয়ে তুলেছেন? রাশেদ প্রাঙ্গণে ঢুকে একটি চেনা যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি জানতে চায়। যুবকটি রাশেদকে যে-ঘটনাটি বলে তাতে রাশেদ শিউরে ওঠে না, কিছুক্ষণ আগে সে দোজখ ভ্রমণ ক'রে এসেছে ব'লে এখন সে সবই সহ্য করতে পারে। পাশের বস্তির একটি বালিকা, ১০, ইমামসাবের কাছে প্রত্যেক ভোরে সবক নিতে আসে, আজো এসেছিলো; ইমামসাব তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। বালিকার চিৎকার কেউ শুনতে

পায় নি, তবে দেরি হওয়ায় তার রিকশাঅলা পিতা তাকে ডাকতে এসে দেখতে পায় তার কন্যাটি রক্তের বন্যার মধ্যে প'ড়ে আছে। সে চিৎকার ক'রে কন্যার বুকের ওপর প'ড়ে নাম ধ'রে ডাকতে থাকে, কিন্তু কন্যা সাড়া দেয় না।
ইমামসাবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাশেদ কোনো উত্তেজনা বোধ করে না, সে ক্রমপ্রসারিত নরকের ওপর পা ফেলে ফেলে প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকে।

১১ গোলাপ-মেয়ের সাথে স্বর্গযাত্রা

দোজখ থেকে বেরোতে হবে, নইলে বাঁচবে না সে, বুঝতে পারছে রাশেদ, যেমন তার মতো অনেকে এর আগে এমনভাবে ম'রে গেছে, এখন মরছে, হয়তো বুঝতে পারছে না মরছে;—বারান্দায় একটি চঞ্চল চড়ুইয়ের মুখের ওপর চোখ পড়লো রাশেদের, এক ঝলক রোদ গাছের পাতার সবুজের সাথে মিশে গ'লে এসে পড়েছে মুখটির ওপর, রাশেদ তার রূপের দিকে তাকিয়ে রইলো শিশুর মতো। মৃদু ইস্কুলে চ'লে গেছে, নইলে মৃদুকে নিয়ে চড়ুইয়ের মুখ দেখা যেতো, যে-মুখ সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্রের থেকে অনেক উজ্জ্বল আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে তার। চড়ুইটিকে ডাকতে ইচ্ছে করছে, ডাক শুনে চড়ুই যদি তার কাঁধে এসে বসতো, তার কাঁধটিকে মনে করতো একটা শাদা বেগুনের ডাল, তাহলে সে ভুলে যেতে পারতো এইসব নোংরা সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র রাজনীতি স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্র। যখন সে ঘর থেকে বেরোলো বুঝতে পারলো চড়ুইটি কৃপণ নয়, সে তাকে কিছু একটা দিয়ে গেছে, যা তার থেকে কেড়ে নিচ্ছে সমাজ রাষ্ট্র; সব কিছুর দিকে তার তাকাতে ইচ্ছে করছে, আদর করতে ইচ্ছে করছে সব কিছুকে। সামনের রিকশাটিকে ভালো লাগলো তার, রিকশাটির পেছনের অদ্ভুত, প্রায়-পরাবাস্তব, ছবিগুলো ভালো লাগলো, কলসি-কাঁখে মেয়েটিকে খুব ভালো লাগলো, তার স্তন দুটি কাঁখের কলসির থেকে বড়ো, ওই স্তন যার আছে সে কেনো পানি আনবে কলসি ভ'রে?—তার অলৌকিক স্তন দুটি আঁকার সময় শিল্পীর হৃদয় যে-সুখে ভ'রে গিয়েছিলো, সে-সুখ রাশেদকে স্পর্শ করলো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার ঘরটিতে কোমলভাবে ঢুকলো রাশেদ, যাতে ঘরটি টেরও না পায় সে এসেছে; চেয়ারটিতে ব'সে ঘরটির দিকে তাকালো, আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে ঘরটিকে, কিন্তু নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে; কয়েক বছর ধ'রে সে বসছে ঘরটিতে, ঘরটির দিকে একবারও ভালোভাবে চেয়ে দেখে নি; মনে হচ্ছে ঘরটির সঙ্গে যদি কখনো রাস্তা, বাজার, উদ্যান, বা রেলগাড়িতে তার দেখা হয়ে যায় সে ঘরটিকে চিনতে পারবে না। ঘরটি কি তাকে চিনতে পারবে? ঘরটিকে সে যেমন উপেক্ষা করেছে ঘরটি কি তাকে তেমন উপেক্ষা করে নি? কী কী নিয়ে এটি ঘর হয়ে উঠেছে, যার ভেতর রাশেদ ঢুকছে বেরোচ্ছে কয়েক বছর ধ'রে? ঘরটিতে কটা জানালা আছে?

পাখা কটা আছে? আলমারি কটা আছে? টেবিল কটা আছে? চেয়ার কটা আছে? আর কী আছে? ঘরটি যদি তাকে এসব জিজ্ঞেস করে সে উত্তর দিতে পারবে না, ঘরটি খুব অপমানিত বোধ করবে, তাকে ঘেন্না করবে, গোপনে গোপনে তার সাথে শত্রুতাও করতে পারে। দুটি জানালা আছে ঘরটিতে, রাশেদ চেয়ে দেখলো জানালা দুটি বন্ধ, অনেক দিন সে খোলে নি জানালা দুটি, এই প্রথম তার চোখে পড়লো হলদে রঙ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে জানালার কাচ; বেশ হয়েছে, বাইরে গাছগুলো মাঝেমাঝে যে-ভয়ঙ্কর আগুন জ্বালে, তাতে পুড়ে যেতে পারে রাশেদ সুবিবেচক কর্তৃপক্ষ তা চায় না, তারা স্থির করেছে এ-ঘরে যে বসবে তাকে কোনো রকম আগুনেই পুড়তে দেয়া হবে না। রাশেদ নিজেও পুড়তে চায় না। মাথার ওপর দুটি পাখা ঘুরছে দেখে সে অবাক হলো, এতো দিন সে মনে করতো ঘরে আছে একটা পাখা; পাখা দুটির কোনো একটির অস্তিত্বই সে স্বীকার করে নি, সেই অস্বীকৃত পাখাটির কথা ভেবে সে দুঃখ পেলো। একটি জীবিত ও একটি মৃত টিউব বাতি আছে ঘরটিতে; জীবিতটি প্রাণপণে চেষ্টা করছে ঘরটি আলোকিত ক'রে রাখার, যদিও পারছে না, এতোটা কর্তব্যনিষ্ঠা দুর্লভ হয়ে উঠেছে চারপাশে, তার দায়িত্ববোধের জন্যে রাশেদ তাকে ধন্যবাদ জানালো, মৃতটির জন্যে একটু কষ্ট লাগলো, হাসিও পেলো। দরোজার পর্দাটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো সে একটি দেয়াল দেখছে, যেনো ওখানে কখনো একটি সবুজ পর্দা ছিলো না, ওখানে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে আছে একটি শক্ত দেয়াল, তার গায়ে শ্যাওলা ধরেছে। সে শিউরে উঠলো, তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো; একটু পরে পর্দাটি দুলে উঠলে তার ভয় কাটলো। পরমুহূর্তেই আবার একটি দেয়াল দেখতে পেলো রাশেদ, দেয়ালটি তাকে আটকে ফেলেছে; সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে দেখলো তার সামনে দেয়াল, পেছনে দেয়াল, ডানে দেয়াল, বাঁয়ে দেয়াল। দেয়াল তাকে ঘিরে ফেলেছে, তার কোনো উদ্ধার নেই। তার মনে পড়লো অনেক বছর ধ'রে সে চাঁদ দেখে নি, চাঁদ দেখতে গেলেই চাঁদ ঢেকে দিয়ে একটা দেয়াল ওঠে, চাঁদের আলোর নিচে ঘুমন্ত গাছ দেখে নি, দেখতে গেলেই গাছের চারপাশে দেয়াল ওঠে, কুয়াশার ভেতর জোনাকি দেখে নি, রৌদ্রের আক্রমণে শ্রান্ত মানুষ দেখে নি, অনেক বছর বুকের ভেতরে সে শিশিরপাত বোধ করে নি, শিশির পড়তে থাকলেই সেখানে একটা দেয়াল ওঠে। এমন একটা কারাগার পাওয়া ভাগ্যের কথা এ-দেশে, তার সুখী থাকার কথা এ-কারাগারের ভেতরে, কিন্তু রাশেদের মনে হ'তে লাগলো সে দম ফেলতে পারছে না। তার মনে পড়লো ভোরের চড়ুইটির মধুর মুখ।

রাশেদ তখন দরোজায় শুনতে পেলো তার পায়ের শব্দ। বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনির থেকে মধুর সে-স্যান্ডলের শব্দ, যে-শব্দে পাহাড় ভেঙে পড়ে দেয়াল ভেঙে পড়ে, মূর্খের নির্বোধ উচ্ছ্বাস ব'লে মনে হয় সমাজ সভ্যতা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র সামরিক শাসনকে। ভেঙে পড়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে সে রাশেদের ঘরে

ঢুকলো; নতুন আমপাতার কম্পন অনুভব করলো রাশেদ, ওই কম্পনে তার ময়লাধরা আত্মা আর শরীর থেকে অনেকখানি ধুলো ঝ'রে পড়লো। রাশেদ তার নাম জানে না, অনেক আগে সে রাশেদের ঘরে ঢুকেছিলো, রাশেদ তার নাম দিয়েছিলো গোলাপ-মেয়ে, যাকে সে আর দেখতে পায় নি, মাঝে একবার যাকে দেখার পিপাসা জেগেছিলো রাশেদের। রাশেদ একদিন তাকে দেখার জন্যে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো, সামনের দিক থেকে আসা প্রত্যেক রিকশায় তাকে দেখতে পাচ্ছিলো, আর মনে হচ্ছিলো রিকশাগুলো তাকে নিয়ে রাশেদকে পেরিয়ে দূর দূরান্তে চ'লে যাচ্ছে, যতো দূরে রাশেদ কখনো যেতে পারবে না। রিকশাঅলাকে রাশেদ মালিবাগের দিকে যেতে বলেছিলো, যদিও রাশেদ জানে না মালিবাগ কোথায়, শুধু জানে শহরের কোথাও মালিবাগ রয়েছে, নামটি সে অনেকের মুখে শুনেছে; তারপর যেতে বলেছিলো কলাবাগানে, তল্লাবাগে, র‍্যাংকিন স্ট্রিটে, ইস্কাটনে, মগবাজারে, আজিমপুরে, আরমানিটোলায়, জিগাতলায়, টিকাটুলি, ইব্রাহিমপুর, কচুখেত, নাখালপাড়ায়; একবার গোলাপবাগ নামের একটি জায়গায় যেতে বলেছিলো রিকশাঅলাকে, আর রিকশাঅলা এমনভাবে হেসেছিলো যার অর্থ শহরে এ-নামে একটা পাড়া থাকলে ভালো হতো, তবে এ-নামের কোনো পাড়া নেই। তাকে খুঁজতে বেরিয়ে রাশেদ তাকে পায় নি, যদিও শহরের প্রায় সবার সাথেই তার দেখা হয়; একটা মন্ত্রী যাবে ব'লে পুলিশ পাগলের মতো বাঁশি বাজিয়ে তাকে মন্ত্রী দেখিয়েছিলো, পেট-ফোলা মন্ত্রীটাকে দেখে রাশেদ আনন্দ পেয়েছিলো, তার ইচ্ছে হয়েছিলো গাড়ির পতাকাটি তুলে নিয়ে ওই কোলাব্যাংটির পেটে একটা খোঁচা দিতে; মালিবাগের মোড়ে একটা রিকশা থেকে সালাম চোকদার নামে একজন, যে নাকি তার এক পুরোনো বন্ধু, ডাকাডাকি করতে থাকে, রাশেদের রিকশার সাথে তার রিকশা লাগিয়ে রাশেদকে থামায়। রাশেদ কোথায় যাচ্ছে, কেনো যাচ্ছে, মাঝেমাঝেই এদিকে যায় কিনা, গেলে কখন যায়, সপ্তাহে ক-বার যায় সব বিষয়ে জানতে চায়; রাশেদ তার অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু রাশেদ কি তাকে বলতে পারে যে সে গোলাপ-মেয়েকে খুঁজছে? রাশেদের ইচ্ছে হচ্ছিলো চোকদার গোয়েন্দা বিভাগে কতো দিন ধ'রে আছে সে-সংবাদ জানার, কিন্তু রাশেদ কিছু না ব'লে হাত নেড়েছিলো। রিকশায় রিকশায় রাশেদ তাকে খুঁজেছে, প্রত্যেক রিকশায় তাকে দেখতে পেয়েছে, এবং সে রাশেদকে পেরিয়ে অনেক দূরে চ'লে গেছে। রাশেদের অবশ্য এমন খোঁজা শাস্ত্রসম্মত নয়, কোনো রকম খোঁজাখুঁজিই তার জন্যে সিদ্ধ নয়, তবু রাশেদ খুঁজতে বেরিয়েছিলো, যা কেউ কোনোদিন জানবে না। সে আজ এসেছে, চড়ুইটির মুখ আবার মনে পড়ে রাশেদের; রাশেদ তাকে বসতে বলে, সে দেয়াল-ঘেঁষে একটি চেয়ারে বসে, রাশেদ আবার পুরোনো গোলাপের গন্ধ পেতে থাকে।

রাশেদকে সে তার নামটি বলে; নামটির গায়েই অনির্বচনীয় সুগন্ধ আছে ব'লে মনে হয় রাশেদের। রাশেদ গোলাপের গন্ধ পাচ্ছে, অভাবিত গন্ধ, তার ঘরে এমন

অভাবিতভাবে কেউ আসে নি, রাশেদের জীবনে অভাবিত ব'লে কিছু নেই, যেমন আর কারো জীবনেই কোনো অভাবিত শিহরণ নেই। রাশেদ কেনো গোলাপের গন্ধ পাচ্ছে? সে কেনো এসেছে? রাশেদের ঘরে তার মতো বালিকারা নিয়মিতই ঢোকে, যারা কোনো বিস্ময় নিয়ে আসে না, সব বিস্ময় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসে, এমনভাবে আসে যেনো শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরি, আর একে মনে হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ, ডাল মেলছে, ডালে ফুল ফুটে আছে। রাশেদ শিউরে ওঠে, এবং বিব্রত বোধ করে। শিউরে উঠে সে অস্বস্তি বোধ করছিলো, বিব্রত বোধ ক'রে সে স্বস্তি পায়। বাইরে গুলির শব্দ শোনা গেলো, মাঠে প্রস্তুতি চলছে গণতন্ত্রের, থেকে থেকে টাশ টাশ শব্দ হচ্ছে, বোমা ফাটছে, মনে হচ্ছে বারান্দায়ই; দৌড়োচ্ছে সবাই, রাশেদ শুকনো বোধ করতে শুরু করছে, কিন্তু বালিকা গোলাপের মতোই ফুটে আছে। রাশেদ বিস্মিত হয়। বালিকা বলে, আপনাকে আমি এখান থেকে বের ক'রে নিয়ে যেতে চাই। গুলি আর বোমার শব্দে রাশেদ ভয় পায় নি, কিন্তু বালিকার প্রস্তাব রাশেদকে ভীত ক'রে তোলে;—বালিকা কি জানে না তার বের হওয়ার অধিকার নেই, দেয়ালের ভেতরে থাকাই তার ও সকলের জন্যে স্বস্তিকর, বাইরে যাওয়া বিপজ্জনক? সে বাইরে গেলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভেঙে পড়তে পারে, সমাজ ধ'সে পড়তে পারে। বালিকা আবার বলে, চলুন আমার সাথে, অনেক দূরে নিয়ে যাবো আপনাকে। বালিকা এমনভাবে কথা বলছে, রাশেদের মনে হচ্ছে সে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ওই হাত নিয়তির মতো কাজ করছে, রাশেদ তা ফিরিয়ে দিতে পারছে না। রাশেদ তার সাথে ঘর থেকে বেরোয়, তার মনে হ'তে থাকে সে হাঁটতে ভুলে গেছে, বা কখনো হাঁটে নি, দরোজায় তালা লাগাতে গিয়ে তার ভুল হয়, আবার ভেতরে ঢুকে দেশলাই বাক্স খোঁজে, শেষে পকেটেই খুঁজে পায়। বালিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রাশেদ বুঝতে পারে বালিকা খুব উপভোগ করছে তার অবস্থা। বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় রাশেদ অনুভব করে সব কিছু কাঁপছে, দালানটি আর ছাদগুলো ধ'রে রাখতে পারছে না, মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে। বাইরে তখন প্রচণ্ড কোলাহল, কজন মারা গেছে রাশেদ জানে না; দূরের বারান্দা দিয়ে দৌড়ে আসছেন ডক্টর আহমেদ, ৬৪, চিৎকার ক'রে বলছেন তিনজন মারা গেছে, ভয় পেয়ে তিনি নিজের ঘরের দিকে দৌড়োচ্ছেন, কিন্তু রাশেদ আর বালিকার কাছে এসে তিনি হঠাৎ দাঁড়ান। বালিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ, যেনো শেষ মুহূর্তের আগে তিনি শান্তিদায়ক কিছু দেখছেন, তার প্রাণ ভ'রে উঠছে, এখন তিনি গোলাগুলির ভেতর দিয়ে শান্তভাবে চলতে পারবেন। বালিকা ডক্টর আহমেদের মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে, যেনো সে কোনো ডালে ফুটে আছে, এবং ডক্টর আহমেদের হাত ধ'রে বলে, আপনার ঘরে চলুন। শিশুর মতো তার সাথে হাঁটতে থাকেন ডক্টর আহমেদ, নিজের ঘরের সামনে এসে বালিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, বলেন, আর ভয় পাবো না।

কতো দূরে যেতে হবে, কতো দূরে গেলে বেঁচে উঠবে রাশেদ, বালিকা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? রাশেদের ফিরে যেতে ইচ্ছে করে বাল্যকালে, এ-বালিকা, যার মাংস থেকে গোলাপের গন্ধ বেরোচ্ছে, সে কি রাশেদকে বাল্যকালে, খেজুরডালের নিচে কুমড়োপাতার পাশে, নিয়ে যেতে পারবে? বালিকার পাশে হাঁটতে গিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেনা ভবনটিকেই তার অচেনা মনে হচ্ছে, যেনো এই প্রথম এখানে ঢুকেছে, তিনটি নদী পেরিয়ে বহু মেঠো পথ হেঁটে এখানে এসেছে, দেয়ালের কুৎসিত ভুল বানানের লেখাগুলোকেও মনোরম লাগছে। বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটা ঝলমলে আলো এসে পড়লো তার মুখের ওপর, মনেই হচ্ছে না এখানে কিছুক্ষণ আগে লড়াই হয়ে গেছে, তিনজন নতুন শহিদ জন্ম নিয়েছে; দূরে আমগাছের নিচে ব'সে আছে একজোড়া বালকবালিকা, দুজনই খুব ক্লান্ত, বড়ো বেশি ক্লান্ত, তাদের হৃদয় আর শরীর কোনোটিই আর প্রেমে রাজি নয়, বা তারা কখনোই প্রেম অনুভব করে নি তবু দিনের পর দিন ব'সে আছে আমগাছের নিচে, দুজনই নিজেদের পরিত্যাগ ক'রে তাকিয়ে আছে রাশেদ ও বালিকার দিকে। ওই বালকবালিকা দুটি এখন আর তারা নয়, তারা হয়ে উঠেছে রাশেদ ও এই বালিকা; রাশেদ কি তাদের ডেকে বলবে এখানে নয়, এ-জীর্ণ আমগাছের নিচে কিছু পাবে না, অনেক দূরে যাও? রাস্তায় আসতেই অনেকগুলো রিকশা ভিড় ক'রে এলো, দুটি বালক যারা রাশেদকে দেখলে মহাপুরুষের মতো সাধারণত চ'লে যেতো, আজ তারা সালাম দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, গুরুত্বপূর্ণ জরুরি কিছু আলোচনার আছে তাদের; দাঁত-উঁচু ছেলেটাকে বেশ লাগলো রাশেদের, এইমাত্র গাঁজা টেনে সুন্দর হয়ে এলো হয়তো। অধ্যাপক সালামত আলিও এদিকেই আসছেন, নিশ্চয়ই কোনো নতুন তত্ত্ব তাঁর মাথায় ঘুরছে, তিনি হয়তো প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কয়েক বছরের জন্যে বন্ধ ক'রে দেয়ার কথা ভাবছেন, রাশেদকে তা শুনতে হবে। তিনি রাশেদের সামনে এসে কোনো তত্ত্বই আলোচনা করলেন না, শুধু বললেন, বাহ্, মেয়েটি তো সুন্দর, তবে একে তো আপনার মেয়ে ব'লে মনে হচ্ছে না। রাশেদ বিব্রত বোধ করছে তিনি বুঝতে পারছেন, তবে তাঁর দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। রাশেদ কি এ-লোকটিকেও সাথে নিয়ে নেবে, তাঁর তো অনেক আগেই অনেক দূরে যাওয়া উচিত ছিলো, এখন গেলে কি কোনো উপকার হবে? এখন যদি মমতাজ এসে উপস্থিত হয়? রাশেদ তাকে কী বলবে? মমতাজ এসে যদি দেখে সে বালিকার পাশে রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, রিকশাঅলারা তাদের ঘিরে ধরেছে, মমতাজ কি বলবে, বাহ্, সুন্দর মেয়ে তো, যাও একটু বেড়িয়ে এসো? বালিকা রিকশায় উঠে বসেছে, রাশেদ কী ক'রে ওই রিকশায় উঠবে? রাশেদের মনে হচ্ছে রিকশাটি মেঘের সমান উঁচু, সে অতো উঁচুতে উঠতে পারবে না; এক সময় সে মেঘকে জুতোর মতো প'রে আকাশ জুড়ে হাঁটতে পারতো, এখন আর তার পা অতো উঁচুতে উঠতে অভ্যস্ত নয়। বালিকা বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলে রাশেদ একটি আশ্রয় পায়, হাত ধ'রে সে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে থাকে, মেঘের ওপর উঠে বসে।

রিকশাঅলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে হুড তুলতে; মনে হচ্ছে সে অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ, নাম-না-জানা কোনো শরিয়াবিশেষজ্ঞও হ'তে পারে, আজকাল পথে পথে শরিয়াবিশেষজ্ঞরা ছড়ানো, বা সে জানে রাশেদ আর বালিকার মতো যারা রিকশায় ওঠে, তারা ওঠে হুডের ভেতরের ঘন ছায়াটুকুর জন্যেই, বাইরের আলোর জন্যে ওঠে না, চারপাশে ছায়ার আকাল আজকাল। রাশেদ কি লুকিয়ে দূরে যাবে? সে কি অপরাধ ক'রে চলছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, জেনার মতো পাপ করছে, তাকে ধ'রে কি পাথর ছুঁড়ে মারা হবে, সাথে এ-বালিকাটিকেও? সে কি ব্যাংকক সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বালিকাটিকে নিয়ে, সে যদি তিরিশ কোটি ঋণকরা শিল্পপতি হতো, তাহলে কি আজ সে থাই বিমানের এক জোড়া টিকেট কিনতো? বালিকাটি বাসায় ব'লে আসতো দিল্লি যাচ্ছে, একটি বৃত্তি পেয়েছে এক সপ্তাহের জন্যে, আর রাশেদ গম্ভীরভাবে রটিয়ে দিতো দশ মিলিয়ন ডলারের একটা কাজে টোকিয়ো যাচ্ছে। রাশেদের এক বন্ধু তো মাঝেমাঝেই এমন ব্যবসায়ে দিল্লি ব্যাংকক যাচ্ছে, তার স্ত্রীটিই গর্বের সাথে সংবাদটা পৌঁছে দেয় মমতাজকে; ফেরার সময় এতো শাড়ি আর লিপস্টিক নিয়ে আসে যে স্ত্রীটি পাগল হয়ে যায়, স্বামীর যন্ত্রপাতির খবর নেয়ার কথা মনে থাকে না। অবশ্য স্ত্রীকে নিয়ে বছরে একবার সে হজে যায়, দুজনেই নতুন নতুন মাথার পাগড়ি কিনে ফেরে, স্ত্রীটি নামাজ পড়তে পড়তে আর স্বামীর হায়াতের জন্যে দোয়া করতে করতে দুনিয়ার কথা ভুলে যায়। সে কি তেমন কিছু করছে? রিকশাঅলাকে সে হুড তুলতে নিষেধ করে, সে দূরে যেতে চায় আলোর ভেতর দিয়েই, গাছের জলের শিশিরের ঘাসের দিগন্তের কাছে যাওয়ার সময় সে নিজের কাছে কোনো পাপ করবে না। তবে সামন পেছন থেকে যে-গাড়ি, ট্রাক, রিকশাগুলো আসছে, আর পথ দিয়ে যারা হাঁটছে, তারা যদি ঘিরে ধরে তাদের? রাশেদ যার মুখের দিকেই তাকাচ্ছে তাকেই মনে হচ্ছে খুব ক্রুদ্ধ, তারা যেনো রাশেদ ও বালিকার সম্পূর্ণ বিবরণ চাইছে, বিস্তৃতভাবে জানতে চাইছে তাদের সম্পর্ক। রাশেদের মনে হয় সবাই রাশেদ ও বালিকার দিকে তাকিয়ে আছে, এখনই তারা রিকশা থামিয়ে জানতে চাইবে, তারা কোথায় যাচ্ছে? বালিকার সাথে সে রিকশায় উঠেছে কেনো? বালিকার শাড়ির মসৃণতা সে টের পাচ্ছে, তার শাড়িতে লেগে বাতাসও মসৃণ হয়ে উঠেছে, বালিকার ডান বাহুটি নিশ্চয়ই রাশেদকে ঘেষে প'ড়ে আছে, রাশেদের মনে হচ্ছে তার বাঁ বাহুটি কয়েক জন্ম ধ'রে স্থাপিত হয়ে আছে কোনো কোমল বস্তুর ওপর। বালিকা কথা বলছে, শুধু দূরের কথা বলছে, মনে হচ্ছে সে কখনো কাছাকাছি কোথাও যায় নি, কয়েক জন্ম আগে থেকে সে শুধু দূরেই যাচ্ছে। কিন্তু রিকশার শেকল পড়তে শুরু করেছে অনবরত, রিকশাঅলা সম্ভবত শেকল পড়ার ব্যবস্থা ক'রেই বেরিয়েছে, সে নেমে শেকল লাগাচ্ছে, উঠতে না উঠতেই আবার পড়ছে; দূরে যাওয়া সহজ নয়। রিকশাঅলা আর যেতে পারবে না। দু-মাইলও আসা হয় নি, অনেক দূরে যেতে হবে, রাশেদ রিকশাঅলাকে দশটি টাকা দেয়। রিকশাঅলা তা নেবে না, তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে, রাশেদ আর বালিকা খুব অবাক হয়।

রিকশাঅলার মুখটা বদলে গেছে, শুয়োরের মুখ এস সেঁটে বসেছে তার মুখে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে সে বলে, মাইয়ালোক লইয়া বেড়াইতে বাইর অইছেন, পঞ্চাশ ট্যাকা দেন, নাইলে অপমান অইয়া যাইবেন। লোকটিকে তো এমন বদমাশ মনে হয় নি, সে তো বালিকাকে আফা আফা করছিলো ওঠার সময়; তবে কি সে রাশেদ ও বালিকার সম্পর্ক এরই মাঝে ভালোভাবে প'ড়ে উঠেছে, বুঝতে পেরেছে তারা কোনো পরিস্থিতিতে পড়তে চায় না? রাশেদ বালিকার দিকে তাকায়, বালিকা শুধু বলে, অসভ্যে দেশ ভ'রে গেছে। সে তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে একটি নোট বের ক'রে রিকশাঅলাটিকে কাছে ডেকে বলে, আপনার মতো ইতর আমি দেখি নি, এবং নোটটি তার মুখে ছুঁড়ে দেয়।

দূরে যেতে হ'লে একটা ইস্কুটার নিতে হবে, রাশেদ হাত নেড়ে একটা ইস্কুটার ডাকে, ইস্কুটারঅলা এসেই জানতে চায় তারা কোথায় যাবে। রাশেদ জানে না কোথায় যাবে, শুধু জানে দূরে যাবে; ইস্কুটারঅলাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গার নাম বলতে হবে, কিন্তু রাশেদ কোনো নির্দিষ্ট নাম জানে না। রাশেদ বালিকার দিকে তাকায়; বালিকা বলে, আমরা নদী দেখতে যাবো। ইস্কুটারঅলা মিষ্টি ক'রে হাসে, নদীর ঠিকানায় যাওয়ার জন্যে তার ইস্কুটারে এখন পর্যন্ত কেউ ওঠে নি ব'লেই মনে হয়, তার হাসিটা খুব নোংরা লাগছে না, তবে হাসিটা এক সময় শুয়োরের হাসি হয়ে উঠবে না তো? সে বলে টঙ্গি গেলে একটি নদী পাওয়া যাবে, নদীটা পুলের নিচ দিয়ে পশ্চিম দিকে চ'লে গেছে, তার নাম তুরাগ, নদী দেখতে ইচ্ছে হ'লে তারা সেখানে যেতে পারে। রাশেদ আর বালিকা নদীর স্বপ্ন দেখেছে, তবে তার বাস্তবকে কোথায় পাওয়া যাবে তা জানে না, ইস্কুটারঅলা জানে; কিন্তু সত্যিই কি এ-নামে কোনো নদী আছে? তারা ইস্কুটারে উঠে বসে। তুরাগের পারে এসে তারা নদী খোঁজে, কোনো নদী খুঁজে পায় না; ঘাটের মাঝিরা তাদের ঘিরে ধরে, বলতে থাকে এটাই তুরাগ নদী, ডাকতে থাকে নৌকোয় ওঠার জন্যে, নৌকো ক'রে তারা রাশেদ ও বালিকাকে নদী দেখিয়ে আনবে। ঘাটে বড়ো ধরনের একটা ভিড় জ'মে গেছে, তাদের কি বড়ো বেশি অচেনা লাগছে এই সব মানুষদের; তাদের দেখে কি বিস্মিত হচ্ছে মাঝিরা, নাকি তাদের ছিঁড়ে খাওয়ার স্বপ্ন দেখছে? বালিকার দিকে মাঝিদের চোখ প'ড়ে থাকছে, মনে হচ্ছে শাড়ি খুলে তারা দেখছে বালিকাকে, মরিচ দিয়ে পান্তাভাতের মতো তাকে খাচ্ছে, এবং রাশেদের বুকে ছুরি ঢুকিয়ে তুরাগ নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। হয়তো তারা এমন কিছুই ভাবছে না, ভাবছে তাদের বেড়াতে নিতে পারলে বেশ টাকা পাবে। রাশেদ ও বালিকা বুড়ো মাঝিটির নৌকোয় ওঠে, মাঝিটিকে বুড়োই মনে হয়, চুল পেকে এসেছে, খুব রোগা; বালিকা এবং রাশেদ দুজনেই তাকে পছন্দ করে। তারা দুজনেই এ-রোগা মাঝিটিকে পছন্দ করলো কেনো? ডাকাতের মতো সবল কয়েকটি মাঝি তো তাদের নেয়ার জন্যে কম দামও বলছিলো, কিন্তু তারা একে পছন্দ করলো কেনো? রাশেদ ও বালিকা কি একেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছে, এর

থেকে ভয়ের সম্ভাবনা কম ব'লে? গলুইর দিকে দাঁড়িয়ে তারা নদী দেখছে, হাত দিয়ে পানি ছুঁয়ে দেখছে, বালিকার শাড়ির পাড় উড়ে এসে রাশেদের মুখের ওপর পড়ছে, দূরে সারিসারি তালগাছ দেখা যাচ্ছে, বালিকা তার মুঠোতে রাশেদের বাঁ হাতটি তুলে নিচ্ছে। রাশেদের মনে হচ্ছে সে অনেক দূরে এসেছে, এতো দূরে বহু বছর সে আসে নি। মাঝিটি এমন সময় ডাকে রাশেদকে, তারা দুজনই মাঝির দিকে তাকায়। মাঝিটি বলে, খাড়ইয়া খাড়ইয়া পানি দেইখ্যা কি অইব, ঝাপ লাগাইয়া দুইজনে হইয়া আনন্দ করেন, আনন্দ করনের লিগাই ত সাবরা নাও ভাড়া নেয়। বুড়োটার মুখের দিকে তাকিয়ে রাশেদের ঘেন্না লাগে; তার মনে হয় এক নদী মলের ওপর দিয়ে চলছে নৌকোটি, এখনি ডুবে যাবে, তারা দুজন মলের ভেতরে তলিয়ে যাবে। বালিকা মাথা নিচু ক'রে থাকে, সে পানি থেকে তার হাত তুলে নিয়েছে, দূরের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, সব কিছু বড়ো বেশি নোংরা হয়ে গেছে, এই মাঝিটি তো নোংরা না হ'লেও পারতো। দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে কয়েকটি নৌকো বেরিয়ে আসছে, নৌকোগুলো এদিকে আসতে পারে, ওখানেও থাকতে পারে, তারা এক সাথে বেরিয়ে এলো কেনো? ওই নৌকোর মাঝিরা কি দেখতে পেয়েছে তাদের, দেখেছে একটি বালিকা দাঁড়িয়ে আছে ছইয়ের সামনে, এবং এ-নৌকোটিকে ঘিরে ধরতে পারলে চমৎকার হবে? রাশেদ মাঝিকে নৌকো ফেরাতে বলে, তাদের আর মলের নদী দেখার সাধ নেই। মলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তাদের নৌকোটি এসে ঘাটে লাগে।

এখন কোথায় যাবে বালিকা আর রাশেদ? ফিরে গিয়ে মনে মনে দেখতে থাকবে মলনদী, দেখবে মলের ভেতরে ভয়ঙ্করভাবে ডুবে যাচ্ছে তাদের নৌকো, তারা সাঁতার কাটছে মলের ভেতরে, উঠতে পারছে না, আর নিঃশব্দে চিৎকার করবে? নাকি সম্পূর্ণ শহরটাকে ভীষণভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠবে? তাদের কি এখনো সাধ আছে দূরে যাওয়ার? রাশেদের নেই, সে নরকে ফিরে যেতে পারলেই স্বস্তি পাবে; কিন্তু বালিকার চোখ থেকে এখনো দূরের স্বপ্ন মুছে যায় নি। বালিকাটির পাখি হওয়া উচিত ছিলো, ছোটো কোনো পাখি, তাহলে সে উড়ে উড়ে যেতে পারতো; আরেকটি পাখিও হয়তো সে পেতো, উড়ে যেতে পারতো তার সাথে অরণ্যে নদীর পারে শাপলার বিলে। রাশেদ পাখি নয়, অন্তত দশ বছর ধ'রে পাখি নয়, কখনো আর পাখি হয়ে উঠবে না। বালিকা অরণ্যে যেতে চায়, কয়েক মাইল উত্তরেই অরণ্য, যেখানে শালগাছ দেখা যাবে, পাখি দেখা যাবে, ঘাসের ওপর দিয়ে লাউডগার মতো প্রবাহিত সাপও দেখা যেতে পারে। রাস্তায় আসতেই বাসগুলোর বাচ্চাগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে তাদের দেখে, রাশেদ ও বালিকার চোখমুখ দেখেই বাচ্চাগুলো বুঝে ফেলেছে তাদের অরণ্যে যেতেই হবে। বালিকা আর রাশেদ একটি বাসে উঠে বসে, তাদের ওঠার সময় বাসটি তার সম্পূর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাদের সম্পর্কে বিচারবিবেচনা শুরু করে। পেছনের আসনের বুড়ো লোকটি ঘুমোচ্ছিলেন, এখন তিনি চোখ মেলে

বালিকা ও রাশেদকে বিশ্লেষণ করছেন; দু-আসন আগের মাস্তান, বা উত্তরের কোনো এলাকার গৌরব দুটি, যাঁরা রাজধানিকে ধন্য ক'রে নিজেদের সাম্রাজ্যে ফিরছেন, পকেট থেকে সোনালি বাক্সের সিগারেট বের ক'রে দামি ধুঁয়োয় এদিকটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছেন। গৌরব দুটি তাদের সাথে সাথে বাস থেকে নামবে না তো? অরণ্যের পাশে এসে বালিকা আর রাশেদ বাস থেকে নামে, তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে, কাঞ্চন জ্বলছে সবুজের ভেতর, মুঠো ভ'রে ওই সোনা বুকে রাখতে পারলে অনেক দিন কোনো অসুখ করবে না। রাশেদের জানা ছিলো না অরণ্যে ঢুকতে হ'লেও টিকেট কিনতে হয়, পঞ্চাশজনের টিকেট কিনতে হয়। তারা এখন পঞ্চাশজন কোথায় পাবে? রাশেদ কি বাসের সকলকে অনুরোধ করবে তাদের সাথে অরণ্যে দেখার জন্যে ঢুকতে? তারা কি অরণ্য দেখতে রাজি হবে? আবার সবাই যদি বালিকাটির সাথে অরণ্য দেখার জন্যে বাস থেকে নেমে আসে? রাশেদ ও বালিকা ভেতরে ঢোকে, ঢুকেই বুঝতে পারে তারা নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছে, বা অত্যন্ত দূষিত মানুষ তারা, পবিত্র অরণ্য নষ্ট করতে এসেছে; অরণ্যের পবিত্রতা অক্ষত রাখার জন্যে একপাল প্রহরী পাহারা দিচ্ছে তাদের। নাকি এরা অরণ্যের বাঘ, একটু ভেতরে ঢুকলেই লাফিয়ে পড়বে তাদের ওপর? বালিকা প্রায় প্রতিটি গাছের নাম জানে, রাশেদকে গাছের নাম শোনাচ্ছে মন্ত্রের মতো, নামগুলো রাশেদের ভেতরে ঢুকছে না, সে দেখতে পাচ্ছে দূরে একটা গাছের আড়ালে একটি লোক লুকোনোর চেষ্টা করছে। রাশেদ বালিকাকে নিয়ে ডান দিকের পথটিতে ওঠে, লোকটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে আসতে থাকে; রাশেদ একটা প্রস্তুতি নেয় মনে মনে, লোকটিকে অবশ্য হিংস্র মনে হচ্ছে না, বিনীতভাবেই সে রাশেদের সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকটির দেশিবিদেশি সব ধরনের জিনিশ আছে; কিন্তু রাশেদের দেশিবিদেশি, কেক্ক বা স্কচ, কিছুই লাগবে না; বালিকা প্রথমে বুঝতে পারে নি, বুঝতে পেরে খুব মজা পায়; লোকটিকে বলে, নিয়ে আসুন না, খেয়ে দেখি কেমন লাগে। লোকটি উৎসাহিত হয়, জামার ভেতর থেকে একটা বোতল বের ক'রে বালিকার দিকে বাড়িয়ে দেয়, বালিকা না, না ক'রে ওঠে; লোকটি উত্তর হিশেবে না শুনতে রাজি নয়, বলে যে আফারা আজকাল জঙ্গলে এসেই জিনিশ খেতে পছন্দ করেন। এক আফা তো বেরাখা প'রেই আসেন, আধা বোতল তাঁর একারই লাগে। বাঙালি মুসলমান বেশ হুইস্কি খাচ্ছে, জঙ্গলে এসেও খাচ্ছে, বা খাওয়ার জন্যেই জঙ্গলে আসছে, বেশ বিকাশ ঘটছে তাদের;—লোকটিকে এড়ানো যাচ্ছে না, চ'লে যাচ্ছে, আবার ঘুরে আসছে; সে কি ভাবছে রাশেদ সাড়া দেবেই অবশেষে, একটি বালিকাকে নিয়ে জঙ্গলে ব'সে মাতাল হওয়ার সুখ সে হারাবে না? রাশেদ গাছের দিকে তাকানোর সুযোগ পাচ্ছে না, বালিকা পাতার সবুজের দিকে তাকানোর সুযোগ পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে তারা মেথরপট্টিতে এসে পড়েছে।

আরেকজন এগিয়ে আসছে, উর্দি দেখে মনে হচ্ছে অরণ্য দেখাশোনার ভার তারই ওপর, চমৎকার সালামও দিতে শিখেছে লোকটি, সালামেই বোঝা যাচ্ছে তার সেবা পাওয়া যাবে প্রভূতপরিমাণে। আল্লা/ঈশ্বর/বুদ্ধ/জেসাস/লাত/মানত/উজ্জা/রাষ্ট্রকে ধন্যবাদ, রাশেদকে সে উদ্ধার করে হুইস্কির গ্রাস থেকে, অরণ্যটা যে বদমাশে ভ'রে গেছে তার একটা চাঞ্চল্যকর বিবরণ সে দেয়; গতকাল যে-খুনোখুনিটা হয়ে গেছে, তার কাহিনীও শাহেরজাদির দক্ষতায় বর্ণনা করে। বন্ধুর বউকে নিয়ে এক সাব এসেছিলেন, চারটা গারমেন্টস আছে, হাজার টাকা বকশিশ দেন, উঠেছিলেন দূরের কুটিরটিতে, ওই কুটিরটিই তিনি পছন্দ করেন, এবং ঘণ্টা দুই পর পিস্তল নিয়ে বন্ধু তার বউকে উদ্ধার করতে আসেন। দরোজা ভেঙে দুজনকে ন্যাংটো ধ'রে ফেলেন, গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। সে নিজে বদমাশ নয়, সাধু, সরকার তাকে অরণ্য পাহারার ভার দিয়েছে, কুটিরগুলো সে দেখাশোনা করে, এবং সাবদের। রাশেদ বুঝতে পারে তার নিপুণ কাহিনীবর্ণনা ও ভদ্রতার পেছনে কী আছে, একটু পরেই সে জানতে চায় রাশেদদের কুটির লাগবে কিনা। ভালো একটা কুটিরের সে ব্যবস্থা ক'রে দেবে, কোনো ভয় নেই, বদমাশরা ধারেকাছে ঘেষতে পারবে না, ইচ্ছে করলে দু-তিন ঘণ্টা দরোজা বন্ধ ক'রে বিশ্রাম করতে পারবে। বিশ্রাম এবং করা। না, তারা বিশ্রাম এবং করতে আসে নি, শালগাছ দেখতে এসেছে, শালগাছের পাতায় তুচ্ছ সোনা দেখতে এসেছে।
লোকটির গোপন একটি কথাও আছে রাশেদের সাথে, রাশেদকে সে ডেকে একটু দূরে নিয়ে যায়, বালিকার সামনে কথাটি বলতে চায় না, রাশেদের রাজা লাগবে কিনা খুব অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞেস করে; কুটির নিলে রাজাও সে সরবরাহ করবে, কোনো অসুবিধা হবে না। রাশেদ কি তাকে বলবে ব্যাগ ভ'রে সে রাজা নিয়ে এসেছে, যতোটুকু সময় আছে তারা একের পর এক রাজা পরতে ও খুলতে থাকবে। লোকটিকে একটি চড় দিতে পারলে বেশ হতো, কিন্তু এটা চড় দেয়ার জায়গা নয়। রাশেদ লোকটিকে একটু বিব্রত করতে চায়, বলে একটা কুটির তার দরকার, তবে যে-কোনোটি নয়, বড়ো কুটিরটি, যেটা দেখে সত্যিই তার পছন্দ হয়েছে। লোকটি বিব্রত হয়, ওটা ভারি গুরুত্বপূর্ণদের জন্যে, বড়োসাবরা এলে ওখানে ওঠেন, আগেই খবর দিয়ে আসেন; তাছাড়া ওটা এখন ব্যস্ত, এক বড়োসাব এক নায়িকাকে নিয়ে উঠেছেন ওটিতে, ওটির ধারেকাছেও ঘেষা নিষেধ। রাশেদ বড়োসাব নয়, বালিকাটিও নায়িকা নয়, বড়োসাব না হওয়ার জন্যে যে কতো কিছু হারাতে হচ্ছে তাকে! লোকটিকে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট ক'রে কি শালগাছ দেখা যাবে, লোকটির ইশারায় শালগাছ থেকে কি বাঘ নেমে আসবে না? রাশেদ তাকে বিশ টাকার একটি নোট দিয়ে একটি কাজের ভার দেয়; একটু দেখেশুনে রাখতে হবে তাদের, তারা শালগাছ দেখবে, একটু হাঁটবে, তখন যেনো তাদের ওপর বাঘভালুক লাফিয়ে না পড়ে।

প্রতিটি ঝোপই সুন্দর, দূর থেকে, মনে হচ্ছে সামনের ওই ঝোপটির ভেতরে গেলেই গাছের পাতা থেকে গায়ে লাগবে সবুজ রঙ, পত্রপত্রালির অমল সবুজ, নিশ্বাস নিতে সুখ লাগবে, কাছে গেলে আর তেমন লাগছে না, সবুজকে ময়লাধরা মনে হচ্ছে; বালিকা এক ঝোপ পেরিয়ে আরেক ঝোপে যাচ্ছে, কথা বলছে, গাছের মতো সবুজ হয়ে উঠছে, কিন্তু রাশেদের অস্বস্তি কাটছে না, প্রতিটি গাছ পাহারা দিচ্ছে তাকে, ভয় পাচ্ছে যে-কোনো সময় গাছগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর। দূরের ঝাউগাছটিকে দেখাচ্ছে অনেকটা মমতাজের মতো, চুপচাপ রাশেদ ও বালিকাটিকে দেখছে, কাছে গেলেই অনেকগুলো বিরক্তিকর প্রশ্ন করবে, রাশেদ উত্তর দিতে পারবে না, অনেকগুলো দিনরাত মুমূর্ষু হয়ে উঠবে। এ-ঝোপটি বেশ নিবিড়, কাছেই হ্রদে গাছের ছায়া সবুজ ঘন গভীব হয়ে আছে, মনে হচ্ছে জলের ভেতরে একটা অরণ্য আছে, বালিকা বসতে চাইছে, রাশেদেরও ইচ্ছে করছে বসতে; অনেক বছর এমন ছায়ায় সে বসে নি, যতো দিন বাঁচবে হয়তো বসতে পারবে না। বালিকা ও রাশেদ ঘাসের ওপরে ব'সে পরস্পরের দিকে তাকায়, যেনো অনেক বছর পর এইমাত্র দেখা হলো, কুশলবিনিময় করা হয় নি এখনো; এখন জিজ্ঞেস করতে হবে, কেমন আছো? তখন চিৎকার ক'রে দু-দিক থেকে দুটি লোক তাদের ঘিরে ফেলে, হঠাৎ চিৎকার শুনে রাশেদ ও বালিকা লাফিয়ে ওঠে। লোক দুটি তাদের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে, লুঙ্গিপরা লোকটির হাতে একটি কাস্তে, চোখ জ্বলজ্বল করছে তাদের, এখনি আক্রমণ করবে মনে হচ্ছে; তারা চিৎকার ক'রে বলছে, হারামির বাচ্চারা জঙ্গলে আইয়া কুকাম করতাছ, তোমাগ দ্যাখাইয়া দিমু। কী কুকাম করছে তারা? করলে এদের কী? কুকাম করতে চাইলে তারা একটা কুটির ভাড়া নিয়েই তো করতে পারতো। নরক তাহলে রাশেদকে ছাড়ে নি, সে শহর ছেড়ে নদীতে যেতে পারে, কিন্তু নরক ছেড়ে যেতে পারে না; সে শহর ছেড়ে অরণ্যে যেতে পারে, কিন্তু নরক ছেড়ে যেতে পারে না। রাশেদ কি চিৎকার করবে? কোনো লাভ হবে তাতে? তর্ক করবে এদের সঙ্গে? কোনো উপকার হবে তাতে? মারামারি করবে? সেটা খুবই খারাপ হবে। তারা যেহেতু এখনো আক্রমণ করে নি, সম্ভবত আর আক্রমণ করবে না, তারা শান্তিপূর্ণভাবেই কিছু চায় ব'লে মনে হচ্ছে। একটা পরিস্থিতি তৈরি ক'রে কিছু খসাতে চায়, লোক দুটি কুকামের কথাটাই বলছে বারবার, এটাই হয়তো সবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি, জঙ্গলে এসে একটি পুরুষ আর একটি বালিকা কুকাম ছাড়া কী আর করতে পারে?—কিন্তু রাশেদ কিছুই খসতে দেবে না, তবে সাবধান হ'তে হবে। একটা লোক একটু বেশিই চ্যাঁচাচ্ছে, সুনীতির জন্যে তার দরদ একটু বেশিই, লোকটিকে একটা লাথি মারতে পারলে শান্তি পাওয়া যেতো; রাশেদ বালিকার দিকে তাকায়, বালিকা ভয় পায় নি দেখে স্বস্তি পায়। সে বালিকার হাত ধ'রে ঝোপ থেকে বেরোনোর জন্যে পা বাড়ায়, সুনীতি-মিয়া তা অনুমোদন করে না, পথ আটকে দাঁড়ায়, তাদের বেরোতে দেবে না ঝোপ থেকে। কাস্তে-মিয়ার হাতে বেশি সময় নেই, ঘাস কাটা রেখে হয়তো সুনীতি-মিয়ার ডাকে উঠে এসেছে; সে কয়েক শো টাকা দাবি করে,

ওই টাকাটা দিলে কোনো ঝামেলা হবে না। টাকা যখন ব্যাপার তখন নিশ্চয়ই বেশি জটিলতা নেই, এখন আর আক্রমণ করবে না, বালিকাটিকে ধর্ষণ করতে চাইবে না। কিন্তু রাশেদ কেনো তাদের টাকা দেবে? টাক দেয়ার অর্থ কি এ নয় যে তারা কুকাম করছিলো, কুকাম করার সময় মৌলভিসাবদের হাতে ধরা প'ড়ে গেছে, তার দণ্ড হিশেবে টাকাটা দিচ্ছে? এদের সাথে সততা করবে রাশেদ, না, প্রতারণা করার একটা উদ্যোগ নেবে? রাশেদ একবার তাকিয়ে দেখলো ঝোপ পেরিয়ে কাউকে দেখা যায় কিনা, দূরে কয়েকটি লোকের মাথা দেখা যাচ্ছে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে হ্রদের পাড়ের পথটিতে নামতে পারলেই তাদের ডাকা যায়। রাশেদ পাছপকেটি হাত দিয়ে মানিব্যাগটা বের করার চেষ্টা করতে থাকে, লোক দুটিকে বেশ প্রস্তুত মনে হচ্ছে, ব্যাগটা বেরোলেই লাফিয়ে পড়বে, তবে ব্যাগটা বেরোচ্ছে না, রাশেদ ব্যাগটা এতো শিগগির বের করবে না; রাশেদ সুনীতি-মিয়াকে বললো যে ঝোপের বাইরে গিয়েই সে টাকাটা দেবে। বালিকাকে বাঁ হাতে ধ'রে ডান হাতে মানিব্যাগ বের করার চেষ্টা করতে করতে রাশেদ রাস্তায় এলো, সুনীতি-মিয়া তার সাথে সাথে আসছে, কাস্তে-মিয়া দাঁড়িয়ে আছে ঝোপের ভেতরে, আজ তাকে আর ছাগলের জন্যে ঘাস কাটতে হবে না। দূরে কয়েকটি লোক দেখা যাচ্ছে, রাশেদ হঠাৎ সুনীতি-মিয়ার মুখে একটা ঘুষি মারলো, জীবনে এটাই তার প্রথম ঘুষি, সে নিজেও ভাবে নি ঘুষিটা এতো শক্ত হবে, সুনীতি-মিয়া উল্টে প'ড়ে গেলো। রাশেদ চিৎকার করলো না, লোক জড়ো করার দরকার নেই, চিৎকার শুনে যারা ছুটে আসবে তারাও অন্য ধরনের মিয়া হবে। সুনীতি-মিয়া মাটিতে প'ড়ে গেছে, উঠতে সময় লাগবে, উঠে আর তাদের দিকে আসবে ব'লে মনে হচ্ছে না, কাস্তে-মিয়া নিশ্চয়ই ঘাস কাটতে চ'লে গেছে; রাশেদ আর বালিকা একটু তাড়াতাড়ি, দৌড়ে নয় হেঁটে, গল্প করার চেষ্টা করতে করতে, বড়ো কুটিরটির দিকে এগোতে লাগলো। একটু আসতেই দেখা হলো সে-লোকটির সাথে, যে রাশেদকে একটা কুটির দেয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলো; সে জানতে চাইলো কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা; রাশেদ বললো, না।

রাশেদ বুঝতে পারছে না তার কেমন লাগছে, বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না, জিজ্ঞেস করাটাকে তার মনে হচ্ছে নিষ্ঠুরতা, সবচেয়ে ভালো সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া যে তারা অরণ্য দেখতে এসেছিলো, দোজখ থেকে দূরে যেতে চেয়েছিলো। তাদের কি কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে, যতো দূরেই তারা যাক তার জালটি সে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ধ'রে ফেলছে পুঁটিমাছের মতো? কিছুতেই তারা দূরে যেতে পারবে না। তাদের সামনে একটা বাসযাত্রা প'ড়ে আছে, ওই বাসে যে দু-একটা বাঘ বা পুরো বাসটাই বাঘ হয়ে লাফিয়ে পড়বে না তাদের ওপর, তা কেউ জানে না। তাদের মুখে কোনো সবুজ লাগে নি, চোখে কোনো সবুজ লাগে নি, বুকে কোনো সবুজ লাগে নি, আরো অনেকখানি ময়লা লেগেছে। বালিকা খুব অপরাধী বোধ করছে, বলছে সে রাশেদকে দোজখ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, নদী

অরণ্য দেখাতে চেয়েছিলো, কিন্তু তা সে পারে নি, নিজেকে তার অপরাধী মনে হচ্ছে। একটা বাস এলে তারা উঠে বসে, চারদিকে তার তাকাতে সাহস হচ্ছে না, হয়তো বাঘ ভালুক নেকড়ে দেখতে পাবে। বালিকাটিকে এখন ধর্ষিতাই মনে হচ্ছে, সে মুখ নিচু ক'রে ব'সে আছে, তার কোনো কিছু দেখতে ইচ্ছে করছে না, যেনো তার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে রক্ত ঝরছে, তার মুখে পশুর নখের গভীর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। রাশেদ দেখছে লোকদুটি বালিকাটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সে আহত হয়ে প'ড়ে আছে, একটা ময়লা ট্রাউজার আর একটা কাস্তে উপর্যুপরি ধর্ষণ ক'রে চলছে বালিকাটিকে, বালিকাটি চিৎকার করতে পারছে না, বালিকা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রাশেদ বালিকার দিকে তাকায়, তার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, মন থেকে রক্ত ঝরছে, স্বপ্ন থেকে রক্ত ঝরছে, রাশেদ ভেসে যাচ্ছে, বাস ভেসে যাচ্ছে, পথের দু-পাশ ভেসে যাচ্ছে, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মাটি ভেসে যাচ্ছে। রক্তের ওপর দিয়ে ছুটে চলছে অন্ধ বাসটি।

১২ ভাল্লুক উল্লুক রজ্জব আলি আক্কাস আলি

একটা ভাল্লুক, আবর্জনার বাক্স খুলেই দেখতে পেলো রাশেদ, পদধূলি নিতে এসেছে উদ্দিন মোহাম্মদের; ভাল্লুকটি কিছু দেখতে পায় কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে উদ্দিন মোহাম্মদের সুবর্ণপদতল যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ছানিপড়া চোখে বোঝা যাচ্ছে, শক্তিশালী পদতল দেখতে সে ভুল করে না ব'লেই মনে হচ্ছে, ভাল্লুকটি পদতলই দেখতে চায়, যেমন ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের পল্লী জুড়ে অসংখ্য উল্লুক ভাল্লুক বেবুন বাঁদর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আছে উদ্দিন মোহাম্মদের বুটপদ্মের দিকে। ভাল্লুকটি দোয়া করতে এসেছে উদ্দিনকে, তার দোয়া ছাড়া সম্ভবত উদ্দিনের চলছে না, ভাল্লুকটি বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে উদ্দিন মোহাম্মদকে, একবার কেঁপে কেঁপে উঠে জড়িয়ে ধ'রেই ফেললো, ধরতে গিয়ে প'ড়ে যাচ্ছিলো, উদ্দিন মোহাম্মদ জড়িয়ে ধ'রে একটা বিপজ্জনক দুর্ঘটনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করে, উদ্দিন মোহাম্মদের বাহুর মধ্যে সে খুব শান্তি পাচ্ছে, পায়ে পড়লে আরো শান্তি পেতো, আল্লার কাছে কামনা করছে সে উদ্দিনের দীর্ঘ জীবন, বলছে উদ্দিন মোহাম্মদের মতো মহান রাষ্ট্রপতি পেয়ে ধন্য হয়েছে দেশ, সে শত শত বছর বেঁচে আছে শুধু উদ্দিন মোহাম্মদের মতো মহান নরপতিকে দেখার জন্যে। উদ্দিন মোহাম্মদ যে ভাল্লুকটির থেকে উৎকৃষ্ট, তাতে সন্দেহ নেই। ভাল্লুকটি অর্জন করেছে এক বড়ো কৃতিত্ব, সে ৫০৫ বছর ধ'রে বেঁচে আছে, হয়তো আরো ৫০৫ বছর বাঁচবে, তারপরও হয়তো ৫০৫ বছর বাঁচবে; যেখানে শিশুরা জন্মেই ম'রে যায়, মরাই যেখানে স্বাভাবিকতা, যুবকেরা যেখানে যৌবন পেরোতে পারছে না, সেখানে ৫০৫ বছর বাঁচা বিভীষিকাপূর্ণ কৃতিত্ব, সকলের বয়স খেয়ে সে বেঁচে আছে; এ-কৃতিত্বের জন্যে দেশ পাগল হয়ে আছে

ভাল্লুকটিকে নিয়ে। আগে ভাল্লুকটি দাবি করতো তার বয়স ৫১০ বছর, বাবর আর আকবরকে ন্যাংটো দেখেছে, বখতিয়ার খিলজিকে অল্পের জন্যে দেখে নি, সেজন্যে তার বুকে অনেক কষ্ট, দেখতে পেলে খিলজির ঘোড়ার জন্যে ঘাস নিয়ে হাজির হতো, চণ্ডীদাস তাকে পদাবলি গেয়ে শোনতো; কয়েক বছর আগে এক মেধাবী সেবক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে ৫১০ বছর বাঁচা কোনো কৃতিত্ব নয়, কৃতিত্ব হচ্ছে ৫০০ বছর বাঁচা, ৫০০ বছর বাঁচলে আয়োজন করা যায় হীরকোত্তম জয়ন্তী; তখন সে ঘোষণা করে তার পিতার স্বহস্তলিখিত আদিঠিকুজিটি তার হাতে এসেছে, তার সূর্য চন্দ্র গ্রহগুলো নির্ভুলভাবে যোগ ক'রে দেখা যাচ্ছে তার বয়স ৫০০ বছর। তখন সমগ্র জাতির মধ্যে সাড়া প'ড়ে যায়, তার হীরকোত্তম জয়ন্তী পালনের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে বাঙালি অর্থাৎ মুসলমান বাঙালি, সে-পাগলামো আজো কমে নি। সে জাতির মহত্তম ভাল্লুক, তাকে নিয়ে জাতির গৌরবের অন্ত নেই। জাতিটি শুধু সংবাদ নিয়ে দেখছে না ৫০০ বছর ধ'রে সে কী করেছে, কী করেছে তার প্রিয় রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সময়, জিন্না যখন বলেছিলো উর্দু আর উর্দুই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা, তখন ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছিলো, আর ভাল্লুকটি তিরস্কার করেছিলো ছাত্রদের, বলেছিলো কায়েদে আজমের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে, ছাত্ররা বেয়াদব। ভাগ্য ভালো, তার জাতির মাথার সে-অংশটি অসুস্থ, যার কাজ তথ্য ধারণ ক'রে রাখা। সে-ভাল্লুকটি পদধুলি নিতে এসেছে উদ্দিন মোহাম্মদের, ৫০০ বছর ধ'রে যে-আবর্জনা সে জড়ো করেছে, তার একটি স্তূপ উপহার হিশেবে নিয়ে এসেছে উদ্দিন মোহাম্মদের জন্যে; উদ্দিন মোহাম্মদও ধন্য হ'তে জানে, সে উপহার পেয়ে ধন্য হচ্ছে এমন একটা অভিনয় করছে, ওই উপহারের বিনিময়ে উদ্দিন মোহাম্মদ ভাল্লুকটি কয়েক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। পদতলে চুমো খেয়ে মুদ্রা অর্জনের জন্যেই ভাল্লুকটি এসেছে বুঝতে পারছে রাশেদ। রাশেদের ঘেন্না লাগছে, না তার ঘেন্না লাগছে না, তার খুব ভালো লাগছে, এসব দেখতে দেখতে তার অনুভূতিপুঞ্জ সাভারের মোষের ঘাড়ের মতো হয়ে গেছে; ঘেন্না লাগছে না, তার বমি পাচ্ছে। সে কি আবর্জনার বাক্সটিকে উপহার দেবে তার হলদে বমিটুকু? তার জাতির গৌরব পদতল চাটছে উদ্দিন মোহাম্মদের, পদতল চাটার দৃশ্য ঘুরে ফিরে দেখানো হচ্ছে টেলিভিশনে, রাশেদের মনে হচ্ছে সে নিজেই পদতল চাটছে উদ্দিন মোহাম্মদের।

জাতির গৌরব কর্তৃক শয়তানের পদতল চাটার দৃশ্য দেখা এটাই প্রথম আর শেষ নয় রাশেদের, বাঙলার গৌরবগুলো বদমাশ হ'তে পারে শয়তানের থেকেও; এমন আরো অনেক দেখেছে রাশেদ, তাতে তার বুক ভ'রে আছে, বেঁচে থাকলে আরো দেখবে, তার বুক উপচে পড়বে। রাশেদের এ-মুহূর্তে মনে পড়ছে সে-চমৎকার উল্লুকটিকে, জাতির বিবেক হয়ে উঠেছিলো যে, মুখ খুললেই যে গলগল ক'রে বলতো ছাগল মানে শিং নিচু না করা, সেই উল্লুকটির সাথে এই ভাল্লুকটিকে মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে রাশেদের; ছাগল মানে শিং নিচু না

করা—তার কথাটি মনে দাগ কেটেছিলো ছাগলসম্প্রদায়ের, তারা মুখ ফাঁক করলেই জিভের তলা থেকে বেরিয়ে পড়তো ছাগল মানে শিং নিচু না করা, এবং তারা কখনো শিং নিচু করতে চাইতো না, যদিও কখনো খুঁজে দেখতো না তাদের মস্তকে আদৌ কোনো শিং আছে কিনা। উল্লুকটি তখন বিবেক হয়ে ওঠে নি, একবার তাকে দেখতে গিয়েছিলো রাশেদ, গিয়ে দেখতে পেয়েছিলো একটা অন্ধকার ঘরে পরিত্যক্ত পশুর মতো প'ড়ে আছে, বেশি দিন বাঁচবে না, রাশেদকে দেখে সে খুব খুশি হয়েছিলো, অনেক দিন কেউ তার খোঁজ করে নি, কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কাঁদছিলো সে। কিছু দিন পরেই সে বিবেক হিশেবে দেখা দিতে থাকে। বাঙালি একটি বিবেক পেয়ে ধন্য বোধ করে, অনেক বছর দেশ থেকে যাত্রা উঠে গেছে ব'লে বিবেক সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না ছাগলসম্পদ্রায়ের, কিন্তু এ যখন চিৎকার ক'রে ওঠে ছাগল মানে শিং নিচু না করা, তখন তারা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। পরাধীন বাঙালি একদিন স্বাধীন হয়, কী বিস্ময়!—আর ওই বিবেকটির চাঞ্চল্যকর বিকাশ ঘটতে থাকে, বিবেকের কথা বলতে বলতে সে ছাগলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বড়ো বড়ো পদের ওপর বসতে থাকে, এবং অভ্যাসবশত পথেঘাটে ডেকে যেতে থাকে তার শেষ কথা—ছাগল মানে শিং নিচু না করা। রাশেদ তার বিকাশ দেখে শিং নিচু না ক'রে মাথা নত করেছে মনে মনে, তবে একটা সন্দেহ তার কাটে নি। রাশেদ ছেলেবেলায় বিবেকের লেখা একটা বাজে বই পড়েছিলো, জিন্নাকে নিয়ে লেখা বই, সে অবশ্য জিন্না বলে নি, বলেছে কায়েদে আজম, যাতে জিন্নার প্রতি ভক্তিতে সে ছিলো গদগদ, জিন্না তার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, আর পাকিস্থান এক মহান দেশ, যার জন্যে সে জান কোরবান করতে ছিলো প্রস্তুত। কয়েক বছরের মধ্যেই জাতির বিবেকটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে বিবেকের ভারে, শিং উঁচু রাখতে ভুলে যায়, তার শিং খ'সে পড়ে; দেশে একটি একনায়ক বালক দেখা দিলে বালকটির পায়ে বিবেকটি মাথা রেখে জীবনকে সফল ক'রে তোলে। বিবেক বাঁদর হয়ে ওঠে একনায়কের, বাঁদরামো করতে থাকে সমস্ত চৌবাস্তায়, শরীর ফুলে উঠতে থাকে, ছাগল মানে শিং নিচু না করার কথা তার আর মনে থাকে না। একনায়ক বালকটি একদিন লাথি মেরে ফেলে দেয় তাকে, সেই শোকে বিবেক মারা যায়, নিশ্চয়ই সে যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে ফিরে গেছে। এখন দেখা দিয়েছে ভাল্লুকটি, ভাল্লুক যেখানে গৌরব সেখানে উদ্দিন মোহাম্মদ দেখা দেবেই। রাশেদ খোঁচা দিয়ে বাক্সটি বন্ধ ক'রে দেয়।

ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের গ্রাম উপচে পড়ছে সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়তে, রাশেদ তুমি কখনো তা হ'তে পারবে না, রাশেদ পরিহাস করছে নিজেকে, তুমি যা করছো তাতে জীবনটা তোমার শেয়ালের খাদ্য হবে, মরার পর শেয়ালও খাবে না, এবং ভাবছে সর্বজনপ্রিয়শ্রদ্ধেয় রজ্জব আলির কথা, রজ্জব আলিকে খুব শ্রদ্ধা করে রাশেদ, কে তাকে শ্রদ্ধা করে না? রজ্জব আলিও প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতির গৌরব হয়ে ওঠার, বঙ্গোপসাগরে গ্রামটা ডুবে না গেলে একদিনই হয়ে উঠবেই, ৩৫

বছর ৫ মাসেই সে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে, যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি তার চরিত্র তেমনি তার পাঞ্জাবি, শহিদ মিনারে তাকে পাওয়া যাচ্ছে সকালবিকেল, শুধু সন্ধ্যার পর পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ বলতে পারে না সন্ধ্যা হ'লে কোথায় যায়। রজ্জব আলির কোনো দুর্নাম হয় না, ভূমণ্ডলের একক রাজহংস রজ্জব আলি, কাদায় সন্ধ্যাভর ডুবসাঁতার কাটার পরও তার পালকগুলো শুভ্র থাকে। কিছু দিন আগে উদ্দিন মোহাম্মদের প্রতিনিধি হয়ে পশ্চিমে ঘুরে এসেছে, এসেই শহিদ মিনারে গেছে, সবাই তাকে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সে যে খুব বিদ্রোহী রাশেদ তাতে কোনো সন্দেহ পোষে না, কিছু দিন আগেই তার বিদ্রোহের একটা জ্বলন্ত উদাহরণ দেখতে পেয়েছে জাতি। উদ্দিন মোহাম্মদ আরো দশটা সর্বজনশ্রদ্ধেয়র সাথে তাকে একটা পদক দিয়েছে, পদকের ঘোষণা শুনেই সর্বজনশ্রদ্ধেয়দের পেছনের অস্থি বেঁকে গেছে, বাঁকে নি শুধু রজ্জব আলির। উদ্দিন মোহাম্মদ পদক বিলোনোর জন্যে আয়োজন করেছে জাতীয় অনুষ্ঠানের, তারারা আড়ম্বর অত্যন্ত ভালোবাসে, দিকে দিকে সাড়া প'ড়ে গেছে, অন্যান্য উজবুকগুলো তাদের শ্রেষ্ঠ পাঞ্জাবি স্যুট আচকান প'রে গিয়ে উঠেছে সেখানে, রজ্জব আলি যায় নি, উদ্দিন মোহাম্মদের হাত থেকে সে পদক নিতে পারে না, সে বিদ্রোহ করেছে, সে পদক নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে তার সহধর্মিণীকে। রজ্জব আলি পদকমন্ত্রীকে জানিয়েছে সে অসুস্থ ব'লে উপস্থিত থাকতে পারছে না, এটা রজ্জব আলির এক মারাত্মক বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ ক'রে অসুস্থ হয়ে প'ড়ে আছে, সে উদ্দিন মোহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, তার মেরুদণ্ড বেঁকে গেলেও ভাঙবে না। সহধর্মিণীটিকে সে পাঠিয়েছে, সহধর্মিণীর আবার সম্মান কী, সম্মান বিসর্জন দেয়ার পরই তো মেয়েলোক সহধর্মিণীর মর্যাদা পায়, তাকে যেখানে ইচ্ছে পাঠানো যায়, উদ্দিন মোহাম্মদের কাছেও পাঠানো যায়, সহধর্মিণীর ধর্মই হচ্ছে নিজেকে অপমানিত ক'রে পরমগুরুর গৌরব বাড়ানো। রাশেদ আবার টেলিভিশনটা খোলে, আরো দু-একটি উল্লুকভাল্লুক দেখতে ইচ্ছে করছে আজ সন্ধ্যায়, সে একটা ভাঁড়কে দেখতে পায়, এটা এখন বাজারের শ্রেষ্ঠ ভাঁড়, অন্যান্য ভাঁড়রা হার মেনে আত্মহত্যার কথা ভাবছে, সে গান গেয়ে চলছে উদ্দিন মোহাম্মদের। দু-দিন পর একটা হরতাল ডাকা হয়েছে, ঘন ঘন হরতাল হচ্ছে আজকাল, সে ভার নিয়েছে হরতাল থামানোর, একপাল মেয়েকে নিয়ে সে নাচছে, নেচে নেচে দেখাচ্ছে হরতাল হ'লে রিকশাঅলার কতো কষ্ট, ভিখিরির কতো কষ্ট, গরিবের কতো কষ্ট, কষ্টে তার বুক চৌচির হয়ে যাচ্ছে, আর দশটা কম্পিউটার চিৎকাৎ ক'রে দেখাচ্ছে হরতালে দেশের একদিনের ক্ষতি ৮৬৯৮৭৬৮৯৭৬৫৪৩২৫৬৭৮ কোটি টাকা। ভাঁড়টা চার বছর আগে বন্দনা গাইতো আরেকটি একনায়কের, তখনো ছিলো সে ভাঁড়োত্তম, একনায়কটি নিয়তির দিকে এগিয়ে গেলে, একনায়কটির একটা ছেঁড়া ময়লা আন্ডারওঅ্যার নিয়ে সে হাজির হয় টেলিভিশনে, আন্ডারওঅ্যার জড়িয়ে ধ'রে বুকে নিয়ে মুখে বুলিয়ে চুমো খেয়ে একঘণ্টা ধ'রে কাঁদে, আরো ঘণ্টাতিনেক সময় তার কান্নার জন্যে বরাদ্দ ছিলো, কিন্তু এক ঘণ্টায়ই সে শহরের সব গ্লিসারিনের

বোতল নিঃশেষ ক'রে ফেলে, তাই এক ঘণ্টায়ই অনুষ্ঠান শেষ করতে বাধ্য হয়। তার কান্না দেখে দেশজুড়ে দর্শকরা হেসে লুটিয়ে পড়েছিলো, দেশবাসীর হাসার শব্দ উঠছিলো দিগদিগন্ত থেকে, চট্টগ্রামের হাস্যরোল দিনাজপুরে যশোরের অট্টরোল সিলেটে বিক্রমপুরের হাস্যলহরী চুয়াডাঙ্গায় শোনা গিয়েছিলো। এর আগে সে এতো এবং এমন লোক হাসাতে পারে নি, সে-দিনই সে জাতিকে উপহার দিয়েছিলো তার সর্বোত্তম ভাঁড়ামো, জনগণ তাকে ভাঁড়োত্তম উপাধি দিয়েছিলো, এবং জনগণের অনুরোধে তার সে-কৌতুকানুষ্ঠান দেখানো হয়েছিলো ছ-মাস ধ'রে। রাশেদ ভাঁড়টিকে দেখে মজা পাচ্ছে, একই সন্ধ্যায় একটি ভাল্লুক ও একটি ভাঁড়োত্তম দেখে বুকে তার খুব উল্লাস হচ্ছে।

এ-বাক্স, আবর্জনার বাক্সটিই এখন বাঙলাদেশ, ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল বিশ ইঞ্চিতে পরিণত এখন, এ-বাক্স এখন বহুগুণে সত্য বাঙলাদেশের থেকে, এ-বাক্স বাস্তবতার থেকে অনেক বেশি বাস্তব। কিছু আর সত্য নয়, যা এ-বাক্সে আবর্জনারূপে জমে না, আর তাই প্রতিভা যা এ-বাক্স থেকে বিচ্ছুরিত হয়। সত্য হচ্ছে, ভাঁড়টি যেমন ব'লে গেলো, দু-দিন পর হরতাল হবে না, হরতালের হওয়ার কোনো সাধ্য নেই, বাক্সের বাইরের কোনো সত্যই সত্য নয়, রাশেদ জানে দু-দিন পর দেখা যাবে দেশজুড়ে হরতাল হ'লেও দেশজুড়ে হরতাল হয় নি। আর প্রতিভা হচ্ছেন ওই অধ্যাপক আক্কাস আলি, যিনি চক্করবক্করফক্কর প'রে 'আলতুফালতু' নামের মাখাজিন উপস্থাপন করছেন, বারবার ওপরের ঠোঁটের থুতু চাটছেন নিচের ঠোঁট দিয়ে, আর নিচের ঠোঁটের থুতু চাটছেন ওপরের ঠোঁট দিয়ে, চাটার ভঙ্গিটি তাঁর অপূর্ব ঠোঁট দুটি একটু দীর্ঘ ব'লেই, তিনি এখন নাচের ভেতর দিয়ে গান আর গানের অভ্যন্তর দিয়ে যে-নাচটি পরিবেশিত হবে, তার ভূমিকা পেশ করছেন, দর্শকদের তালি বাজাতে বলছেন, তবে গোঁফে এক টুকরো থুতু আটকে তাঁকে বিব্রত ক'রে তুলছে, তিনি তাঁর বাক্যগুলোকে যথেষ্ট চিবোতে পারছেন না, তাই সুস্বাদু লাগছে না। অধ্যাপক আক্কাস বইটই পড়ছেন না আজকাল, লেখার চেষ্টা করেছিলেন শুভবিবাহের আগে, আর লিখতে পারেন নি—একটা তিনবছুরে বই ছাড়া; তিনি প্রতিভা, যেহেতু তিনি বাক্সে আলতুফালতু করেন। আগের একনায়কটি তাঁর ঠোঁট চাটা পছন্দ করতো না, আশ্চর্য, একনায়কদেরও রুচিবোধ থাকে, তাই তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বাক্স থেকে, তাতে আক্কাস আলির একটা ছোটোখাটো স্ট্রোক হয়েছিলো, উদ্দিন মোহাম্মদ আসার পর তিনি আবার প্রতিভা বিকাশ ক'রে চলছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির জন্যে মায়া হয় রাশেদের, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গৌরব বোধ করে আক্কাস আলিকে নিয়ে, বইটই সবাই লিখতে পারে, আলতুফালতু করতে পারেন শুধু অধ্যাপক আক্কাস আলি। আক্কাস আলি এখন একটি বালিকার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, ঢলঢল করছে বালিকাটি, আক্কাস আলি একটু বেশি ক'রে ঠোঁট চাটছেন, তিনি বালিকার প্রতিভা বর্ণনা করছেন, শুনে মুগ্ধ হচ্ছে রাশেদ, চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ছে তার রক্তমাংসে, রাশেদ বালিকাটিকে চিনতে পারছে, দু-দিন আগে তিনঘণ্টা

ধ'রে রাশেদ তো এ-প্রতিভাময়ীরই সোনালি জীবনের রুপোলি পুরাণ আর নীল কথকতা পাঠ করেছে। রাশেদ সেদিন ঘরে ফিরে শুনতে পায় মমতাজ মৃদুকে কী যেনো প'ড়ে শোনাচ্ছে, সম্ভবত রূপকথা শোনাচ্ছে, মৃদু আজকাল দিনরাত গল্প শুনতে চায়, ওর জন্যে একটি শাহেরজাদি দরকার, রাশেদের রূপকথার সব মজুত ফুরিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই মমতাজের সংগ্রহও নিঃশেষ, তাই পত্রিকা থেকেই প'ড়ে শোনাচ্ছে, মৃদু মনপ্রাণ দিয়ে শুনছে সে-রূপকথা। মমতাজ পড়ছে, আকবর তার তন্বী লাস্যময়ী নববধূকে নিয়ে কক্সবাজার যাচ্ছে, মাত্র তিন মাস হলো বিয়ে হয়েছে তাদের, পাজেরো চালাচ্ছে কোটিপতি আকবর নিজে, পাশে তার রূপসী যৌবনবতী বধূ লায়লা। লায়লার চুল উড়ছে, তার চোখে সাগরের স্বপ্ন, প্রেমের স্বপ্ন, এমন সময় আকবর তার পাজেরো থামায় নির্জন রাস্তার পাশে। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, চাঁদের আলোতে লায়লা হয়ে উঠেছে আরো রূপসী, চাঁদের আলোর মতোই তার শরীরে যৌবনের জোয়ার। আকবর একটা কোকের বোতল তুলে হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত করলো লায়লার মাথায়, লায়লা লুটিয়ে পড়লো, একটি ছুরি ঢুকিয়ে দিলো আকবর লায়লার পেটে। রাশেদ থমকে দাঁড়িয়ে শুনছিলো রূপকথা, মৃদু কি আজকাল এ-রূপকথাই শুনছে? নতুন রূপকথা জন্ম নিচ্ছে দেশজুড়ে, যা অনেক বেশি শিহরণজাগানো লালকমল নীলকমল তুষারকন্যার থেকে। মমতাজ একটু থামতেই মৃদু বলছে, আরো পড়ো আম্মা, আরো পড়ো, তার রক্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, নীলকমল লালকমল তাকে এতোটা উত্তেজিত করে নি; মমতাজ পড়ছে, আজরাত ভোর হওয়ার আগে পাষণ্ড আকবরের ফাঁসি হবে, সকাল থেকেই তাকে তৈরি করা হচ্ছে ফাঁসির জন্যে। দেশ ভ'রে খোঁজার পর একজন জল্লাদ পাওয়া গেছে, জল্লাদ পাকা কলা দিয়ে বারবার ফাঁসির রশি মেজে রশিটিকে পিচ্ছিল করেছে, আজো সে রশির গায়ে পাকা কলা মাখবে, আকবরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে কী খেতে চায়, আকবর বলেছে সে সিগারেট খেতে চায়, কাকে দেখতে চায়, আকবর বলেছে সে তার উপপত্নী নুরজাহানকে দেখতে চায়। রাশেদ মমতাজকে ডাকে; পড়া রেখে মমতাজ মাথা তুললে মৃদু উত্তেজিত হয়ে বলে, আরো পড়ো আম্মা, আরো পড়ো আম্মা, আরো শুনতে ইচ্ছে করছে। ভয় পেয়ে রাশেদ তাকায় মৃদুর দিকে; মৃদু কাঁপছে, নতুন কালের রূপকথা তাকে উত্তেজিত ক'রে তুলেছে, তার স্বপ্নকে তোলপাড় ক'রে চলছে এই সময়ের নায়ক।

দুপুরের খাওয়ার পর রাশেদ চিৎ হয়ে শুয়ে ওই পত্রিকাটি খুলে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মৃদুর থেকেও; এতো দিন পর পড়ার মতো একটা জিনিশ সে পেয়ে গেছে, এর পর সে এসবই পড়বে, বালিকা আর বালিকা, লাস্য হাস্য যৌবন নিতম্ব ওষ্ঠ স্তন জংঘা জঘনবতী কিশোরীরা পাতার পর পাতা, রঙিন শাদা কালো বালিকা লাল নীল সবুজ হলুদ বালিকা কালো নীল সবুজ বালিকা রঙিন শাদা কালো লাল নীল সবুজ হলুদ। বালিকাদের সময় চলছে এখন, যুবতী কেউ চাইছে না, বালিকা চাইছে সবাই, বালিকা, আরো বালিকা। এই বালিকার বাহু তুলনাহীন। ওই

বালিকার নিতম্ব অতুলনীয়। ওই বালিকার বক্ষ অনির্বচনীয়। আক্কাস আলির বালিকাটিও আছে এর মধ্যে, বড়ো বেশিই আছে, তার সব কিছু উপচে পড়ছে, মাধ্যমিক পেরোয় নি, হয়তো আর পেরোবে না, কিন্তু উপচে পড়ছে সম্মুখ পেছন ওপর নিচ, সে—ইংরেজি বাঙলা মিলিয়ে মিশিয়ে—বলছে জীবন অ্যাকটা স্বপ্ন, রঙিন ড্রিম, সে নায়িকা হ'তে চায়, নায়িকা না হ'লে সে বাঁচবে না, তাই সে মডেলিং করছে, পাঁচটা ছবিতে সই করেছে এরই মাঝে। অভিনয় হচ্ছে আর্ট, আর্ট হচ্ছে তার জীবন। বালিকা চমৎকার চমৎকার কথা বলেছে, সে খুব ধার্মিক, সময় পেলেই নামাজ পড়ে, 'দাউদাউ দিল', যার ইংরেজি নাম 'ফায়ারিং হার্ট', ছবিটার শুভমহরতের পরই সে আজমিরশরিফ যাবে, হজ করারও তার খুব ইচ্ছে আছে। সে খুব ভালো মেয়ে, প্রেম করে না, বিয়ের আগে প্রেম করাকে সে খারাপ মনে করে, বিয়ের পর স্বামীর সাথে প্রেম করবে, স্বামীর পায়ের নিচেই তার বেহেস্ত সে বিশ্বাস করে; সে সেক্স পছন্দ করে না, তবে আর্টের দরকারে যদি সেক্স করতে হয়, কাপড় খুলতে হয়, সে সেক্স করবে, কাপড় খুলবে, কেননা সবার ওপরে আর্ট, আর্টের দাবি সে পূরণ করবে, আর্টের দাবি পূরণ না করা পাপ। বালিকা অনেক কিছু জানে, এও নিশ্চয়ই জানে একটি আর্টের নাম প্রযোজক, আরেকটি আর্টের নাম পরিচালক, সে কি ওই আর্টগণের দাবিও মেটাবে? বোধ হয় এরই মাঝে মিটিয়েছে, নইলে মাধ্যমিকেই এতো উপচোচ্ছে কীভাবে?

সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী তার কাছে জানতে চেয়েছে তার প্রিয় উক্তি কী, সে বলছে, তার প্রিয় উক্তি শেক্সপিয়রের 'নো দাইসেল্ফ' (যেমন মুদ্রিত), তার প্রিয় উপন্যাস শেক্সপিয়রের 'ওআর অ্যান্ড পিস' (যেমন মুদ্রিত), বালিকা ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া সম্ভবত আর কোনো সাহিত্য পড়ে নি। সে বলছে সত্যজিৎ তার কাছে গডের মতো, গডের থেকেও বড়ো, ইচ্ছে হয় তার কাছে গিয়ে বলে, আমার সব কিছু আপনি নিন, কিন্তু বালিকা *পথের পাঁচালী*র লেখকের নাম মনে করতে পারছে না, তার মনে হচ্ছে ওই স্টোরিটা রবীন্দ্রনাথ ল্যাখছে, রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো স্টোরি লিখতে পারতেন। আক্কাস আলি শক্ত দাঁত দিয়ে মটরের মতো চিবোচ্ছেন বাঙলা শব্দগুলো, বালিকাটিকেও চিবোচ্ছেন মনে হচ্ছে, বলছেন বাঙলার বালিকাদের হ'তে হবে এ-রূপসী লাস্যময়ী বালিকার মতো, তার মতো রূপে ঝলসে দিতে হবে আকাশমাটি, তার পথেই এগিয়ে যেতে হবে বালিকাদের, জয় করতে হবে সব রকমের পর্দা, এখন একটি রাজ্যই জয় করার উপযুক্ত, সেটি হচ্ছে পর্দা, সেটি জয় করতে হবে, জয় করতে হবে সকলের স্বপ্ন। বাঙলাদেশ তাদের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে;—আক্কাস আলি সম্ভবত বালিকাদের অন্য কোনো অঙ্গের কথা বলতে চাইছিলেন, এ-বালিকার একটি অঙ্গের ওপর বেড়ালের মতো আক্কাস আলির চোখ প'ড়ে আছে, কিন্তু রাষ্ট্রধর্মের দেশে বলতে পারছেন না, প্রকাশ্যে এখানে মুখের দিকেই তাকাতে হয়, গোপনে অন্যান্য অঙ্গের দিকে। বালিকারা অবশ্য এগিয়ে যাচ্ছে, মডেল/হিরোইন/বাইজি জন্ম নিচ্ছে ঘরে ঘরে;

জনকজননীরা কন্যা জন্ম দিয়ে আর স্থির থাকতে পারছে না, মাটিতে পুঁতে ফেলছে না, ঘরে একটা মডেল/হিরোইন/বাইজি সৃষ্টি ও নির্মাণের জন্যে দিকে দিকে ছুটছে। কয়েক দিন ধ'রে শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে শিল্পকলার ধুম লেগেছে, আমিরাত থেকে এক মহান আমির বাঙালি/বাঙলাদেশি শিল্পকলা খেতে এসেছেন, বোম্বাই শিল্পকলা খেতে খেতে তার অরুচি ধ'রে গেছে, শিল্পকলা অ্যাকাডেমি তাকে শিল্পশবরিকলা খাওয়াচ্ছে। সন্ধ্যার পর তাঁর নাচঘরে নর্তকীদের পায়ে তিনি বেঁধে দিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা, একরাতে কয়েক লাখ, টাকার থলে পায়ে বেঁধে নেচে চলছে বাঙলাদেশি শিল্পকলারা, তিনি খাচ্ছেন, আর পাগল হয়ে যাচ্ছে অ্যাকাডেমির পরিচালক, শুতে যাওয়ার পরও তিনি শিল্পকলাগণের জননীদের টেলিফোন পাচ্ছেন, কাতরভাবে জননীরা আবেদন করছে, এক রাতের জন্যে আমার মেয়েকে একটা চান্স দিন। বয়স থাকলে কন্যাদের হটিয়ে দিয়ে জননীরাই এক রাতের জন্যে একটা চান্স নিতো, তা হচ্ছে না, আমির পাকাপচা কলা খেতে পছন্দ করেন না।

আক্কাস আলির 'আলতুফালতু'তে এখন কথা বলছেন, ঐশী উচ্চারণ ক'রে চলছেন, দোনাগাজি, দেশের মুখ্য মহামহোপাধ্যায়; কবিও, সমালোচকও, এবং সব কিছু। পাকিস্থানের জন্যে বদ্ধপাগল ছিলেন তিনি একদা, বলেছিলেন পাকিস্থানের জন্যে বাঙালি মুসলমান বাঙলা ভাষা বাদ দিতে রাজি, বাঙলা মুসলমানের ভাষা নয়; আর একাত্তরে চাপে প'ড়ে পালিয়েছিলেন দেশ থেকে, ফিরেছিলেন বড়ো একটা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে, দেশে থাকলে হতেন আলবদরদের প্রধান, সেই তিনি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ফিরে একটির পর একটি পুরস্কার নিয়েছিলেন, আর পঁচাত্তরের পর ইঁদুর পুনরায় ইঁদুর হয়েছেন। আগের একনায়ক বালকটির পা ধ'রে একটা বড়ো পদ পেয়েছিলেন, পরে বালকটি তাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলো, সে-শোকে মুহ্যমান ছিলেন কয়েক বছর, এখন দেখা দিয়েছেন আবার, উদ্দিন মোহাম্মদের পদচুম্বন ক'রে পদকের পর পদক পাচ্ছেন, সেই দোনাগাজি সন্ধ্যাভাষায় উচ্চারণ ক'রে চলছেন তাঁর মন্ত্র;—তিনি কথা বলেন না, উচ্চারণ করেন, অনবরত উচ্চারণ করেন, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর উচ্চারণ শোনে, রাশেদও শুনছে, তার মগজের ভেতর দিয়ে একটা পিচ্ছিল সাপ এঁকেবেঁকে চলছে। তিনি তাঁর গাভীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, যদিও আক্কাস আলি তাঁকে তাঁর গরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি গাভীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, যেহেতু গরুর থেকে গাভী অনেক বেশি নন্দনতত্ত্বসম্মত; দোনাগাজি বলছেন, গাভী হচ্ছে অন্ধকারে অনবরত উচ্চারণ, গাভী হচ্ছে একটি নির্মাণ, ওই নির্মাণকে আমরা সতত আবিষ্কার করি উচ্চারণের মধ্যে, যেমন আমরা অন্ধকারে তমালকে আবিষ্কার করি দ্বিদল ফুলকে আবিষ্কার করি, তাকে নির্মাণ করি আত্মার মধ্যে যেমন করেছেন দান্তে এবং বাল্মীকি, তেমনি গাভী হচ্ছে অন্ধকারে আত্মার অনবরত উচ্চারণ অনবরত আবিষ্কার। রাশেদের ইচ্ছে করছে ওর মুখমণ্ডলে, ঘন বিকশিত শ্মশ্রুতে, গাভীর পেছন দিক থেকে সারবস্তু আবিষ্কার ক'রে এনে মেখে

দিতে। পল্লীটি ভ'রে গেছে এসব প্রাণীতে, ভাল্লুক উল্লুক রজ্জব আলি আক্কাস আল ভাঁড়োত্তম দোনাগাজিতে, রাশেদ তুমি কোন দিকে যাবে? রাশেদ কি মজনুর পথে নেমে যাবে, মজনুর মতো খুঁজে চলবে সত্যকে, খাঁটিকে, পথে যা-ই পাবে, তা-ই ঘ'ষেই দেখবে জিনিশটি খাঁটি কিনা? মাঝেমাঝে রাশেদের কি মনে হচ্ছে না সে মজনু হয়ে উঠছে, এর চেয়ে মজনু হয়ে যাওয়াই ভালো?

মজনু বিশ্বাস করতো, স্বপ্ন দেখতো দেশটা স্বপ্নের দেশ হয়ে উঠবে; স্বপ্নটা তার ব্যক্তিগত ছিলো, এবং যাদের সে বিশ্বাস করতো তাদের থেকেও পেয়েছিলো অনেকখানি; বিশ্বাস ছিলো তার গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা প্রগতি নেতায় কবিতায়, এবং আরো অনেক কিছুতে; গত বছর হঠাৎ তার সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায়, সে চারদিকে মলের মতো ছড়ানো মিথ্যা দেখতে পায়। সবই তার মনে হ'তে থাকে মিথ্যা, তার প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্দিন মোহাম্মদ নেতা নেত্রী গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা প্রগতি সবই তার কাছে মিথ্যা ব'লে প্রতিভাত হ'তে থাকে, সত্য আর খাঁটিকে পাওয়ার জন্যে সে পথে নেমে যায়। চারপাশে যা কিছু চলছে, তা মুকুটখচিত শয়তান ছাড়া কারো পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, মজনু শয়তান হয়ে উঠতে পারে নি, সে পথে নেমে গেছে; তার কাছে ওই উদ্দিন মোহাম্মদ যেমন প্রচণ্ড মিথ্যা, তারাখচিত সেনাপতিরা যেমন মিথ্যা, তেমনি মিথ্যা ওই নেতানেত্রী, মিছিল, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মঞ্চ; সে সব কিছুর ভেতরে ঢুকে দেখেছে বাইরের ঝলমলে মুখোশ পেরিয়ে গেলে মিথ্যাই শুধু প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তারপর থেকেই সে সত্য খুঁজতে থাকে। তার আর গৃহ দরকার পড়ে না, দরকার পড়ে না শয্যা, পরিচ্ছন্ন অটুট বস্ত্রের দরকার হয় না, গাল কামাতে হয় না, বালিকাদের দেখে সে বিব্রত বোধ করে না, মিছিলেও যায় না। চারপাশের মিথ্যার বাস্তবতা পেরিয়ে ঢুকেছে সে সত্যের বাস্তবতায়; সে নিজের মনে একলা হাঁটে, সত্যকে পেতে চাই, খাঁটি তুমি কোথায়—ধরনের উক্তি করতে করতে শহরের পথে পথে হাঁটে, ইচ্ছে হ'লে সত্যের খোঁজে বড়ো বড়ো ভবনেও ঢুকে পড়ে। প্রথম দিকে তার অবস্থা দেখে পরিচিতরা ব্যগ্র হয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করতো সামনে গিয়ে, একটি ঘটনার পর এখন আর পরিচিত কেউ সে-সাহস পোষণ করে না। তাকে দেখলে উজ্জ্বল মিথ্যারা দূর থেকে দূরে ছুটতে থাকে। মজনু সেদিন তার সত্যের খোঁজে মিরপুর সড়ক থেকে একটি গলির ভেতর দিয়ে ঢুকে আরেকটি গলির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে হাতির সড়ক ধ'রে হাঁটছিলো, তার সমাজগণতন্ত্রপরায়ণ নেতা পাজেরো চালিয়ে যাচ্ছিলেন কোথাও বা আসছিলেন উত্তরপাড়া থেকে, তিনি মজনুকে দেখে করুণা বোধ করেন, কয়েক দিন পরেই মন্ত্রী হওয়ার একটা তীব্র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাঁর, পাজেরো থামিয়ে দলবল নিয়ে তিনি নেমে আসেন। তিনি মজনুকে নিয়ে যেতে চান, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেবেন; কিন্তু মজনু হঠাৎ তাকে চেপে ধ'রে মাটিতে ফেলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ভ'রে ঘষতে থাকে। ঘষার ফলে নেতার মুখমণ্ডলের মসৃণ চামড়া উঠে যায়, সঙ্গীরা নেতাকে উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু মজনু তাঁকে ছাড়ে না,

সে বুড়ো আঙুল দিয়ে নেতার মুখমণ্ডল ঘষতে থাকে, নেতার বাইরের চামড়া পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে সে সত্যটাকে দেখতে চায়। নেতা মাসখানেক ধ'রে একটা সুন্দর মুখ প্রস্তুত করছিলেন, উপপত্নীদের কাছ থেকে বারবার জেনে নিচ্ছিলেন মুখটি কেমন দেখাচ্ছে, ঢাকার রঙিন বাক্সে কেমন দেখাবে, মজনুর ঘষায় তাঁর মুখমণ্ডলের সত্য বেরিয়ে পড়ায় তাঁর শপথগ্রহণের দিন পিছিয়ে যায়, তিনি সকালে এক উপপত্নীর বক্ষে বিকেলে আরেক উপপত্নীর বুকে শুয়ে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করতে থাকেন। মজনু বাইরের কোনো কিছুর সত্যেই বিশ্বাসী নয়, ভেতরের সত্যই তার কাছে সত্য, আর তার বুড়ো আঙুলও ভয়ানক প্রখর, তাই পরিচিতরা তাকে এড়িয়ে চলে আজকাল, তারা সত্যের পরীক্ষা দিতে চায় না। মজনুর পায়ের নিচে যে-ইটের টুকরোটি পড়ে, যদি তার ইচ্ছে হয় সেটির সত্য উদঘাটনের, মজনু সেটি হাতে তুলে নেয়, ডান আঙুলে ঘষতে থাকে, টুকরোটি এক সময় শূন্যে মিলিয়ে যায়; মজনু বলে, মিথ্যা। সংবাদপত্র পেলেই সে ঘষতে থাকে, ইটের টুকরোর থেকে অনেক বেশি মিথ্যা সংবাদপত্রগুলো, স্তম্ভে স্তম্ভে চিৎকার করছে মিথ্যা, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়; মজনু বলে, মিথ্যা।

মজনু এক সুন্দর বিকেলবেলা হাঁটতে হাঁটতে শাহবাগের মোড়ে পৌঁছে, এবং দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায়; দু-হাত উড্ডীন, ও চিৎকার ক'রে সে সবাইকে গাড়ি থামাতে বলে, মুহূর্তে সেখানে টয়োটা ডাটসান সুজিকি পাজেরো ওয়াগন স্টারলেট হারলট বারলটের ভিড় পুঞ্জিত হয়ে ওঠে, নতুন কোনো সামরিক বিধি ঘোষিত হয়েছে ভেবে ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণীরা চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। সরণীটি ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণীদের নিজস্ব, গুরুত্বহীন প্রাণীরা এ-সরণীতে চলতে পারে না, এ-সরণীতে চলতে পারা গৌরবের ব্যাপার, নিউইঅর্ক থেকে ফিরে গ্রাম্য বাঙালিরা যেমন কয়েক মাস ধ'রে বিভিন্ন রাস্তার গল্প করে, এ-সরণীতে চলতে পেরেও অধিকাংশ শূদ্র বাঙালি তার গল্প করে,—স্ত্রী, সন্তান, সহকর্মী, শ্বশুরের কাছে, এমনকি গৃহপরিচারিকার কাছেও। যে-ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণীরা নিয়মিত চলেন এ-সরণীতে, তাঁরা দ্রুতগতিশীল, গন্তব্যে তাদের পৌঁছোতে হয় স্বল্পতম সময়ে, নইলে বিপর্যয় ঘটতে পারে; এমন ঘটনার সাথে তাঁদের এর আগে পরিচয় ঘটে নি, তাঁরা কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নি তাঁদের নিজস্ব সরণীতে কেউ দু-হাত তুলে তাঁদের গাড়ি থামাতে পারে। মজনু একটি ঝকঝকে গাড়ির সামনে গিয়ে সালাম দেয়, সালাম পেলে ভারিগুরুত্বপূর্ণরা খুব সুখ বোধ করেন, গাড়ি থেকে একজন ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণী বেরিয়ে আসেন, মজনু আবার তাঁকে সালাম দেয়, তাতে গুরুত্বপূর্ণপ্রাণীটি আরো গুরুত্ব বোধ করেন। মজনু হঠাৎ তার মুখমণ্ডল চেপে ধ'রে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একবার ঘষা দেয়, ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণীটি খুব বিস্মিত হন, মুখমণ্ডল তাঁর আগুনের মতো জ্ব'লে উঠলেও তিনি গুরুত্বসহকারে মজনুকে জিজ্ঞেস করেন, এ আপনি কী করছেন? মজনু বলে, মিথ্যা, পচা পাটের গন্ধই সত্য। ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণীটি আরো বিস্মিত হয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েন; মজনু আরেকটি গাড়ির সামনে গিয়ে

সালাম দেয়, আরেকটি ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণী বেরিয়ে আসেন। মজনু তাঁর মুখমণ্ডলেও ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষা দেয়, ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণীটি বিস্মিত হয়ে বলেন, এ কী অসভ্যতা। মজনু বলে, মিথ্যা, আউশধানই সত্য। মজনু আরেকটি গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়, আরেকজন ভারিগুরুত্বপূর্ণপ্রাণী বেরিয়ে আসেন; মজনু তাঁর ঝলমলে টাই ধ'রে ঘষা দেয়, তার এক ঘষায় টাইয়ের মাঝখানে আগুন ধ'রে যায়। মজনু বলে, মিথ্যা, গামছাই সত্য। মাঝেমাঝেই মজনু এভাবে সভ্য সুন্দর মানুষদের বিব্রত ক'রে তোলে, মজনু চারদিকে কোথাও কোনো সত্য খুঁজে পায় না। মজনু অনেক সময় বিশাল বিশাল বস্তুদেরও মুঠোতে ফেলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে, কী ঘষছে কেউ দেখতে পায় না, শুধু মজনুই দেখতে পায়, এবং দেখে যে ওই সবই মিথ্যা। সংসদ, বিচারালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, সেনানিবাস সব কিছুকেই ঘ'ষে ঘ'ষে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে মজনু বলে, মিথ্যা। রাশেদ কি নেমে যাবে মজনুর পথে, দেখতে চেষ্টা করবে সব কিছুর অন্তর্নিহিত সত্য?

১৩ বর্তমানহীন ভবিষ্যৎহীন

এক আদিম সমাজের মানুষ আমি, রাশেদ মনে মনে—না, তার সম্ভবত আর মন নেই, অন্য কিছু একটা আছে হয়তো, হয়তো তাও নেই, সেখানেই সে বলছে, আমি আদিম সমাজের মানুষ, হয়তো মানুষও নই, সভ্যতার সংবাদ আমি রাখি না, আমার গোত্র রাখে না, আমার গোত্র আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে তুমি সভ্যতার ভেতরে ঢুকবে না, বাইরে থাকবে সভ্যতার, থাকবে আদিম, আদিমতর, আদিমতম। পথের ওই ভিখিরিটি আদিম, সে আর কিছু জানে না তার ক্ষুধা ছাড়া, ক্ষুধার আগুন ছাড়া, কাম ছাড়া; উদ্দিন মোহাম্মদও তার মতোই আদিম, ক্ষুধা আর কাম ছাড়া সেও কিছু জানে না, তার ক্ষুধা ভিখিরির ক্ষুধার থেকে অনেক বেশি, শুধু খাদ্যে তার ক্ষুধা মেটে না, তার কাম ভিখিরির কামের থেকেও ভয়ংকর, শুধু নারীতে তার কাম তৃপ্ত হয় না; তার মতোই ক্ষুধার্ত কামার্ত আমার গোত্রের সবাই : আদিম ওই রাজনীতিকেরা, যারা মানুষকে খুব ভালোবাসে, জনগণের জন্যে যারা প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে, বিলিয়ে দিতে চাইলেও দিতে পারছে না, কেননা তারা ক্ষমতা পায় নি; আদিম ওই সেনাপতি, আদিম ওই চিকিৎসক, আদিম ওই অধ্যাপক, আদিম ওই আমলা, আদিম ওই চোরাচালানি, আদিম ওই মৌলভিমোল্লা; এ-অরণ্যে আদিমতা ছাড়া আর কিছু নেই; উদ্দিন মোহাম্মদ এখানে দেখা দেবেই। উদ্দিন মোহাম্মদকে কে সৃষ্টি করেছে? আমরাই সৃষ্টি করেছি উদ্দিন মোহাম্মদকে; উদ্দিন মোহাম্মদ দেখা দিয়েছে আমাদেরই দূষিত রক্তের ভেতর থেকে, উদ্দিন মোহাম্মদ প্রাদুর্ভূত হয়েছে আমাদেরই নষ্ট হৃৎপিণ্ডের

স্পন্দন থেকে, আমরা তা বুঝতে পারছি না; উদ্দিন মোহাম্মদ জেগে উঠেছে আমাদেরই অসুস্থ স্বপ্ন থেকে, উদ্দিন মোহাম্মদ বিকশিত হয়েছে আমাদেরই রুগ্ন নিশ্বাস থেকে, আমরা তা বুঝতে পারছি না; আমাদের পচন-লাগা মনের গভীরে আমরা তাকে ভালোবাসি, দূষিত রক্তের স্তরে স্তরে আমরা তাকে ভালোবাসি, আমরা তা বুঝতে পারছি না; সে চামড়ার ওপর হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা ফোড়া নয়, সে আমাদের দূষিত আত্মা। সে আমাদের সন্তান, সে আমাদের পিতা, সে আমাদের পিতামহ; সে আমাদের পূর্বপুরুষ, সে আমাদের উত্তরপুরুষ, সে আমরাই। উদ্দিন মোহাম্মদ একদিন মিশে যাবে, কিন্তু যাবে না, আবার দেখা দেবে, সে আছে আমাদের ময়লা রক্তের গভীরে, রুগ্ন স্বপ্নের গর্তে, নষ্ট কামনার খোঁড়লে খোঁড়লে। আমরা দূষিত মানুষ, আমরা দূষিত জাতি, আমরা দূষিত গোত্র। আমার গোত্রের অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আমি যখন অতীতের দিকে তাকাই কোনো গৌরব আমার আমাকে প্রদীপ্ত করে না,—আমার পূর্বপুরুষ আমাকে বিদেশির দাসে পরিণত করেছে; আমি যখন বর্তমানের দিকে তাকাই কোনো আলো আমাকে উজ্জ্বল করে না,—আমাব সমাজ আমাকে নষ্ট মানুষদের অধীন করেছে; আমি যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাই কোনো সম্ভাবনা আমাকে পথ দেখায় না,—সব সম্ভাবনাকে আমরা লুপ্ত করেছি। অশেষ অন্ধকারে শুধু দুটি জোনাকির জ্ব'লে ওঠা দেখি, আর কোনো শিখা দেখি না, শুধু অন্ধকার দেখি। আমার শ্রুতি ভ'রে আছে মিথ্যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আমার শ্রুতিতে জমেছে মিথ্যা; আমার রাজা আমাকে মিথ্যা শুনিয়েছে, আমার কবি আমাকে মিথ্যা শুনিয়েছে, আমার পুরোহিত আমার সামনে মিথ্যার পুথি মেলে ধরেছে, আমার পুস্তক আমাকে মিথ্যার পাঠ দিয়েছে। আমি মিথ্যা দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছি। আমি মিথ্যার সন্তান, আমি জন্ম দিই মিথ্যা।

রাশেদ ঠিক করেছে সে কোনো প্রতিযোগিতায় যাবে না, সে প্রতিযোগিতার ইঁদুর হবে না, সে হবে ব্যর্থ, ব্যর্থ মানুষ, চারপাশের সফল মানুষদের মধ্যে সে থাকবে ব্যর্থ মানুষ, তাকে দেখে কেউ ঈর্ষা বোধ করবে না। তার পক্ষে ব্যর্থ হওয়ার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে একটি দুরূহ বই লেখা—দুরূহ বই, অত্যন্ত দুরূহ, যে-বই বাঙালি, বাঙালি মুসলমান কখনো পড়বে না, যে-বই কারো কাজে লাগবে না; কিছুটা লিখেও ফেলেছে, কিন্তু এখন আর লেখার ইচ্ছে হয় না। কেনো হবে? সে কি বাঙালি নয়; সে কি বাঙালি মুসলমান নয়? বাঙালি এবং বাঙালি মুসলমানের ব্যাধি কি থাকবে না তার মধ্যে? বাঙালি এবং বাঙালি মুসলমান গোত্রে জন্ম নিয়ে মহৎ কিছু করার বীজ কী ক'রে থাকবে তার মধ্যে? তার মধ্যে থাকবে শুধু নষ্ট হওয়ার বীজ, চারপাশ তাকে দেবে পতিত হওয়ার মন্ত্রণা। দুরূহ বই লেখার বদলে রাশেদ কয়েকটি রচনা লিখে ফেললো, ওগুলোকে সে রচনাই বলে, এমন সব বিষয়ে যে-সব বিষয়ে সে কখনো লিখবে ব'লে ভাবে নি; রচনাগুলো অখ্যাত একটি সাপ্তাহিকে বেরোনোর পর রাশেদ বুঝতে পারলো কতোটা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে চারপাশে। প্রথম প্রথম অবশ্য তার ভালোই

লাগছিলো; মাঝেমাঝেই একটি দুটি ক'রে তরুণতরুণী আসছে তার কাছে, শুধু প্রশংসা করছে তার সাহসের, আর রাশেদ বিব্রত বোধ করছে এজন্যে যে সে আসলে কোনো কোনো সাহসই দেখায় নি, সাহস দেখানোর জন্যে সে লেখে নি ওই রচনাগুলো, সে লিখেছে কিছু সত্য প্রকাশ করার জন্যে। তাহলে কি ব্যর্থ হয়ে গেলো তার রচনাগুলো—রচনাগুলোতে সত্য না দেখে তারা দেখছে সাহস। রাশেদ তাদের চোখেমুখে দেখতে পায় প্রচণ্ড ভীতি, ভয়ে কুঁকড়ে আছে তারা; সে যে তাদের মধ্যে এতোটা ভয় জাগিয়ে দিয়েছে, তাতে রাশেদেরই ভয় লাগে। এ-তরুণতরুণীরা অত্যন্ত সাহসী, বাস্তব সাহসের কোনো অভাব নেই তাদের, নিয়মিতই মিছিল করে তারা, গোলাগুলির মধ্যে পড়ে, মরতেও ভয় করে না, কিন্তু রাশেদ দেখতে পায় তাদের কল্পলোক ভ'রে আছে ভীতিতে। তারা সবাই প্রথমেই একটি প্রশ্ন করে রাশেদকে, যেনো এটাই চরম প্রশ্ন, এটা জানা হয়ে গেলে সব জানা হয়ে যায়, আর কিছু জানার বাকি থাকে না;—তারা জানতে চায়, আপনি কি নাস্তিক? রাশেদ যদি বলে গতকাল সে দুটি লোককে খুন করেছে, তিনটি তরুণীকে ধর্ষণ করার পর গলা কেটে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে, তাহলেও তারা ততোটা ভয় পাবে না, যতোটা ভয় পাবে যদি সে বলে সে নাস্তিক। একটা অলৌকিক ভয়ে তারা কাঁপছে, ওই ভয় আদিম কাল থেকে মাটির ভেতর দিয়ে রসের মতো চ'লে এসেছে, শেকড় বেয়ে বেয়ে তাদের ভেতরে ঢুকেছে, সারাক্ষণ ওই ভয়ে কাঁপছে তারা। ওদের জন্যে মায়া হয় রাশেদের, সে সরাসরি উত্তর দেয় না, দিলে হয়তো ওরা সহ্য করতে পারবে না, চিৎকার ক'রে দাপাতে দাপাতে তার সামনেই মারা যাবে। রাশেদের ছেলেবেলায় তো এতো ধর্ম ছিলো না, আল্লা তো তখন তাদের এতো ভয় দেখাতো না; এখন চারদিকে আল্লাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে সজীব ব্যক্তিত্ব, এবং তার ভয়ে সবাই কাঁপছে, যদিও সে নিজে কাউকে ভয় দেখাচ্ছে না। এর আগে এতো ভয়ংকরভাবে কখনো আল্লা আত্মপ্রকাশ করে নি। পত্রিকা খুললে মনে হয় আল্লাই এখন রাজনীতি করছে, আল্লাই এখন রাষ্ট্র চালাচ্ছে, আল্লাই এখন বিমান উড়োচ্ছে, আল্লাই এখন সিনেমা হল উদ্বোধন করছে, এবং আল্লা সারাক্ষণ ভয় দেখাচ্ছে।

রাশেদ তাদের বলে যে সম্পূর্ণ আস্তিক ব'লে কিছু নেই, যারা আস্তিক, তারাও অন্য ধর্মের চোখে নাস্তিক; একজন ধার্মিক মুসলমানের চোখে একজন ধার্মিক হিন্দু নাস্তিক, একজন ধার্মিক হিন্দুর চোখে একজন ধার্মিক মুসলমান নাস্তিক, যদিও তারা নিজেদের আল্লা আর ভগবানে বিশ্বাস করে; আর ধর্মপ্রবর্তকেরাও এক অর্থে নাস্তিক, কেননা তারা সবাই পিতার ধর্ম ছেড়ে প্রস্তাব করেছে নতুন ধর্ম, নিজের ধর্ম। রাশেদের কথায় তার সামনের তরুণ দুটি আর তরুণীটি কেঁপে ওঠে, যদিও তারা খুব প্রগতিশীল, তারা বিশ্বাস করে শ্রেণীসংগ্রামে, এবং সাহসী, মরতে তারা ভয় পায় না। রাশেদ বলে অনেক ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে, আছে নানা রকম স্রষ্টা; এতোগুলো ধর্ম আর এতোগুলো স্রষ্টা থাকার অর্থ সবই মানুষের কল্পনা, বেশ আদিম কল্পনা, এগুলো একে অন্যকে বাতিল ক'রে দেয়। রাশেদ

বলে, প্রত্যেক ধর্মের দুটি দিক রয়েছে, একটি বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব, আরেকটি সমাজ কীভাবে চলবে তার বিধান। প্রতিটি ধর্মেরই বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ভুল, আর সমাজও ধর্মের পুরোনো বিধান অনুসারে আর চলতে পারে না, পৃথিবী অনেক বদলে গেছে, আরো অনেক বদলে যাবে। একটি তরুণ প্রায় কেঁদে ফেলে, তাহলে কি আল্লা নেই? রাশেদ বলে, আল্লা এমন ব্যাপার যা প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, অর্থাৎ স্রষ্টা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার, বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পায় নি, পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। একটি তরুণ বলে, তাহলে কি আমরা বিশ্বাস করবো না, বিশ্বাস ব'লে কি কিছু থাকবে না? রাশেদ বলে, মানুষের সব বিশ্বাসই অপবিশ্বাস। আমরা যা কিছু বিশ্বাস ক'রে আসছি, তার অধিকাংশের মূলে সত্য নেই, আর কোনো বিশ্বাসই চিরন্তন নয়, বিশ্বাসের বদল ঘটে যুগে যুগে। তরুণীটি বলে, তাহলে কি নামাজরোজা করতে হবে না? রাশেদ বলে, না, দরকার নেই। এ-তরুণতরুণীরা নামাজরোজা করে না, তবু তারা আঁৎকে ওঠে, চোখমুখ তাদের খসখসে হয়ে ওঠে। রাশেদ বলে, মনে করা যাক একজন স্রষ্টা রয়েছে, সে মহাজগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছে, তাহলেও তার উদ্দেশে প্রার্থনার আনুষ্ঠানিকতা অপ্রয়োজনীয়। কারণ যে অনন্ত মহাজগত সৃষ্টি করতে পারে, সে নিশ্চয়ই হবে অত্যন্ত মহান, মানুষের মতো তুচ্ছ প্রাণীর তুচ্ছ প্রশংসা তার দরকার পড়তে পারে না। রাশেদ বলে, ব্ল্যাকবোর্ডে ছোটো একটি বিন্দু যতোটা ছোটো, মহাজগতে মানুষ ওই বিন্দুর থেকেও ছোটো, তুচ্ছ; এতো ছোটো তুচ্ছ মানুষের কথা স্রষ্টা সব সময় ভাববে, তার জন্যে স্বর্গনরক বানিয়ে রাখবে, এটা হাস্যকর চিন্তা। রাশেদ বলে, এ-দালানে কোথাও পিঁপড়ে নিশ্চয়ই রয়েছে, ওই পিঁপড়েগুলোর কথা আমরা কেউ ভাবছি না, পিঁপড়েগুলোর কোনো আচরণই আমাদের ভাবনার বিষয় নয়। পিঁপড়েগুলো যদি মনে করে আমরা তাদের কথা সব সময় ভাবছি, তারা আমাদের স্তব করছে কিনা তার হিশেব রাখছি, তা যেমন হাস্যকর হবে, তারচেয়েও হাস্যকর মানুষের প্রার্থনা। কারণ স্রষ্টা থাকলে সে এতো মহান হবে যে তুচ্ছ মানুষের নিরর্থক স্তুতি সে কখনো চাইবে না। অনন্ত মহাজগতে সূর্য একটি অত্যন্ত গরিব তুচ্ছ হলদে তারা, পৃথিবী ওই নক্ষত্রের একটি অত্যন্ত গরিব তুচ্ছ গ্রহ, আর মানুষ একটি বিন্দুর থেকেও তুচ্ছ। স্রষ্টা এতো তুচ্ছ বিন্দুর স্তুতির জন্যে কাতর হ'তে পারে না। প্রতিটি ধর্মের প্রার্থনার শ্লোকগুলো খুবই মলিন, স্রষ্টা সেগুলো শুনলে খুব খুশি হবে ব'লে মনে হয় না। একটি ছেলে বলে, আমার ভয় লাগছে, আমি ভয় পাচ্ছি, সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাস্তব ভয়ের থেকে অনেক ভয়ংকর অলীক ভয়।

বাসায় টেলিফোন আনা ঠিক হয় নি, রাশেদ টেলিফোন তুলতেই ভয় পাচ্ছে আজকাল; টেলিফোনের ভেতর দিয়ে দুপুর সন্ধ্যা মাঝরাতে তার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে ঘাতকেরা, ছুরি হাতে লাফিয়ে দাঁড়াচ্ছে তার সামনে। টেলিফোন বাজার শব্দটা তার ভালো লাগে, বাজলেই গিয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, অপরপ্রান্তের যে-কাউকে তার প্রিয় মনে হয়, ধ'রেও ফেলে রাশেদ। গতকালও মাঝরাতে

টেলিফোন বেজে উঠেছিলো, ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো রাশেদের, সে বুঝতে পারছিলো অন্যপ্রান্তে কোনো ঘাতক ছুরি হাতে ব'সে আছে, এখন তাকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তার ঘাতকের। ঘাতক বলে, আচ্ছালামুআলাইকুম; রাশেদ বলে, রাশেদ বলছি। ঘাতক চিৎকার ক'রে ওঠে, হারামজাদা, তুই ত আবার সালামের জবাব দ্যাছ না, অআলাইকুমসালাম ক, তর বাপে কি তরে একটুও আল্লারসুলের নাম শিখায় নাই? রাশেদ বলে, আপনি কে বলছেন; ঘাতক বলে, তর আজরাইল বলছি। ওই সব ল্যাখা ছাইর‍্যা দে, আল্লারে লইয়া তুই মাথা ঘামাইছ না, লিস্টিতে তর নাম আছে। রাশেদ টেলিফোন রেখে দেয়, টেলিফোন আবার বাজতে শুরু করে, বাজতে থাকে, বাজতে থাকে, বাজতে থাকে। মমতাজ আর মৃদু জেগে উঠেছে, দুজনই খুব ভয় পেয়ে গেছে; টেলিফোন বাজতে থাকে, বাজতে থাকে; এবার মমতাজ টেলিফোন ধ'রে জিজ্ঞেস করে, কে বলছেন; ঘাতক বলে, তব স্বামীর আজরাইল বলছি, তার বেশি দিন নাই, তর আরেকটা বিয়ার দিন কাছাইয়া আইছে। মমতাজ চিৎকার ক'রে বদমাশ বদমাশ বলতে বলতে টেলিফোন রেখে দিয়ে কাঁপতে থাকে। মৃদু উঠে তার মাকে জড়িয়ে ধরে। আবার বেজে ওঠে টেলিফোন, অনেকক্ষণ কেউ ধরে না তারা; এক সময় রাশেদ আবার তার ঘাতকের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, রাশেদ বলছি। ঘাতক বলে, তুই তৈরি হইয়া থাকিছ, বেশি দিন বাকি নাই। রাশেদ বলে, আমি তৈরি, ইচ্ছে হ'লে আজ রাতেই আসতে পারেন। ঘাতক বলে, যেই রাতে দরকার পড়ব সেই রাতেই আসব, চোখ বাইন্দা শুয়রের মত লইয়া আসব, যা কিছু দ্যাখতে চাছ দ্যাইখ্যা ল। রাশেদ বলে, আপনাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। ঘাতক বলে, চোখ উপড়াইয়া ফেলনের পর আমাকে দেখতে পাবি। ঘাতক টেলিফোন রেখে দেয়, রাশেদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে টেলিফোনের পাশে, নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয় মমতাজ আর মৃদুর কাছে। সে মৃদুর গালে অনেকক্ষণ হাত রেখে ব'সে থাকে, আজ আর ঘুম হবে না, পাশের ঘরে গিয়ে সে একটি বই খুলে বসে।

সন্ধ্যার আগে রাশেদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, কোনো রিকশা দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে, রিকশার জন্যে বড়ো রাস্তায় যেতে হবে, কী আশ্চর্য, পাশের গলি থেকে পাঁচ-ছজন ধার্মিক লোক বেরিয়ে এলেন;—তাঁরা দ্রুত হাঁটছেন, তাঁরাও হয়তো বড়ো রাস্তায় যাবেন, বা খবর পেয়েছেন শহরের কোনো রাস্তায় ধর্ম বিপন্ন, বড়ো বড়ো জোব্বা পরেছেন তাঁরা, তাঁদের মাথায় অদ্ভুত টুপি, গলায় নানা রকম চাদরগামছা, রাশেদের আগে আগে হাঁটছেন তাঁরা, রাশেদকে হয়তো তাঁরা দেখেনও নি। তাঁদের পোশাক আর হাঁটার গতিতেই রাশেদ ভয় পেয়ে যেতো, যদি তার বয়স হতো তেরো-চোদ্দো। তাঁদের দেখে তার বাল্যকাল আর এখনকার ধার্মিকদের মধ্যে একটা বড়ো পার্থক্য সে ওই মুহূর্তেই বোধ করে। আগে পথে কয়েকজন ধার্মিক লোক দেখলে বুকে সুখ লাগতো, মনে হতো তাঁরা মসজিদে যাচ্ছেন বা ফিরছেন, এখন পথে কয়েকজন ধার্মিক লোককে একসাথে দেখলে বুক কেঁপে ওঠে, মনে হয় তারা কোথাও খুন করতে যাচ্ছে বা খুন ক'রে ফিরলো। এঁরা

কোথায় যাচ্ছেন, এতো তাড়াতাড়ি কেনো হাঁটছেন এঁরা; রাশেদ মুহূর্তের জন্যে তেরো বছরের বালক হয়ে ওঠে, একটা চিৎকার দিতে গিয়ে থেমে যায়, একটা রিকশা ডেকে উঠে বসে। একটু দূরে যেতেই সন্ধ্যা নামার মতো হয়, চারদিকে অজস্র মাইকে আজান বেজে উঠতে থাকে। পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে অজস্র মাইকে,—রাশেদের কাছে আজান মানেই হচ্ছে হেডমৌলভি সাহেবের কণ্ঠের স্বরমালা, যা গাছের পাতার ভেতর দিয়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে অলৌকিক গানের মতো এসে পৌঁছোতে তার কানে, সে কান পেতে থাকতো যার জন্যে;—আজ সন্ধ্যায় মাইকের শব্দে ভীত হয়ে ওঠে রাশেদ, উত্তর দিকের মাইকগুলো তাকে ভয় দেখায়, দক্ষিণ দিকের মাইকগুলো তাকে ভয় দেখায়, পশ্চিম দিকের মাইকগুলো তাকে ভয় দেখায়, পুব দিকের মাইকগুলো তাকে ভয় দেখায়। ঢাকা শহরের সব মাইক গম্বুজ ভেঙেচুরে ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়তে থাকে, তীব্র গতিতে উড়ে আসতে থাকে তার দিকে, প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে আশমানজমিন, এসেই পেঁচিয়ে ধরে তার গলা; একটি, দুটি, তিনটি, চারটি,...হাজার হাজার, লাখ লাখ মাইক তার দিকে উড়ে আসছে, তাকে পেঁচিয়ে ধরছে, রাশেদ দম ফেলতে পারছে না। রাশেদ আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু অন্ধকার দেখতে পায়, কোনো চাঁদ দেখতে পায় না, তারা দেখতে পায় না; সে প্রাণপণে হেডমৌলভি সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনার চেষ্টা করে, দেখার চেষ্টা করে হেডমৌলভি সাহেবের কণ্ঠ থেকে ওই স্বর বেরিয়ে গাছের পাতার সবুজের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার মতো গ'লে গ'লে আসছে তার দিকে, ওই স্বর কুয়াশায় ভিজে ভিজে জোনাকির মতো আসছে তার দিকে; কিন্তু রাশেদ তা দেখতে পায় না। রাশেদ দেখতে পায় সেই অদ্ভুত লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসছে, জোব্বার ভেতর থেকে বের ক'রে আনছে তলোয়ার, রাশেদ ছুটতে গিয়ে ছুটতে পারছে না, প্রত্যেকটি পথ আর গলির মুখে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

খাপ খাওয়াতে হবে রাশেদকে, সব কিছু মেনে নিতে হবে, 'না' বলার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে, যে তাকে যে-পথ দেখায় সে-পথকেই পুণ্যপথ ব'লে মিনে নিয়ে সোজা চলতে হবে, সব কিছু বিশ্বাস করতে হবে, বুকে কোনো অবিশ্বাস রাখতে পারবে না, যেমন চারপাশে কেউ কোনো কিছু অবিশ্বাস করে না; উদ্দিন মোহাম্মদ যা বলে, তা মানতে হবে; যারা গণতন্ত্র আনবে, তাদের মানতে হবে; তাদের গণতন্ত্র বিভিন্ন রকম, উদ্দিন মোহাম্মদ যা করলে স্বৈরতন্ত্র হয় তারা তা করলে গণতন্ত্র হবে, রাশেদকে সেই গণতন্ত্র মানতে হবে; তারা যে-সব মহৎ ধ্রুবসত্যে পৌঁচেছে, সে-সব সত্য মুখস্থ করতে হবে, তাদের সাথে গলা মিলিয়ে আবৃত্তি করতে হবে। এজন্যেই আজকাল দিকে দিকে আবৃত্তি শেখানো হচ্ছে। উদ্দিন মোহাম্মদকে সে মানতে পারে না, কোনো উদ্দিন মোহাম্মদকেই সে কোনোদিন মানতে পারে না; কিন্তু অন্যদের, যারা গণতন্ত্র আনবে, যারা সোনায় রুপোয় দেশ ভ'রে দেবে? রাশেদ নির্বোধ, নইলে নিশ্চয়ই বুঝতো অন্যের আবিষ্কৃত সত্যে বিশ্বাস আনাই সবচেয়ে নিরাপদ, এবং সুখকর, সংঘে যোগ দিলে তার আর কিছু

ভাবতে হবে না, সংঘই ভাববে তার জন্যে, তার দেখাশোনা করবে, সময় এলে, যদি তার সংঘের মিথ্যায় সাড়া দেয় জনগণ, তাহলে সে পুরস্কার পাবে, মূল্যবান ঝলোমলো সে-সব পুরস্কার। নির্বোধ রাশেদ, এসব বুঝতে পারছে না, সরল সঠিক পুণ্যপথে চলতে পারছে না; সে শুধু বিপজ্জনক পথে পা ফেলছে। সে অবিশ্বাস করছে সব কিছু; সে জাতির পিতা মানছে না, ঘোষণাকারী মানছে না, বাঙালি মানছে না, মুসলমান মানছে না, ঐতিহ্য মানছে না, প্রথা মানছে না, সমাজতন্ত্র মানছে না, সংঘ মানছে না, কোনো ধ্রুবসত্যই মানছে না। সমাজের শত্রু হয়ে উঠছে সে দিন দিন; তাকে কী ক'রে সহ্য করবে সমাজ? সে-দিন রাশেদ এক সংঘের সভায় একটি প্রবন্ধ পড়লো, বিপজ্জনক কোনো বিষয়ে নয়, নিরীহ একটি বিষয়ে, যদিও আজকাল আর কিছুই নিরীহ নয়, কবিতা সম্পর্কে। প্রথাগত অনেকগুলো ধারণা সে বাতিল ক'রে দিলো, সে আশা করেছিলো যারা আলোচনা করবে, তারা বিচার করবে তার মতগুলো; কিন্তু তারা উচ্চকণ্ঠে এমন সব চিৎকার দিতে লাগলো, যার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই রাশেদের রচনার। এক আলোচক বলতে লাগলো, সে রাশেদের প্রবন্ধ পড়ে নি, এমনকি শোনেও নি, কেননা রাশেদ জাতির পিতা মানে না। যে জাতির পিতাকে মানে না, তার বাঙলাদেশে থাকার অধিকার নেই। রাশেদ বাঙলাদেশে থাকার অযোগ্য, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। আলোচক আরো উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো সে শুনেছে যে রাশেদ মনে করে জাতির পিতাকে হত্যা করা দরকার ছিলো। রাশেদ আলোচনা শুনে, আলোচকদের মগজের অবস্থার কথা ভেবে, কৌতুক বোধ করছিলো, ভাবছিলো আলোচনার শেষে সে উত্তর দেবে। কে একজন মঞ্চে এসে রাশেদকে এক টুকরো কাগজ দিলো, তাতে সে রাশেদকে অনুরোধ করেছে মঞ্চ ছেড়ে চ'লে যেতে, লিখেছে, দয়া ক'রে আপনি এখনি ওখান থেকে চ'লে আসুন, নইলে মঞ্চে আপনাকে খুন করা হ'তে পারে। সত্যিই কি এমন ঘটতে পারে, কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে কি রাশেদ এতোটা অপরাধ ক'রে ফেলেছে, তার দেশ কি এতোটা বর্বর হয়ে উঠেছে? রাশেদ মঞ্চ ছেড়ে উঠলো না। আলোচনার শেষে সে উত্তর দিতে চাইলো, তখনি মঞ্চে শুরু হলো কোলাহল, একের পর এক তাণ্ডবকারী উঠতে লাগলো মঞ্চে, তারা মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নিলো, চিৎকার ক'রে বলতে লাগলো রাশেদকে কিছুতেই উত্তর দিতে দেয়া হবে না। এপাশ ওপাশ থেকে তখন শ্লোগান উঠছে, রাশেদের বিপক্ষে, এবং বিস্ময়কর–রাশেদের পক্ষেও। রাশেদকে ঘিরে আছে তার অচেনা অনুরাগীরা, একটি তরুণী আর একটি তরুণ তাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদছে, আর রাশেদ তাকিয়ে আছে মত্ত তাণ্ডবকারীদের দিকে, দেখতে চেষ্টা করছে বাঙলার ভবিষ্যৎ।

সংঘ নয়, আর সংঘ নয়; রাশেদের পক্ষে কোনো সংঘে থাকা সম্ভব নয়, সংঘ তার জন্যে নয়; রাশেদ এখন পরিচ্ছন্নভাবে জানে কী উপাদানে তৈরি এই সব সংঘ, দল, সংস্থা। রাশেদকে থাকতে হবে একলা, নিঃসংঘ; হানাহানি চক্রান্ত করতে থাকবে সংঘের অধিপতিরা, পদের জন্যে পাগল হয়ে থাকবে তারা, দরকার

হ'লে পা ধরবে দরকার হ'লে পিঠে ছুরি মারবে, হবে অন্তঃসারশূন্য, মাথা রাখবে শক্তিমানদের পায়ে, তখন রাশেদ একা লাথি মারবে—সমাজ, রাষ্ট্র, নেতা, প্রভু, প্রথা, অপবিশ্বাসের মুখে, এবং সৃষ্টি ক'রে চলবে। তার আদিম গোত্র তাকে পুঁতে ফেলতে চাইবে, পারলে সুখী হবে; সে লাথি মারবে আর সৃষ্টি করতে থাকবে। শুধু লাথি নয়, সৃষ্টি, সৃষ্টির জন্যেই লাথি। কিন্তু আজ রাতে রাশেদ বাসায় থাকতে পারবে না, আরো কয়েক রাতই হয়তো থাকতে পারবে না, বিশেষ শাখা তার খোঁজ করছে, মমতাজ একাধিক টেলিফোন পেয়েছে, যারা নাম বলে নি, শুধু বলেছে কয়েক রাত রাশেদের বাসায় থাকা ঠিক হবে না। রাশেদ কি বিশ্বাস করবে এ-টেলিফোনগুলো? তবে পরিস্থিতি বেশ খারাপ, ধরাধরি চলছে, তার চেনা আরো দু-তিনজনও বাসায় থাকবে না, তারাও সংবাদ পেয়েছে বিশেষ শাখা খোঁজ করছে তাদের, রাশেদের খোঁজও করতে পারে। আচ্ছা, তারা যদি মাঝরাতে এসে রাশেদকে ধরে, নিয়ে যায়, তাকে নিয়ে গিয়ে তারা কী করবে? সিলিংয়ে ঝুলিয়ে চাবুক মারবে, বিদ্যুতের খোঁচা দেবে, জিভে সুঁচ ঢুকিয়ে দেবে? রাশেদ যতোটা জানে এখনো দেশটা আর্জেন্টিনা হয়ে ওঠে নি, তাকে ধ'রে নিয়ে হেলিকপ্টারে ক'রে নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসবে না। তবু তার বাসায় থাকা চলবে না, মমতাজই বেশি চাপ দিচ্ছে, রাশেদের কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু যেতে হবে। একটি তরুণ অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে আছে রাশেদকে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে, রাশেদ খুব বিব্রত বোধ করছে, বাসা থেকে বেরোতে তার খারাপ লাগছে, এমনভাবে আগে সে কখনো বেরোয় নি। বাঁচার জন্যে সে পালাচ্ছে? পালাতে তার ইচ্ছে করছে না। মৃদুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে রাশেদের, মৃদুর কাছে বড়ো একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছে এমন মনে হচ্ছে তার। মৃদুকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতেও বিব্রত বোধ করছে রাশেদ। বিব্রতভাবে রাশেদ বেরোলো তরুণটির সাথে, তার গাড়িতে উঠলো, মনে হলো গাড়িটি তাকে নিয়ে অন্ধকারের দিকে চলতে শুরু করলো।

দু-দিন পর ফিরে এসে রাশেদ প্রথম টেলিফোন ধ'রেই শুনলো, কী রে, আইজকাল বাসায় থাকছ না? রাশেদ জিজ্ঞেস করলো, কে বলছেন; ঘাতক বললো, নাম দিয়া কী হবে, আমি তর মত নামকরা মানুষ না, এইটা জানানের জন্য ফোন করলাম যে তর ভবিষ্যৎ খারাপ, আমার নেতার নামে তুই এইসব কী লিখছস? রাশেদ জিজ্ঞেস করলো, আপনার নেতা কে? ঘাতক বললো, আমার নেতা হারামজাদা তরও নেতা, সব বাঙলাদেশির নেতা, তুই ত আবার নেতা মানছ না, আমার নেতাই ত দেশটারে স্বাধীন করছে, আমার নেতাই ত বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা করছে, তুই শোনছ নাই, আমার নেতাই ত একনম্বর মুক্তিযোদ্ধা। রাশেদ বললো, নেতার প্রতি আপনার ভক্তি দেখে মুগ্ধ হলাম; ঘাতক বললো, হারামজাদা, তুই তার নামে এইসব কী লিখছস? রাশেদ বললো, আমি তো অনেক কিছুই লিখেছি। ঘাতক বললো, হারামজাদা, অই যে লিখছস একনম্বর মুক্তিযোদ্ধাই একনম্বর রাজাকার হয়ে উঠছিল, দেশটারে রাজাকারদের হাতে তুলে

দিয়েছিলো, রাজাকাররা তার নাম বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখবে, তার সাথে উদ্দিন মোহাম্মদের পার্থক্য নাই, এইসব হারামজাদা তুই কী লিখছস? রাশেদ বললো, আমি কি মিথ্যা লিখেছি? ঘাতক বললো, কথা কইছ না হারামজাদা, তর দুই হাত কাইট্টা ফালামু, অই হাত দিয়া কিছু লিখতে দিমু না। রাশেদ বললো, হাত কেটে ফেললে পা থাকবে, পা থাকলেই চলবে আমার। ঘাতক বললো, পা দিয়া তুই কী করবি? রাশেদ বললো, হাত দিয়ে লেখার থেকে পা দিয়ে লাথি মারাই বেশি দরকার এখন, পা দুটি থাকলেই আমার চলবে, লাথি মারতে পারবো। ঘাতক বললো, তর পা দুইটাও থাকব না দেখিছ। রাশেদ টেলিফোন রেখে দেয়, আর ঘাতকের মুখোমুখি দাঁড়াতে তার ভালো লাগছে না, ইচ্ছে হচ্ছে কাল সে ঢাকা ছেড়ে চ'লে যাবে, আর ফিরে আসবে না; কিন্তু সে কেনো এসেছিলো এ-শহরে? না এলে কি চলতো না তার? সে একটি বালককে দেখতে পায়, যে বাড়ির উত্তর ধারে কদমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটি দইকুলি দেখছে, দইকুলির বুকের ধবধবে জ্যোৎস্নায় তার বুক ভ'রে গেছে, তার চোখের মণিতে হলদেবেগুনির স্নিগ্ধ আলো হয়ে জ্বলছে পুকুরভরা কচুরি ফুল, সে দেখতে পাচ্ছে বালকটি পুকুরে লাফিয়ে নেমে সাঁতার কাটছে, ডুব দিচ্ছে, ফিরে এসে চুলে সরষের তেল মেখে চুল আঁচড়াচ্ছে, নিজের মুখটি বারবার দেখছে একটি পুরোনো আয়নায়, মনে মনে আদর করছে মুখটিকে, বালক কাঁধে বই রেখে বাঁ হাত বাঁকিয়ে বইগুলো ধ'রে বেরিয়ে যাচ্ছে ইস্কুলের দিকে। ওই বালকই কি সে, রাশেদ, যে আজ আক্রান্ত, তার কী দরকার ছিলো এই নষ্ট নগরে আসার? সে কি সুখী হতো না ওই পুকুর আর বিল আর দইকুলি আর মেঘ আর কদমগাছের প্রতিবেশিতায়? তার তো আসার কথা ছিলো না, তার সাথের কেউ তো আসে নি; আর এলোই যদি তাহলে কেনো সে মাথাটা নিচু ক'রে এলো না, যেমন এসেছে অনেকে, যারা খুব ভালো আছে, সে কেনো ভালো থাকার কৌশল শিখলো না? সে কেনো দীক্ষা নিতে জানে না, সে কেনো থেকে যাচ্ছে অদীক্ষিত?

শুভ্র পদ্ম, শাদা শাপলা, লাল গোলাপ, ঘুমজড়ানো দোয়েল, তোমাকে কেউ ভালোবাসে না, যদিও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মাইক্রোফোন লাগিয়ে চিৎকারে ক'রে ওরা তোমাকে প্রেমের কথা শোনায়, কিন্তু কেউ তোমাকে ভালোবাসে না, ভালোবাসা কাকে বলে তুমি জানো না, একনায়ক জননায়ক গণনায়ক দেশনায়ক জননেতা দেশনেতা সবাই তোমাকে সম্ভোগ করতে চায়, সবাই চুষে চুষে তোমার ঠোঁট ছিঁড়ে নিতে চায়, ওরা ছিঁড়ে ফেলেছে তোমার ওষ্ঠ, তোমার ওষ্ঠের দিকে তাকানো যায় না, সবাই চুষে চুষে তোমার স্তনবৃন্ত ছিঁড়ে নিতে চায়, কামড়ে স্তনের মাংস ছিঁড়ে নিতে চায়, তোমার স্তনের দিকে আজ আর তাকানো যায় না, কেউ তোমাকে ভালোবাসে না, তোমাকে কেউ ভালোবাসে না, তোমাকে ভালোবাসে না কেউ, উদ্দিন মোহাম্মদ তোমাকে নষ্ট করছে, জননেতারা তোমাকে ভ্রষ্ট করছে, তুমি ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত—ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যাচ্ছো, শুভ্র পদ্ম, শাদা শাপলা, লাল গোলাপ, ঘুমজড়ানো

দোয়েল, আমার মা, প্রিয়তমা, হৃদয়ের বোন, উদ্দিন মোহাম্মদ তোমাকে ন্যাংটো ক'রে চাবকাচ্ছে, তার চাবুকের শব্দে তুমি নাচছো ময়ূরের মতো, সে তোমার শরীরের আরো ঝিলিক দেখার জন্যে আরো চাবকাচ্ছে, তুমি নাচছো রক্তাক্ত ময়ূর, মোল্লারা তোমাকে বেশ্যা মনে ক'রে তোমার সমস্ত ছিদ্রে গুঁজে দিতে চাইছে আলখাল্লা, তোমার কানে আউড়ে চলছে কলমা, তোমাকে বিবি করার জন্যে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুটো পয়সার দেনমোহর নিয়ে, তোমার জরায়ু ভ'রে তুলতে চাইছে মুসলেমিনে, আর এ-রাস্তায় ওই রাস্তায় সেই রাস্তায় দলের পর দল তোমাকে শোনাচ্ছে প্রেমের বচন, এক দল তোমাকে ঢাকাই শাড়ি কিনে দিতে চাইলে আরেক দল চাইছে পাবনার শাড়ি কিনে দিতে, একদল তোমাকে কাতানের লোভ দেখালে আরেকদল তোমাকে জামদানির লোভ দেখাচ্ছে, কিন্তু তুমি ছেঁড়া শাড়ি প'রে আছো; একদল তোমাকে কানপাশা কিনে দিতে চাইলে আরেকদল তোমাকে মাকড়ি কিনে দিতে চাইছে, কিন্তু তোমার কান খালি; একদল তোমার জন্যে রুপোর নাকছাবি গ'ড়ে আনবে বললে আরেকদল গ'ড়ে আনতে চাইছে সোনার নোলক, কিন্তু তোমার নাক খালি; একদল তোমার জন্যে নকল সাতনরী কিনে আনলে আরেকদল তোমার জন্যে বানিয়ে আনছে নকল চন্দ্রহার, কিন্তু তোমার গলা খালি; একদল তোমার বাহুতে বাজুবন্ধ পরাতে চাইলে আরেকদল পরাতে চাইছে কেয়ুর, কিন্তু তোমার হাত খালি; ওরা ভালোবাসে না তোমাকে, ওরা ভালোবাসার কথা জানে না, শুধু সম্ভোগ করতে জানে, ওরা কেউ কখনো তোমার মাটির সুগন্ধে মেঘের সুগন্ধে বুক ভরে নি, ওরা কখনো তোমার জ্যোৎস্নায় কবি হয় নি, ওদের বুক থেকে কবিতা ওঠে নি গান ওঠে নি, ওরা জ্যোৎস্নায় শুধু কামার্ত হয়েছে, ওরা শুধু খলনীতি জানে ওরা কৃষিকাজ জানে না। আমিও কি ভালোবাসতে পেরেছি তোমাকে, আমিও কি কতোদিন তোমাকে মিথ্যা ভালোবাসা দিয়ে মথিত করি নি শুভ্র পদ্ম, শাদা শাপলা, লাল গোলাপ, ঘুমজড়ানো দোয়েল? তবে আমার ভালোবাসা মিথ্যে হ'লেও তা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, কিন্তু ওদের কামের পাশ থেকে তোমার মুক্তি নেই, ওদের কাম তোমাকে জীর্ণ করবে, তোমাকে নষ্ট করবে, তোমাকে ধ্বংস করবে, তোমার মুক্তি নেই।

রাশেদের এখন চারকোটি টাকা দরকার, তার নিজের জন্যে নয়, নিজের জন্যে এক টাকাও তার দরকার নয়, কিন্তু এখন তার চারকোটি টাকা দরকার; একটা আখাডামিকে দিতে হবে টাকাটা, রাশেদ একটা আস্ত হারামজাদা, সে ওই মহান আখাডামির মানসম্মানের মুখে মল মেখে দিয়েছে, টাকাটা আখাডামিকে দিলে তার মান ফিরে আসবে, টাকাটা দিয়ে তারা আখাডামির মুখের মল ঠিকঠাকমতো মুছে ফেলবে, তার মুখ আবার ঝলমল করবে। উদ্দিন মোহাম্মদের ভৃত্যরা ব'সে আছে ওখানে, তারা এবার রাশেদকে একটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। রাশেদ নাকি ওটাকে বলেছে গোশালা, শুধু বলে নি, লিখে দেখিয়েছে কীভাবে ওটা গোশালায় পরিণত হয়ে গেছে, আর তারা বুঝতে পেরেছে গোশালা অত্যন্ত নিন্দিত জিনিশ,

তাতে আখাডামির মান একরত্তিও অবশিষ্ট নেই, ওই মান উদ্ধার করতে হবে, উদ্ধারের জন্যে চারকোটি টাকা দরকার, তাই তারা চারকোটি টাকার মামলা তৈরি করেছে রাশেদের নামে, রাশেদের তাই চারকোটি টাকা দরকার। টাকাটা তার থাকলে এখনি গিয়ে দিয়ে আসতো। তারা অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে যে এখানে কোনো গোশালা নেই, পাঁচজন পণ্ডিত দিয়ে তারা গবেষণা ক'রে যে-তথ্য পেয়েছে তাতে নিশ্চিতভাবে বলা চলে ওখানে পঞ্চাশ বছর পাঁচ মাস চার দিন ধ'রে কোনো গোশালা নেই, তাই ওটাকে গোশালা বলা চলে না; আর গোশালা যদিও বাঙালির একান্ত আপন জিনিশ, তার হৃদয়ের ধন, তবু ওটাকে গোশালা বলা চলে না, কেননা ওখানে শুধু গবেষণা হয়, গবেষণা শব্দটির মৌলিক অর্থ গরু খোঁজা হ'লেও এখন আর ওখানে গরু খোঁজা হয় না। গরু খুঁজবে কেনো, খোঁজার তো আর দরকার পড়ে না। রাশেদ খুব কৌতুক বোধ করলো, তার জাতির মগজের গন্ধে সে ভয় পেলো। তার চারকোটি টাকা দরকার। টাকায় কি সম্মান ফিরবে? রাশেদকে এবার ভিক্ষায় নামতে হবে, চারকোটি টাকা ভিক্ষা ক'রে পেতে তার অন্তত এক হাজার বছর লাগবে, সে এক হাজার বছর ধ'রেই ভিক্ষে করবে, একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে এক হাজার বছর পর গিয়ে তার দরোজায় দাঁড়িয়ে বলবে, আপনার সম্মান ফিরিয়ে দিলাম। কার কাছে সে হাত পাতবে? কোটি কোটি টাকা যারা চুরি করেছে, তাদের কাছে পাতবে না, ওরা খুব গরিব মানুষ, ওরা ঋণ ক'রে ফতুর হয়ে গেছে, দেয়ার মতো একটা সিকিও ওদের নেই; রাশেদ ভাবছে ভিক্ষে করার জন্যে সে প্রথম হাত পাতবে ভিখিরিদের কাছেই;—গুলিস্থানের মোড়ে গিয়ে সে দাঁড়াবে, প্রথম যে-ভিখিরিটিকে দেখবে, তার সামনেই হাত বাড়িয়ে বলবে, একটা পয়সা দিন, আমি বড়োই গরিব, আপনার থেকেও গরিব, আমার চারকোটি টাকা লাগবে, আপনার তো কয়েক বছর ভিক্ষা করলেই চলবে, আমাকে ভিক্ষে করতে হবে এক হাজার বছর। ভিখিরিরা তাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে না। না, রাশেদকে ভিক্ষে করতে হলো না, রাশেদের পক্ষে একটা উত্তর দেয়া হলো, আখাডামি এবার চুপ ক'রে গেলো, আরো মান হারানোর ভয়ে খুব ভদ্র হয়ে উঠলো।

রাশেদ তুমি ভালো হয়ে যাও, কথা বলা বন্ধ ক'রে দাও, বললে শুধু মধুর মধুর কথা বলো, যা অমৃত ঢেলে দেবে জাতির কানে, তুমি ভালো হয়ে যাও রাশেদ, কথা বলা বন্ধ ক'রে দাও, কথার বদলে শ্লোগান বলো, তুমি অন্তত একজনের নামে শ্লোগান দাও; রাশেদ তুমি লেখাটেখা বন্ধ ক'রে দাও, লিখলে শুধু মধুর মধুর লেখা লেখো, যা জাতির বুকে অমৃতের ঝরনা বইয়ে দেবে। তুমি রজ্জব আলির মতো কথা বলো, দেখো না তার কথায় কতো মধু, শুনলেই বুক জুড়িয়ে যায়; লিখলে তুমি জুলমত ব্যাপারির মতো লেখো, দেখো না তার লেখায় কতো মজা, অধ্যাপিকা থেকে গৃহপরিচারিকা রাষ্ট্রপতি থেকে বেশ্যার উপপতি কেমন খলখল ক'রে ওঠে। রাশেদ তুমি একটা মাজার বেছে নাও, মাজারের খাদেম হও, লাশের পুজারী হও, রাশেদ তুমি মান্য করতে শেখো, সেজদা করতে শেখো। তুমি

কি বুঝতে পারছো না তোমার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার? সত্য কথা বলার কী দরকার তোমার, তোমাকে কে বলেছে মানুষ সত্য পছন্দ করে? তুমি মিথ্যা বলো, মিথ্যার মতো মধুর আর কিছু হয় না। তুমি কি বুঝতে পারছো না তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে, তোমার কোনো দরকার নেই এ-জাতির, তোমার মতো কুলাঙ্গারকে সরিয়ে দিতে পারলে স্বস্তি পায় জাতি? রাশেদ ব'সে ছিলো তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরটিতে, দরোজায় হঠাৎ শব্দ হলো; সে বললো, ভেতরে আসুন; কিন্তু কেউ ভেতরে ঢুকলো না। রাশেদ আবার বললো, ভেতরে আসুন, কেউ এলো না। রাশেদ নিজে দরোজা খুলতে গিয়ে খুব অবাক হলো যে দরোজাটি খুলছে না। সে বুঝতে পারলো বাইরে থেকে কেউ তার দরোজাটি এইমাত্র আটকে দিয়ে গেলো। তবু ভালো, ঘরে ঢুকে লোকটি তার ওপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, শুধু দরোজাটা আটকে দিয়ে গেছে, অন্য কোনো দিন হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তে আসবে, তবু তো তা আজ নয়। লোকটি/ছেলেটি দেখতে কেমন হবে? রাশেদ তার মুখটি ভাবার চেষ্টা করলো, কোনো মুখ তার চোখে ভেসে উঠলো না, শুধু শূন্যতা ভেসে উঠলো চোখে। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেতরে একটি লোক আছে, যে এইমাত্র তার দরোজা বাইর থেকে আটকে দিয়ে গেছে, তার মনে এখন অনেক মজা, কেউ তার আঙুল ছুঁয়েও বুঝতে পারবে না ওই আঙুল একটা বড়ো কাজ ক'রে গেছে, হয়তো আরো বড়ো কাজের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। দরোজাটি খুলতে তার কষ্ট হবে, জানালা দিয়ে কাউকে ডাকতে হবে, যাকে ডাকবে সেও রাশেদকে সন্দেহের চোখে দেখবে, রাশেদ নিশ্চয়ই খুব খারাপ, নইলে কেউ তার দরোজা বাইর থেকে আটকাবে কেনো? রাশেদ ভেতর থেকে দরোজাটি আটকে দিলো, তার মনে হলো যে-ঘর বাইর থেকে আটকানো সেটা ভেতর থেকে আটকে রাখা আরো ভালো। রাশেদ তার চেয়ারে বসলো, মনে হলো সে এ-মুহূর্তে বন্দী, ইচ্ছে করলেই বেরোতে পারবে না। তখন সে কারো অলৌকিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো;-তার আলমারির পেছনে একটি শালিক বাসা বেঁধেছে, শালিকটির মুখ সে কখনো দেখে নি, সে-শালিকটি তার সাথে কথা বলতে চাইছে। শালিকটির কথার কোনো শেষ নেই, কিটিরিটিকিরিকিটিকিটিটিকিরি ক'রে সে কথা ব'লে চলছে, রাশেদ উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে শালিকটির মুখ দেখলো, শালিকটি তার দিকে একটি বালিকার মতো তাকিয়ে আছে, ভালোবাসি বলার আবেগ রাশেদের বুকে কাঁপতে লাগলো, তবে সে বলতে পারলো না, কিন্তু শালিক যেনো ব'লে চলছে ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি, তার স্বরে রাশেদের মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যেতে থাকে বাল্যকালের মেঘ, টেবিলের ওপর দুলতে থাকে একটা পেয়ারার ডাল, একটি বালিকা পেছন থেকে হঠাৎ জড়িয়ে ধ'রে শিউরে দেয় তাকে। রাশেদ ঘাসের ওপর শিশিরের ওপর খালি পায়ে হাঁটতে থাকে, বন্দী ক'রে কেউ তাকে বন্দী ক'রে রাখতে পারে না।

দরোজার পর দরোজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রাশেদের সামনে, পথের পর পথ মুছে যাচ্ছে তার সম্মুখ থেকে, ইচ্ছে করলেই সে ঢুকতে পারতো ওই সব দরোজা

দিয়ে, চলতে পারতো ওই সব পথে, রাশেদ প্রত্যাখ্যান করেছে ওই সব দরোজা আর পথ; তার আর ছাপ্পানো হাজার বর্গমাইল নেই, যতোটুকু মাটিতে সে দাঁড়িয়ে থাকে বা ব'সে থাকে যতোটুকু আসবাবের ওপর যেনো শুধু সেটুকুই তার দেশ, ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল হচ্ছে উদ্দিন মোহাম্মদের, আর অন্যদের। তার জন্যে আর বাস্তব নেই, আছে শুধু স্বপ্ন; স্বপ্নে সে দেশটাকে দেখে, দেখতে পায় দেশটা ম'রে যাচ্ছে ওই নদীটির মতো, পদ্মার মতো, তাদের পুকুরপাড়ের হিজল গাছটির মতো। রাশেদ শুধু মৃত্যুর স্বপ্ন দেখতে পায়;—সে সাঁতার কাটছে পুকুরে, ডুব দিতে গিয়ে দেখে পুকুরে পানি নেই, পুকুরটি ম'রে গেছে, সে প'ড়ে আছে কাদার ভেতরে; বিলে, কুমড়ো ভিটের পাশে, একটা শাপলাকে সে দুলতে দেখে, কাছে গিয়েই দেখে তার পাপড়িগুলো বালুস্তূপের মধ্যে উড়ছে, বিল মরুভূমি হয়ে গেছে; সে জ্যোৎস্নায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখে চাঁদটি ম'রে গেছে, তার শরীর থেকে অন্ধকার ঝ'রে পড়ছে। সম্পূর্ণ অন্ধকার নেমে আসার আগে রাশেদের ইচ্ছে হচ্ছে সেই দুরূহ বইটি ধরতে, যেটি কেউ পড়বে না, যেটির কোনো দরকার নেই কারো, তবু সে লিখছে সেটি। একটু সুখও পাচ্ছে বুকে, তার প্রথম বই বেরিয়েছে এবার, তা চোখের আড়ালে প'ড়ে থাকে নি; প্রশংসা যা পাচ্ছে বইটি তার চেয়ে বেশি পাচ্ছে নিন্দা, —বাসায় তার টেলিফোনের সংখ্যা বেড়ে গেছে, তিরস্কার ভোগ করছে সে নিয়মিত, তবু নিন্দাই এখানে ক-জনের ভাগ্যে জোটে। রাশেদ সেদিন এক উৎসবে গেছে, তার মনে হচ্ছে যাদের সে দেখতে চায় না তাদের দেখতে গেছে সেখানে, তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অনেকে, উদ্দিন মোহাম্মদের তিনটি বুড়ো অনুরাগী তাকে দেখে প'ড়েই যাচ্ছিলো, তবে জড়িয়েও ধরছে কেউ কেউ তাকে; তাদের আলিঙ্গন থেকে রসের মতো সুখ ঢুকছে তার ভেতরে। দুটি তরুণী দুটি তরুণ তাকে ঘিরে আছে সব সময়, তাহলে রাশেদ একলা নয়, তার সাথে কেউ কেউ আছে। তারা গিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় বসলো। তরুণী দুটির মুখ থেকে জ্যোৎস্না ঝরছে টেবিলের ওপর, তাদের মুখে আজ পূর্ণিমা, তাতে ঝলমল করছে তার বইটি। তখন সেখানে ঢুকলো কয়েকটি যুবক, এসেই ঘিরে ফেললো টেবিলটি; তারা চিৎকার ক'রে বলতে লাগলো, তোমার বই পড়ার জন্য নয় পোড়ানোর জন্য, এই সব আমরা চাই না, তোমাকেও একদিন পুড়িয়ে ফেলা হবে। তারা টেবিল থেকে রাশেদের বইটি তুলে নিলো, আগুন লাগিয়ে দিলো বইটিতে, তার বই দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। যুবকেরা জ্বলন্ত বইটি তার সামনে টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো;—রাশেদ দেখতে পেলো তার বইয়ের পাতা পুড়ছে, ছাই হচ্ছে, তার সাথে পুড়ছে ছাই হচ্ছে ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল—পুড়ছে গাছের পাতা, নদী, মেঘ, বাতাস, ধানখেত, লাঙ্গল, সড়ক, গ্রাম, শহর, পুড়ে যাচ্ছে ছাই হয়ে যাচ্ছে একটি জাতি, পুড়ে যাচ্ছে ছাই হয়ে যাচ্ছে তার বর্তমান, পুড়ে যাচ্ছে ছাই হয়ে যাচ্ছে তার ভবিষ্যৎ।